গান্ধী-চরিত

ঋষি দাস

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৩৫৫

দাম সাড়ে চার টাকা

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শ্রীসুমুখনাথ মিত্র

প্রকাশক :

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

মুদ্রাকর :

শ্রীবিভূতিভূষণ পাল

দত্ত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,

২৪, বাগমারী রোড, কলিকাতা

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

গান্ধী-চরিত

শুদ্ধি ঃ

৭৯ পৃষ্ঠায় 'New Testament'-এর স্থলে—'Old Testament'

এবং

৩২২ পৃষ্ঠায় 'সংবাদ-সেবকের' স্থলে—'সংবাদ-সেন্সর' হবে।

স্নেহের বোন

সুচরিতাকে

দিলাম

বর্তমান ভারতে প্রধানত দুই দল মানুষ আছেন, যাঁদের একদল গান্ধী বলতে অজ্ঞান, আর এক দল যাঁরা চিমটে দিয়েও গান্ধীজিকে ছোঁবেন না। এঁদের কোনো দলের মানুষ নই আমি। সুতরাং 'গান্ধী-চরিত' রচনা করতে গিয়ে আমি যে পথে অগ্রসর হয়েছি, সেটা যুধ্যমান ক্রুদ্ধ দুই শিবিরের মধ্যকার পথ, সেখানে দু দিক থেকেই অজস্র আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। পথটা বিপজ্জনক বলতে হবে।

কিছুদিন আগে, যখন সাম্প্রদায়িক কলহের আগুন লেগেছিল আর শান্তিকামীরা সবাই গান্ধীজির পিছু পিছু ছুটছিলেন, অথচ গান্ধীজির উপর অপমান এবং আক্রমণ-ও আসছিল ক্রমাগত, তখন আমি রোমাঁ রোলাঁ-রচিত 'মহাত্মা-গান্ধী' বাংলায় অনুবাদ করেছিলাম। বইখানির সাময়িক মূল্য ছিল প্রচুর। কিন্তু একথা-ও তখন মনে হয়েছিল, বাংগালী পাঠকের হাতে আজ যা তুলে দিলাম, এর সবটুকুই বিচারসহ নয়, এর অনেকখানিই ফিরিয়ে নেওয়া দরকার। তাই আমার এই গ্রন্থের রচনা। কিন্তু রোলাঁর রচনাসিদ্ধ হস্তের রচনার সম্মুখীন হওয়া আমার পক্ষে দুঃসাহস, এমন কি স্পর্ধা। তবু-ও সে দুঃসাহস এবং স্পর্ধা করতে হয়েছে, কারণ, বস্তুত পক্ষে রোলাঁ গান্ধীজিকে সম্পূর্ণ বোঝেন নি, যেমন তিনি বোঝেন নি নিজেকে। বোঝা সম্ভব-ও ছিল না। তাঁরা দুজনে ছিলেন একই প্রকৃতির মানুষ। তাই গান্ধী-চরিত্র বা গান্ধীবাদকে বিচার ক'রে দেখার মতো ধৈর্য বা নির্লিপ্তি রোলাঁর থাকা সম্ভব ছিল না। এ-সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র

ঘটনা আমার মনে পড়ে। সুবিখ্যাত অভিনেতা জর্জ আর্লিস একবার জর্জ বার্ণার্ড শ-কে ভল্‌তের-এর জীবন নিয়ে একখানি নাটক লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। শ তার জবাবে বলেছিলেন, কাজটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কারণ, তিনি নিজেই অনেকখানি ভল্‌তের-এর মতো। যে-কারণে শ ভলতেরের জীবন নিয়ে নাটক লেখেন নি, ঠিক সেই কারণেই রোলাঁ গান্ধীজির-জীবনী লিখতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল না ক'রে পারেন নি। কিন্তু নিজের কালের গণ্ডীতে বন্দী থেকে প্রতিভারা-ও যা অনেক সময় দেখতে পান না, তাঁর পরবর্তীরা অতি সাধারণ মানুষ হ'য়েও অনেক সময় তা সহজে প্রত্যক্ষ করেন। কালের কোয়াশা প্রতিভার দৃষ্টিকে-ও অনেক ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। পঁচিশ বছর আগে তাই রোলাঁর মতো প্রতিভার পক্ষে-ও যা বোঝা ছিল কষ্টসাধ্য, আজ সাধারণ মানুষের চোখে-ও তা অতি স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। কালের বন্দীশালার মহাপ্রাচীর ডিঙিয়ে দৈত্যের দৃষ্টি-ও যেখানে গিয়ে পৌঁছয় না, কালের দাক্ষিণ্যে দৈত্যের ঘাড়ের ওপর উঠে বসেছে যে-বামনটা, তার দৃষ্টি কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছে অবাধে। এটাই হোলো ইতিহাসের করুণতম দিক। ১৯২৩ সালে রোলাঁ যাকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন, ১৯৩০-এর পরেই তাতে তাঁর নিজের-ও সংশয় জন্মেছিল।

তাছাড়া, রোলাঁ ছিলেন মূলত বুর্জোয়া জীবনীকার। তাই তাঁর গ্রন্থে ব্যক্তি ছিল অতিপ্রধান। গান্ধীজি যে-সামাজিক অর্থনীতিক অবস্থার ফসল, তাকে তিনি বিচার করেন নি। তাই তাঁর জীবনী হয়েছে একদর্শী। কিন্তু জীবনীতে দুটি দিক থাকা অনিবার্য—একটি হোলো ব্যক্তিগত দিক, অপরটি হোলো সামাজিক দিক। সামাজিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত পরিপার্শ্ব-ই মানুষকে গ'ড়ে তোলে। সমাজ যেমন জন্ম দেয় প্রতিভাকে, প্রতিভা-ও তেমনি প্রভাবিত করেন সমাজকে। গান্ধীজির মতো প্রতিভাকে তাই কেবল

ব্যক্তিগতভাবে দেখা নির্ভুল দৃষ্টির পরিচয় নয়। সামাজিক ভাবেও তাঁকে দেখা একান্ত দরকার। কী সামাজিক অবস্থা তাঁকে গড়ে তুলেছিল, এবং কী সামাজিক অবস্থাকে তিনি গ'ড়ে তুলেছিলেন, এ দুটিকে একসংগে দেখলেই গান্ধীজির সামাজিক রূপটিকে ধরা যাবে। কেবল তাই নয়, গান্ধীজির বেলায় তাঁর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত দুটি রূপকে বিশেষ সতর্কতার সংগে লক্ষ্য করতে হবে। কারণ, গান্ধীজির ব্যক্তিগত ভূমিকাটি তাঁর সমাজগত ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজে তিনি ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থত্যাগী। কিন্তু সমাজগতভাবে তিনি লালসার এবং স্বার্থ-বুদ্ধির অভিব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি অপরূপ, তিনি স্নেহময়, তিনি সন্ন্যাসী। কিন্তু সমাজগতভাবে তিনি যে শক্তির প্রকাশ, তা পুরাতন, তা সাধারণ, তা নিষ্করুণ, তা শোষণ ও স্বার্থপরতার চরম। তাই গান্ধীজির জীবনী রচনার সময় দুটি মানুষকে সর্বদা আমি চোখের সম্মুখে রাখতে চেয়েছি, একটি, ব্যক্তিগত গান্ধী, অন্যটি, সমাজগত গান্ধী। আমার রচনার গোড়ার দিকে আমি ব্যক্তির উপর জোর দিতে চেয়েছি বেশি। ক্রমেই সে-ব্যক্তি পুষ্টির দিকে যতো এগিয়েছে, যতোই সে সমাজ জীবনের প্রতিনিধিত্ব বা সমাজজীবনকে প্রভাবিত করেছে, ততোই সে-ব্যক্তিকে আমি সংকীর্ণ ক'রে তাকে বিস্তৃত সমাজ জীবনের সংগে একান্বিত করতে চেয়েছি। তাই এই গ্রন্থের শেষের দিকে পাঠকের মনে হ'তে পারে, তিনি গান্ধীকে যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে আর পাচ্ছেন না, যেমনভাবে তিনি পাচ্ছেন ভারতের সামাজিক, অর্থনীতিক, রাজনীতিক ইতিহাসকে। বস্তুত পক্ষে, গান্ধীজির জীবনের এই হোলো সত্যিকারের কাহিনী—একটি ক্ষুদ্র পড়ন্ত পরিবারের নিঃসংগ শিশু একদা ভারতের বহু মানবের সংগে একাকার হ'য়ে গিয়েছিলেন—যেখানে ভারতের হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ এবং তাঁর নিজের মধ্যে বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। এ যেন এক মহাসংগমের স্বরূপ। গান্ধীজির

জীবন বুঝি কোনো নদী, নির্জন পার্বত্য অঞ্চল থেকে একদা শুরু হয়েছিল তার একক যাত্রা। সে-যাত্রা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ঘটেছে মহাসংগম, সেখানে নদী ও সমুদ্র একাকার হ'য়ে গেছে—সেখানে নদী প্রায় নিশ্চিহ্ন, সমুদ্র-সন্নিভ। ব্যক্তির উৎস থেকে সমাজের মোহানা পর্যন্ত এই উত্তরণকে-ই আমি চিত্রিত করতে চেয়েছি। চেয়েছি, হয়তো সার্থক হই নি। তবু যে চেয়েছিলাম, বলতে দ্বিধা কি ?

—ঋষি দাস

গান্ধী-চরিত

এক

যদি বলা যায়, তিলক-গোখলের মতো মানুষ প্রতি শতাব্দীতে বহু জন আসেন, কিন্তু গান্ধীর মতো মানুষ বহু শতাব্দীতে আসেন একজন, কথাটি অত্যন্ত সত্য হবে। আর সত্য হবে বলেই, আজকের দিক থেকে হিসাব ক'রে দেখলে, ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখটি কেবল ভারতবর্ষের পক্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষেই ছিল একটি পবিত্রতম দিন। ঐ দিনটি আজ থেকে বহু শতাব্দী পর্যন্ত বৈশাখী পূর্ণিমার মতো, ফাল্গুনী পূর্ণিমার মতো, পঁচিশে ডিসেম্বরের মতো, বৎসরে বৎসরে মহা-সমারোহে উদ্‌যাপিত হবে আশা করি। বুদ্ধের মতো, খৃস্টের মতো, চৈতন্যের মতো, একটি মানুষ ঐ দিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর সেই জন্মের সংগে সংগে সেদিন সবার অজ্ঞাতে এক বিপুল আলোর সূচনা ঘটেছিল, কারণ, এই শিশুই একদিন জীবন্ত আলোক-শিখার মতো আফ্রিকার বুকে, ভারতের বুকে,—সমগ্র পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করেছিলেন, আর, মানুষ আশায় উদ্দীপনায় সেই আলোক-শিখার পানে তাকিয়ে ছিল নির্নিমেষ নয়নে। এই শিশুই ভাবীকালের মহাত্মা গান্ধী।

মহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধী পদবীর অর্থ, গুজরাটি ভাষায়, মুদী। এ থেকেই অনুমান করা যায়, মহাত্মাজির পূর্বপুরুষেরা কখনো কোনোকালে মুদীর ব্যবসা করতেন। কিন্তু মহাত্মাজির

পিতামহ থেকে মন্ত্রিত্বই ক'রে এসেছেন তিন পুরুষ। গান্ধীজির পিতামহের নাম উত্তম চন্দ বা উতা গান্ধী। উত্তম চন্দ কি রকম সাহসী, সত্যপ্রিয় ও দৃঢ়সংকল্প ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে বহু কাহিনী-কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। তিনি ছিলেন বোম্বাইএর অন্তর্গত পোরবন্দরের রাজার মন্ত্রী। রাজার সংগে তাঁর কোনো বিবাদ-বচসা হওয়ায় তিনি পোরবন্দর ত্যাগ ক'রে পালিয়ে জুনাগড়ের নবাবের আশ্রয় নেন। সেখানে নবাবকে তিনি বাম হাতে সেলাম করেছিলেন। এই অসৌজন্যের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ "ডান হাতটা তো আমি পোরবন্দরকে দিয়ে ফেলেছি!"

উতা গান্ধীর দুই বিয়ে। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে চার জন এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে দুই জন পুত্র জন্মে। এই পুত্রদের মধ্যে পঞ্চম জনের নাম করম চাঁদ বা কাবা গান্ধী।

কাবা গান্ধীর আবার চারটি বিয়ে। তাঁর কনিষ্ঠা পত্নী পুতলী বাঈএর গর্ভে এক কন্যা এবং তিন পুত্র হয়। এই পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠই আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব—মহাত্মা গান্ধী।

কাবা গান্ধীর উচ্চ শিক্ষা ছিল না, কিন্তু ছিল প্রচুর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা। ধর্ম বিষয়ে-ও তাঁর শিক্ষা বা জ্ঞান ছিল না, তবে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ। একজন ব্রাহ্মণের পরামর্শে তিনি গীতা-পাঠ আরম্ভ করেন, যে-গীতা তাঁর বিখ্যাত পুত্রকে একদা বিপুল ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। কাবা গান্ধীর মধ্যে সাহস এবং সত্যপ্রিয়তা-ও ছিল প্রচুর। তিনি যখন রাজকোটে দেওয়ানি করতেন, রাজকোটের ঠাকুর সাহেবকে পলিটিক্যাল এজেন্টের সহকারী কোনো এক সাহেব একবার অপমান করায় তিনি তার প্রতিবাদ করেন। সাহেব তাতে চটে গিয়ে কাবা গান্ধীকে ক্ষমা ভিক্ষা করতে

বলে। কিন্তু ভয় পাওয়ার পাত্র ছিলেন না কাবা গান্ধী। তাই তিনি সাহেবের অপমানজনক আদেশ উপেক্ষা করলেন। ফলে তাঁকে কয়েক ঘণ্টা হাজতে রাখা হোলো। কিন্তু তাতেও যখন কোন ফল হোলো না, তখন তাঁকে তারা ছেড়ে দিলো। পিতার এই অনমনীয়তা-ও আমরা তাঁর পুত্রের মধ্যে লক্ষ্য করবো।

কাবা গান্ধী প্রথমে পোরবন্দরে মন্ত্রিত্ব করতেন। মন্ত্রিত্ব ছাড়ার পর তিনি রাজস্থানিক কোর্টের সভাসদ হন এবং কিছুদিন রাজকোট ও ভাঁকানারের দেওয়ান থাকেন। মৃত্যুর সময় তিনি রাজকোটের দরবার থেকেই পেন্‌সন্ পাচ্ছিলেন। কিন্তু ধনসঞ্চয়ের লোভ না থাকায় তিনি সন্তানদের জন্যে ধন-সম্পত্তি বিশেষ রেখে যাননি।

পিতার এই সাহস ও অন্যায়ের প্রতিবাদের শক্তি যেমন ভবিষ্যতে মহাত্মাজীর মধ্যে সহস্র গুণে বর্ধিত হ'য়ে বর্তে ছিল, তেমনি তাঁর মার কয়েকটি গুণও তিনি পেয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণটি হোলো উপবাস-ব্রত। অতি শিশুকালেই গান্ধীজি লক্ষ্য করতেন, দিনের পর দিন মা হাসিমুখে উপবাসী হন এবং উপবাসের ব্রত পালন ক'রে কাতর হওয়া তো দূরের কথা, হ'য়ে ওঠেন আনন্দিত। গান্ধীজি পরবর্তী জীবনে উপবাসকে তাঁর আত্মিক অস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। যখনই তিনি নিজের মালিন্য দূর করতে চেয়েছেন, অপরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অগ্রসর হ'য়েছেন, তখনই তিনি গ্রহণ করেছেন উপবাসের ব্রত। এই উপবাসের ব্রত গ্রহণের প্রথম পাঠ তিনি তাঁর মার কাছেই পেয়েছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গান্ধীজির শৈশবকাল পোরবন্দরেই কাটে। ঐ সময় দু এক কলি

নামতা মুখস্থ করা আর মাস্টারকে গালি দেওয়া ছাড়া বিশেষ কিছু শিক্ষা তাঁর হয় নি। পোরবন্দর থেকে গান্ধীজির বাবা যখন রাজস্থানিক কোর্টের সভাসদ হ'য়ে রাজকোটে গেলেন, তখন মহাত্মার বয়স মাত্র সাত বৎসর। রাজকোটে কিশোর মহাত্মা প্রাইমারী থেকে মধ্যস্কুল, এবং মধ্যস্কুল থেকে হাই স্কুলে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স বারো বৎসর। ঐ সময়ের শিক্ষা সম্পর্কে মহাত্মাজি স্বয়ং বলেন ঃ

"আমি অতিশয় লাজুক বালক ছিলাম। স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া ব্যতীত অন্য কাজ ছিল না। ঘণ্টা বাজার সময়ে পৌছতাম, আবার স্কুল ছুটি হলেই ঘরে পালাতাম।.........কেননা কারও সংগে গল্প করতে আমার ভালো লাগত না। কেউ যদি আমাকে ঠাট্টা করে—এই ভয় হোতো।"

কিন্তু স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের প্রতিও তাঁর বিশেষ মমতা বা আকর্ষণ ছিল না। নিতান্ত মাস্টারের কাছে গালি খাওয়ার ভয়ে বা মাস্টারকে মিথ্যা কথা ব'লে ঠকাবার অনিচ্ছায় তাঁকে দৈনিক পড়া করতে হোতো। এই সময় তাঁর বাবা একখানি নাটক কিনে আনেন। নাটকখানির নাম— "শ্রবণের পিতৃভক্তি।" বইখানি গান্ধীজি আগ্রহের সংগে পড়লেন। ভারি ভালো লাগলো গল্পটি। বালক শ্রবণ তার বৃদ্ধ পিতামাতাকে ঝোলনায় বসিয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে চলেছে তীর্থদর্শনে। শ্রবণের মতো এমনি একটি পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত সন্তান হওয়ার কথা গান্ধীজির কিশোর কল্পনায় জেগে উঠলো। গান্ধীজি তাঁর প্রৌঢ় কালেও স্বীকার করেন ঃ

"শ্রবণের মৃত্যু-সময়ে তার পিতামাতার বিলাপ আজও আমার স্মরণ আছে।"

ঐ সময় একটা নাটক কোম্পানিও আসে। সেখানে কিশোর গান্ধী

হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের অভিনয় দেখেন। সত্যের জন্যে হরিশ্চন্দ্র সর্বস্ব ত্যাগ করলেন। গান্ধীজি বলেন ঃ

"এই নাটক দেখে আমার আশা মিটত না। পুনঃ পুনঃ এই নাটক দেখার ইচ্ছা হোতো।…মনে মনে আমি এই নাটক শতবার অভিনয় করেছি। হরিশ্চন্দ্রকে স্বপ্ন দেখতাম।…হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বিপদে পড়ে তাঁরই ন্যায় সত্য পালন করব—এই আমার কাছে সত্য হয়ে উঠল।"

হরিশ্চন্দ্র সংক্রান্ত কোনো অখ্যাত নাটক ও নাটুকে দল একদা এমনি ভাবেই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সত্য-সন্ধানীর জন্ম দিয়েছিল। সুতরাং, গান্ধীজির শৈশবের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা যে এই হরিশ্চন্দ্র নাটকের পাঠ, একথা বলতে দ্বিধা হয় না।

হাই স্কুলে পড়বার সময়েই গান্ধীজির বিবাহ হয়—তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরো বছর। বাল্যবিবাহ ভারতবর্ষে কিছু নতুন নয়—বিশেষ ক'রে যাট বছর আগেকার ভারতবর্ষে। গান্ধীজির বড়োদার বিয়ে আগেই হ'য়েছিল। বাকী ছিলেন মেজদা, সেই সংগে প্রায় সমবয়সী এক খুড়তুতো ভাই। সুতরাং, এই তিন জনের বিয়েই এক সংগে দেওয়ার কথা স্থির করলেন অভিভাবকেরা। কারণ দর্শান গান্ধীজি ঃ

"তাতে এক দিকে খরচ যেমন কম হয়, অন্য দিকে বিবাহের আড়ম্বর আবার তেমনি হয় বেশী। তা ছাড়া তিন বারের ব্যয় একবারে সারতে পারলে টাকাও বেশি খরচ করা যায়।"

গান্ধীজির সংগে যে বালিকাটির বিয়ে হোলো তাঁর বয়সও ছিল গান্ধীজির সমান। সুতরাং বিয়ের পর গান্ধীজি তাঁর বালিকা বধূকে কৈশোরের সাথী রূপেই পেলেন।

বিয়ের কারণে গান্ধীজির এক বৎসর পড়াশুনো বন্ধ রইলো। কেবল তাই নয়, তার পরও পড়াশুনোয় তাঁর অমনোযোগ দেখা গেলো এই বালিকা বধূকে কেন্দ্র ক'রে। "স্কুলে গিয়েও তার কথাই মনে হোতো, কখন রাত্রি হবে, কখন তার সংগে দেখা হবে—এই ছিল আমার ভাবনা। বিচ্ছেদ অসহ্য বোধ হোতো।"

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই গান্ধীজি তাই বাল্যবিবাহকে তীব্রভাবে নিন্দিত করেছেন। তিনি যে-নিয়মনিষ্ঠা ও সত্যপ্রিয়তার জোরে একদিন এই মোহকে জয় ক'রে আপনার পূর্ণ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছিলেন, সে তো সকলের ভাগ্যে হয় না। সুতরাং এই বাল্যবিবাহের বিষময় ফলে যে অনেক জীবন যৌবনেই পংগু হ'য়েছে, একথা স্মরণ ক'রে গান্ধীজি নিজে-ও খেদ করেছেন।

ঐ সময় গান্ধীজির স্ত্রী কিশোরী কস্তুরবাঈ বছরের অর্ধেকটা সময়, সচরাচর যেমন হ'য়ে থাকে, বাপের বাড়িতেই কাটাতেন। ফলে তেরো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে একসংগে যে-সময়টা কাটিয়েছেন, একত্রে তার পরিমাণ তিন বছরের বেশি হবে না। তারপর আঠারো বছর বয়সেই তো গান্ধীজি বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত থেকে ফিরে-ও মাস ছয়েক মাত্র তাঁরা একত্রে ছিলেন। কারণ, ঐ সময় মহাত্মাকে প্রায়ই বোম্বাই ও রাজকোটে যাতায়াত করতে হোতো। এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক এসে গেলো। এমনি ভাবেই গান্ধীজি বাল্যবিবাহের কুফল থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন ব'লে তিনি নিজে ঘোষণা করেন।

যাই হোক, বিয়ের পরে গান্ধীজির মেজদার পড়াশুনো বন্ধ হোলেও তাঁর পড়াশুনো চলতে লাগলো। স্কুলে তিনি শিক্ষকদের স্নেহ-ভালোবাসা

সর্বদাই পেতেন। পড়াশুনোর জন্যে দু একটা বৃত্তি-ও পেয়েছিলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করি, তিনি পড়াশুনো করছেন, তার প্রধান কারণ এই নয় যে, পাঠাভ্যাসের মধ্যে কোনো মোহ বা আকর্ষণ আছে। তার প্রধান কারণ, মাস্টারের কাছে পড়া না করার জন্যে পাছে কোনো মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তাই। কেবল তাই নয়, পড়া না ক'রে সত্য কারণ ব'লেও নিস্তার পাওয়া যায় না, তাতে-ও মানুষে সন্দেহ করে। একবার এমনি একটি ঘটনায় গান্ধীজির যে অভিজ্ঞতা হয়, সে সম্পর্কে গান্ধীজি বলেন, "বুঝলাম যে, সত্য যে বলতে চায়, সত্য যে পালন করতে চায়, তার অসাবধান হওয়াও চলে না।"

গান্ধীজির পরবর্তী জীবনে অহিংসা শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র রূপে দেখা দিয়েছিল এবং অহিংসা ও সত্যের মধ্যে বড়ো একটা পার্থক্য ছিল না। কিন্তু কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করি, এই অহিংসা-ও তাঁর পড়াশুনোর মতোই তাঁর সত্যপ্রিয়তাকে আশ্রয় ক'রেই জন্ম লাভ করেছিল।

গান্ধীজি পৃথিবীর আরো অনেক শ্রেষ্ঠ মনীষীর মতোই স্বল্পমিত্র ছিলেন কৈশোরে। বিশেষ ক'রে এ বিষয়ে বার্ণার্ড শ-র কথা সহজে মনে পড়ে। গান্ধীজির এই স্বল্পমিত্রতার কারণ-ও ছিল বার্ণার্ড শ-র মতোই লাজুকতা। এঁরা দুজনেই বাল্যে ছিলেন লাজুক, কথাটি পর্যন্ত বলতে ভয় করতেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে উভয়ের কথা বলার শক্তি এমন বেড়ে ওঠে যে, উভয়েই একদা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ব'লে বিখ্যাত হন। যাই হোক, মহাত্মা কৈশোরে একটি বন্ধু পেয়েছিলেন—যার কুখ্যাতি গান্ধী পরিবারের মধ্যে-ও সুপরিচিত ছিল। সুতরাং এই বন্ধুটি সম্পর্কে গান্ধীজির মা, স্ত্রী ও দাদা, সকলেই তাঁকে একবাক্যে সাবধান করতে লাগলেন। গান্ধীজি তাঁদের বোঝালেন: "তার যে দোষের কথা তোমরা বলছ, আমার

তা ভালো জানা আছে। কিন্তু তার গুণ কি তা তোমরা জান না। আমাকে সে বিপথে নিয়ে যেতে পারবে না, কেন না তাকে ভাল করার জন্যেই তার সংগে আমার সম্পর্ক।”

কিন্তু বন্ধুটি যে গান্ধীজিকে বিপথে আকর্ষণ করলো না বা খানিকটা নিয়েও গেলো না, সেকথা বলা চলে না। বন্ধুটির দেহে শক্তি ছিল। সে একদিন গান্ধীজিকে বোঝালো, তার দৈহিক শক্তির একমাত্র কারণ, মাংস ভক্ষণ। আর গান্ধীজি রোগা, তার-ও একমাত্র কারণ, তাঁর বাড়ি বৈষ্ণবের বাড়ি, মাংস সেখানে নিষিদ্ধ। ন্যায় শাস্ত্রের যোগ ও বিয়োগের পদ্ধতি প্রয়োগ না ক'রেও গান্ধীজির কাছে বন্ধুর যুক্তি অকাট্য মনে হোলো। তিনি বুঝলেন, একটি সবল সুস্থ দেহ তাঁর চাই-ই। সুতরাং মাংস-সেবন অপরিহার্য। গান্ধীজি গোপনে মাংস খেতে লাগলেন। “রুটির ওপর আমার বিতৃষ্ণা কমল, ছাগলের জন্যে মায়া পালাল এবং মাংস নয়—মাংসযুক্ত পদার্থের স্বাদ পেতে লাগলাম।”

কিন্তু মুশ্‌কিলটা হ'লো অন্য দিকে। বাড়িতে মিথ্যাকথা বলতে হয়। “যেদিন এই খানা খাওয়া হোত, সেদিন বাড়িতে গিয়ে আর খাওয়া যেতো না। মা খেতে ডাকতেন। তাঁকে বলতাম—'আজ ক্ষুধা নেই'—'আজ হজম হয় নি'। এইভাবে নানা বঞ্চনা বাক্য রচনা করতে হোতো। এ সব বলতে প্রতিবারেই মনে আঘাত লাগত। একে ত মিথ্যা, তাও আবার মায়ের সামনে!···এ চিন্তা আমার হৃদয়কে যেন দগ্ধ করত। আমি স্থির করলাম, মাংস খাওয়ার আবশ্যকতা আছে, মাংসাহার প্রচার ক'রে ভারতবর্ষের সংস্কার করব, কিন্তু পিতামাতাকে ঠকানো ও মিথ্যা কথা বলা, মাংস না খাওয়া অপেক্ষা-ও নিন্দনীয়।”

বলাই বাহুল্য, ভারতবাসীকে মাংস ভক্ষণের সুযোগ দেওয়ার জন্যে

গান্ধীজি সামাজিক বিপ্লব করেন নি। কেবল তাই নয়, পরবর্তী জীবনে মাংসের প্রতি বিরূপ ভাবটি তাঁর মধ্যে এমন প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, যখন নিজের বা স্ত্রী-পুত্রের অসুস্থতার ফলে মাংসের সুরুয়া ভক্ষণের বিষয়টি তাঁদের জীবনমৃত্যুর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়, তখনো তিনি মাংসাহারকে প্রশ্রয় দেন না। তাঁর মতে মাংসাহারের চেয়ে মৃত্যু ভালো। এ বিষয়ে বার্ণার্ড শ-র কথা আবার মনে পড়ে। ডাক্তার যখন রোগ শয্যায় মুমূর্ষু শ-কে মাংস খেতে অনুরোধ ক'রেছিলেন, জবাবে শ বলেছিলেন, "Death is better than cannibalism." যাই হোক, এখানে আমরা একটি বস্তু লক্ষ্য করি। জীবজন্তুর প্রতি করুণার চেয়ে সত্যপ্রিয়তাই গান্ধীজিকে অহিংসার দিকে সেদিন এগিয়ে দিয়েছে। আরো লক্ষ্য করি, গান্ধীজির জীবনের মূল কথাটি, অহিংসার চেয়ে-ও এই সত্যপ্রিয়তার মধ্যেই নিহিত আছে। তবে এখানে এ কথার-ও উল্লেখ প্রয়োজন, রসনা-তৃপ্তির জন্যে তিনি মাংসাহার শুরু করেন নি। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দেন: "মাংসাহারের সখ আমার ছিল না। আমাকে যে বলবান ও সাহসী হতে হবে, অপরকে-ও সেই প্রকার করতে হবে। ইংরেজকে হারিয়ে দেশ স্বাধীন করা চাই।"

এই কৈশোরেও গান্ধীজি দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার স্বপ্ন দেখতেন। না দেখাই ছিল অস্বাভাবিক। শিশুকালেই তিনি দেখেছেন, সাদা সাহেবেরা কতো অবহেলায় এ-দেশের রাজা বা মন্ত্রীকে পর্যন্ত অপমান করে। তাঁর বাবাকে তো অন্যায় ভাবেই হাজতে রেখেছিল। সুতরাং ইংরেজ তাড়াবার জন্যে বীর্যের প্রয়োজন। তখনো গান্ধীজির কাছে বীর্য ছিল দৈহিক বল। যে-মানসিক শক্তিকে শ্রেষ্ঠ বীর্য ব'লে তিনি একদা জগতের সমক্ষে উপস্থিত করেছিলেন, তার সন্ধান বা উপলব্ধি ঘটতে তখনো ছিল অনেক দেরী।

সত্যাচরণের উদ্দেশ্যে গান্ধীজি মাংসাহার বর্জন করলেন, কিন্তু বন্ধুকে

বর্জন করলেন না। বন্ধু তাঁকে ধাপে ধাপে অধঃপতনের গভীর গহ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলো। গান্ধীজির মনে তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করলো, তাঁকে বেশ্যালয়ে নিয়ে গেলো। কিন্তু গান্ধীজি স্বভাবত লাজুক হওয়ায় তিনি এই কুৎসিত আচরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন। "সেই ঘরে (গণিকালয়ে) গিয়ে আমি যেন অন্ধের মতো হয়ে গেলাম। আমার কথা বলার শক্তি-ও রইল না। লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে সেই স্ত্রীলোকের পাশে খাটিয়ায় বসেছিলাম। স্ত্রীলোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমে দুচার কথা আমাকে শোনালো, তারপর আমাকে দরজা দিয়ে বার ক'রে দিল।" স্ত্রীর প্রতি তাঁর যে মিথ্যা সংশয় জন্মেছিল এবং স্ত্রীকে সন্দেহ ক'রে তাঁর (স্ত্রীর) প্রতি তিনি যে অবিচার ও অত্যাচার ক'রেছিলেন, সে সম্পর্কে-ও গান্ধীজি উদাসীন নন। তিনি পরে বলেন, "এই অত্যাচারের জন্যে আমি নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারি না।"

গান্ধীজির কৈশোরের আরো একটি ঘটনা বড়ো কৌতুকাবহ লাগে, বিশেষ ক'রে তাঁর পরবর্তী জীবনের সংগে তুলনা ক'রে। সেটির এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। প্রত্যেক মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ শৈশবে বা কৈশোরেই নিহিত থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেগুলি প্রকাশ পায়, পরিপূর্ণ বিকাশ বা ঘোরতর প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। মহাত্মাজীর পরবর্তী জীবনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—সত্যপ্রীতি; অহিংসা এবং উপবাস, এ-গুলির ক্ষীণ সংকেত আমরা ইতিপূর্বেই পেয়েছি। এগুলি ছাড়া, তাঁর আরো একটি বৈশিষ্ট্যের সংকেত আমরা কৈশোরেই পাই। সেটি মৃত্যুর সংগে তাঁর সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, মৃত্যুকে শ্যাম-সমান ব'লে কৈশোরে রাধিকার ভূমিকায় তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আবার যৌবনে তিনি জীবনের সংগে মৃত্যুর 'বর-বধূর'

সম্পর্ক স্থাপন ক'রেছিলেন। মৃত্যুর তটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন মৃত্যুকে 'শান্তি পারাবার' ব'লে। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মৃত্যুর সংগে গান্ধীজির সম্পর্কটি কিন্তু আরো অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে মিত্র ব'লে অনুভব করেছেন ভাবলোকে,ভাবলোকেই তাকে জানিয়েছেন আমন্ত্রণ। কিন্তু গান্ধীজি মৃত্যুকে ক্রীড়াসহচররূপে বারে বারে আহ্বান করেছেন, কেবল ভাবে নয়, কার্যেও। তার প্রমাণ তাঁর জীবনের সপ্তদশ বার অনশন। প্রতিবারেই দেখেছি, মৃত্যুর সংগে তাঁর অপূর্ব খেলা, দুঃসাহসিক রসিকতা। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর সংগে মিতালি করেছিলেন ভাবে; টলস্টয় মৃত্যুকে এতো বেশি চিন্তা করতেন যে মনে হোতো, তিনি বুঝি মৃত্যুকে ভয় করেন, মৃত্যুর সংগে তাঁর লীলা বুঝি নিরুপায় মূষিকের লীলা মার্জারের সংগে। এমন কি মহামানব যিশুও ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর সম্মুখে নিজেকে অসহায় বোধ করেছিলেন, বিধাতার করুণায় 'বিধাতা-পুত্রেরও' সংশয় জন্মেছিল: "My God, My God, why hast Thou forshaken me?" এ-বিষয়ে পৃথিবীতে গান্ধীজির একমাত্র তুলনা মেলে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের মধ্যে। হেমলকের বিষ পান ক'রে-ও মৃত্যুতে নির্লিপ্ত নির্বিকার সক্রেতিস হাসিমুখে শিষ্যদের সংগে আলাপ করছেন, যেন কিছুই ঘটে নি,—কয়েক মুহূর্ত পূর্বের জীবন ও কয়েক মুহূর্ত পরের মৃত্যু, এর মধ্যে যেন কোনো ভেদ নেই, কোনো ছেদ নেই। কিন্তু তাঁকেও গান্ধীজির মতো ক্রীড়াচ্ছলে মৃত্যুকে বারে বারে আলিংগন করতে আমরা দেখিনি। সক্রেতিস ও গান্ধীজির উভয়ের কাছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ভেদ ছিল না। যেমন নদীর এপার ওপারের মধ্যে থাকে না, সে ছিল তেমনি। তাই মৃত্যুর প্রতি তাঁদের এই ঔদাসীন্য। তাই বুঝি জীবনের পূজায় মৃত্যুকে গান্ধীজি অবহেলা করেছেন, তাই মৃত্যুকে ইচ্ছামত ভৃত্যের মতো আহ্বান

করেছেন বারে বারে। আর তাই বুঝি একদিন তাঁর অতর্কিতে তাঁর মৃত্যু তাঁর ওপর এমনি ভাবে প্রতিশোধ নিয়ে বসলো!

কৈশোরে আমরা লক্ষ্য করি, গান্ধীজি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে-বার তিনি মৃত্যুর আতংকে পরাভূত হ'য়ে এসেছিলেন পালিয়ে। কিন্তু গান্ধীজির চরিত্রে পরাভবের স্থান ছিল না। তাই মৃত্যুর কাছে কৈশোরের এই পরাভবই বুঝি তাঁকে একদিন মৃত্যুঞ্জয়ী ক'রে তুলেছিল।

আত্মহত্যার কাহিনীটি এইরূপ ঃ অন্যান্য লোককে ধূমপান করতে দেখে কিশোর গান্ধীর ধূমপান করার ইচ্ছা হোলো। প্রথমে তিনি উচ্ছিষ্ট পোড়া বিড়ি সংগ্রহ ক'রে খেতে লাগলেন। কিন্তু মজা তাতে জমলো না। তাই তিনি বিড়ি কেনার পয়সা যোগাড়ের চেষ্টায় চাকরদের পকেট থেকে দুচারটা পয়সা চুরি করতে লাগলেন। আবার এলো সেই মিথ্যাভাষণ ও আত্মগোপনের তীব্র দংশন। কিন্তু বিড়ি কেনার মতো পয়সাও জোটে না। কেবল তাই নয়, পরাশ্রয়িতা, পর-নির্ভরশীলতা এবং গুরুজনদের কাছে অকারণ আনুগত্য, এগুলিও কিশোর গান্ধীকে ব্যস্ত করলো। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি আত্মহত্যাই স্থির করলেন। কিন্তু আত্মহত্যাও করতে পারলেন না। গান্ধীজি বলেন ঃ "আমি বুঝেছি, আত্মহত্যার কথা বলা সহজ, কিন্তু আত্মহত্যা করা সহজ নয়। সেজন্যে যখন কেউ আত্মহত্যার ধমক দেখায়, তখন তা আমার উপর খুব স্বল্পই প্রভাব বিস্তার করে, অথবা মোটেই প্রভাব বিস্তার করে না—একথা-ও বলা যেতে পারে।"

গান্ধীজির এই কথাগুলির প্রসংগে একথা উল্লেখ করা চলে, গান্ধীজি যতোবার 'আমরণ' অনশন করেছেন, সেগুলিকে তাঁর প্রতিপক্ষ প্রতিবারেই

বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছে যে, গান্ধীজি আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে 'ব্ল্যাকমেল' করতে চান। উপরের কথাগুলি থেকে সহজেই বোধগম্য হবে, আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে যে কারো ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা যায়, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে, কোনো ন্যায়সংগত দাবীর সমর্থনেই কেবল যখন অনশন করা হয়, তখনই তা সফল হ'তে পারে। অর্থাৎ অন্যায়কে অনশন ন্যায়সংগত করে না, বা শক্তিমান করে না। কেবল ন্যায়সংগতকে, নীতিসংগতকে অনশন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করতে পারে। তাই তাঁর কার্যের প্রতিবাদে যখন প্রতিক্রিয়াশীল কেউ অনশন করেছে, তখন তিনি অসংগত বোধে তাকে উপেক্ষা করেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস ছিল, যা ন্যায়সংগত, যা নীতিসংগত, অর্থাৎ যা সত্য তা মানুষের বিবেককে, বুদ্ধি চেতনাকে জাগ্রত করবেই। আর যা অন্যায়, তার আস্ফালন যতোই আকাশস্পর্শী হোক, তার প্রতারণার জাল যতোই মনোহর হোক, তার ব্যর্থতা অনিবার্য।

এই ধূমপান প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় থেকে চির-জীবনের জন্যে গান্ধীজি ধূমপান পরিত্যাগ করেন। একবার কোনো এক সিগারেট ব্যবসায়ী "মহাত্মা গান্ধী" নামে সিগারেট বার করেছিল। গান্ধীজি তাঁর ইয়াং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় তার প্রতিবাদে লেখেন ঃ "আমার নামের যতো প্রকার অপব্যবহার ঘটেছে, সেগুলির মধ্যে সিগারেটের সংগে আমার নামের ইচ্ছাকৃত যোগের মতো অপমানজনক আর কিছুই হয় নি। ধূমপানকে আমি পাপ ব'লে মনে করি।" ধূমপান মানুষের বিবেককে প্রাণহীন ক'রে দেয়। মদ্যের অপেক্ষা-ও তা অনিষ্টকর। কারণ তা অগোচরে কাজ করতে থাকে।"

ধূমপান সম্পর্কে টলস্টয়ের মতামত মনে পড়ে। তিনি-ও ওই একই

কথাই বলেছেন। তিনি বলেন, মদ্যপানের অপেক্ষা ধূমপান অনিষ্টকর। কারণ, লোকে মদ খেয়ে যে পাপ করতে সাহস করে না, ধূমপান ক'রে তারা তা সহজে করে।

আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ ক'রেই আমি গান্ধীজির শৈশব ও কৈশোরের কাহিনী শেষ করবো। প্রথমটি সত্যের শক্তি সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয়টি, পরধর্ম সম্পর্কে সচেতন সহিষ্ণুতা।

ভারতবর্ষে সত্য কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। ইংরেজিতে Truth বা Reality বলতে যা বোঝায়, কেবল তাই নয়। (যদিও মূল এবং প্রাথমিক অর্থে যা সৎ, অর্থাৎ যা আছে, তাই সত্য।) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এখানে হরিশ্চন্দ্র যে সত্যপালন করেছিলেন, তা অংগীকার বা শপথ, অর্থাৎ তা সত্যের ব্যাপকতর রূপ। গান্ধীজির কাছে সত্য হোলো চিন্তার সংগে চিন্তার, চিন্তার সংগে কার্যের এবং কার্যের সংগে কার্যের সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যবিধান-ই মহাত্মা গান্ধীর সত্য-প্রয়োগের শেষ কথা। পৃথিবীর দ্বন্দ্বশীল সমাজ-ব্যবস্থায় এই সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা এতই কঠিন যে, গান্ধীজির মতো প্রতিভাকে-ও জীবনে বহুবার অসামঞ্জস্যের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে, যার ফলে তাঁর প্রতিপক্ষরা, এমন কি অনেকক্ষেত্রে স্বপক্ষীয়েরা-ও, তাঁকে বিপরীতধর্মিতার দোষে দুষ্ট ব'লে তিরস্কার করতে বা তাঁকে কাপট্যের অপরাধে অপরাধী করতে বিন্দু-মাত্র দ্বিধাবোধ করে নি। মানুষকে কেন, সর্পকে-ও যখন তিনি মন্দ ব'লে বিশ্বাস করতে পারেন না, তখনই তিনি প্রত্যক্ষ করছেন মানুষের নৃশংসতা, অন্যায়, জিঘাংসা, স্বার্থপরতা। মন্দের সংগে ভালোর ওই সামঞ্জস্য বিধান করতে আজীবন চেষ্টা করেছিলেন তিনি, তাই তাঁকে প্রশান্ত গম্ভীর মহিমান্বিত এক বিশ্বাসের মধ্যে ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিতে

হয়েছে। গান্ধীজির কাছে সামঞ্জস্য বিধানই ছিল প্রকৃত সত্য, একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বিরুদ্ধভাবাপন্ন এই পৃথিবীতে, যার গতি, যার সংক্রান্তি নিরবধি ঘটছে আঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে, গান্ধীজি সেখানে তাঁর বিরাট শক্তি নিয়েও সামঞ্জস্য বিধান করতে এসে বিভ্রান্ত হ'য়ে গেছেন। জমিদার যখন প্রজাপীড়ন করছে, তখন-ও তিনি যেমন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তেমনি আবার উদ্বেলিত হ'য়ে পড়েছেন প্রজারা যখন জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তখন। এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্যেই জুলুদের বিদ্রোহে যখন তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে, তখন তিনি জুলুদের শত্রু পক্ষে থেকে সেবার কাজ করেছেন। তাই বৃটিশের সংগে যখন তাঁর চূড়ান্ত শত্রুতা চলছে, তখনো তিনি বৃটিশকে বারে বারে শক্তি-শালী করতে চেয়েছেন সেবা দিয়ে, সাহায্য দিয়ে, এমন কি যে হিংসাত্মক যুদ্ধের প্রতি তাঁর পূর্ণ বিরাগ রয়েছে, সেই যুদ্ধেও সৈন্য ও সরঞ্জাম দিয়ে। পৃথিবীতে ঘৃণাও সত্য, ভালোবাসাও সত্য, বিদ্বেষ-ও সত্য, মৈত্রী-ও সত্য। কিন্তু এই খণ্ড সত্যকে, বিপরীতধর্মী সত্যকে গান্ধীজি স্বীকার করেন নি। তাঁর কাছে সত্য অখণ্ড, অদ্বিতীয়। তা খণ্ডিত বা দ্বন্দ্বিত নয়, অব্যয়, পরম। এই ধরণের দার্শনিক যাঁরা, তাঁরা পৃথিবীকে প্রধানত তিনটি বিকল্প রূপে দেখেন। এক দল : তাঁরা দেখেন পৃথিবীকে শোপেনহাউয়ের-নীটশে গোষ্ঠীর মতো কুৎসিতরূপে, যেখানে সন্দেহ, সংশয়, বেদনা, যন্ত্রণা, শাসন, অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নেই। অন্যদল : তাঁরা খৃস্টান বা বৈষ্ণব দার্শনিকদের মতো দেখেন সমস্তই সুন্দর, সমস্তই প্রেম, সমস্তই মৈত্রী, সমস্তই শান্তি। আর একদল : তাঁরা ভালো-মন্দ, প্রেম-ঘৃণা সুন্দর অসুন্দরের ঊর্ধ্বে ব'লে বিশ্বাস করেন পরম সত্যকে। সুতরাং জাগতিক ঘটনা তাঁদের কাছে মায়া মাত্র। সে সমস্ত বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

দ্বিতীয় দলের মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। পৃথিবী তাঁর কাছে ছিল সৌন্দর্যময়, প্রেমময়। তাই মহাত্মার অ্যাবসোলিউট বা অখণ্ড সত্যের মধ্যে হিংসার স্থান নেই, বিদ্বেষের স্থান নেই, ঘৃণার স্থান নেই—তা কেবল প্রেম, কেবল ক্ষমা, কেবল অহিংসা। তাই গান্ধীজি হিংসার সংগে অহিংসার, ঘৃণার সংগে প্রেমের, বিদ্বেষের সংগে মৈত্রীর, কুৎসিতের সংগে সুন্দরের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছেন সমস্ত জীবন। তাই পৃথিবীর অমোঘ নিয়মে মহাত্মার সেই সামঞ্জস্য-বিধানের পরিণতি ঘটেছে ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যুতে, মানব-বিষধরের গুপ্ত দংশনে। তবু-ও এই অখণ্ড সত্যের পূজারী, এই সামঞ্জস্য-বিধায়ক-প্রতিভার স্থান চিরদিনই থাকবে পৃথিবীর কোটি কোটি মানবের গৌরবশিখর-শীর্ষে, বুদ্ধ, খৃস্ট ও চৈতন্যের দক্ষিণে, কিম্বা বামে। কারণ, এই বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের মহান স্বপ্ন-কল্পনা এক বিরাট শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব প্রয়াস। তাই মহাত্মা এক কল্পিত সত্যের অতুলনীয় শিল্পী, অদ্বিতীয় প্রয়োগকর্তা।

কৈশোরে সত্যের রূপটি মহাত্মার কাছে ধরা দিয়েছিল সত্য-পালন অর্থাৎ শপথ-রক্ষা এবং সত্যবাদিতার মধ্য দিয়ে। চিন্তার সংগে চিন্তার, চিন্তার সংগে কার্যের সামঞ্জস্য বিধান করতে হ'লে সর্ব প্রথমে প্রয়োজন কথার সংগে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা, অর্থাৎ অংগীকার পূরণ এবং কাজের সংগে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা, অর্থাৎ সত্যভাষণ। তাই গান্ধীজির পরবর্তী জীবনে আমরা দেখি, নিজের অংগীকার অনুসারে কাজ করার জন্যে তাঁর নির্ভীক তেজ এবং সত্যভাষণ ব্যাপারে তাঁর অকুণ্ঠ অটল দৃঢ়তা। কিন্তু এই সদা-সত্যপালনের ও সদা-সত্যভাষণের নির্ভীক বীর্য লাভ কেমন

ক'রে সম্ভব ? সত্যের মধ্য দিয়েই গান্ধীজি সে-বীর্যের সন্ধান-ও পেয়েছিলেন কৈশোরেই। সেই কাহিনীটি বলছি :

গান্ধীজির মেজদার পঁচিশ টাকার মতো ধার হয়েছিল। সেই টাকা কেমন ক'রে শোধ দেওয়া যায়, সে এক বিষম সমস্যা হ'য়ে উঠলো দু ভাইএর কাছে। অবশেষে স্থির হোলো, বাপ-মার অজ্ঞাতে মেজদার হাতের সোনার নিরেট তাগার খানিকটা বিক্রি ক'রে দেওয়া যেতে পারে। গান্ধীজির নিজের কথায় : "তাগা কাটলাম। ঋণ শোধ হোলো। কিন্তু আমার পক্ষে এই কাজ অসহ্য হয়ে উঠল। এর পর আর চুরি না করা স্থির করলাম। বাবার কাছে সমস্ত স্বীকার ক'রে ফেলা দরকার— এইরূপ মনে হতে লাগল। কিন্তু জিভ সরে না। বাবার কাছে যে মার খাব সে ভয় ছিল না। তিনি কোনোদিন আমাদের কোনো ভাইকে তাড়না ক'রেছেন বলে-ও স্মরণ হয় না। কিন্তু তিনি খুব দুঃখ পাবেন, হয়তো মাথা কুটবেন। অথচ এই বিপদের ভয় রেখে-ও দোষ স্বীকার করা চাই। নইলে যে শুদ্ধি হবে না।"

গান্ধীজি একটি চিঠিতে বাবাকে অপরাধের কথা জানালেন। পুত্রের এই সত্য স্বীকারে পিতার চক্ষু অশ্রুতে ভ'রে গেলো। পিতা সস্নেহে পুত্রকে ক্ষমা করলেন। "এই প্রকার শান্ত ক্ষমা পিতৃদেবের স্বভাবের প্রতিকূল ছিল। আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে, তিনি রাগ করবেন, কটুবাক্য বলবেন, হাত বা মাথা কুটবেন। কিন্তু তিনি দেখালেন অপার শান্ত ভাব। আমার দোষ-স্খালনকারী স্বীকৃতিই এর কারণ ব'লে আমি মনে করি।" গান্ধীজির মতে, সেদিন তিনি তাঁর পিতাকে সত্যাচরণের দ্বারা জয় করেছিলেন। সত্যের প্রশান্ত বীর্যই তাঁর কোপনস্বভাব পিতাকে পরাভূত করেছিল। কেবল তাই নয়, পিতার অশ্রু—যা ছিল প্রেম ও

অহিংসা, তাই জয় করেছিল তাঁর কিশোর পুত্রকে। পরবর্তী কালে গান্ধীজি বলেন, "তখন অবশ্য আমি এতে (পিতার ক্ষমা-শান্ত অশ্রু-বিসর্জনে) পিতার প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখি নি। কিন্তু আজ আমি এতে শুদ্ধ অহিংসারই পরিচয় পাচ্ছি। এইরূপ প্রেম যাকে ব্যাপক ভাবে পেয়ে বসে, সে ব্যক্তির স্পর্শে কে না গলে যাবে?"

এমনি ভাবে কৈশোরেই মহাত্মাজির সত্যের এবং অহিংসার বিজয়ী শক্তির অভিজ্ঞতা ঘটেছিল।

গান্ধীজির ধর্মভাব এবং পরধর্ম-সহিষ্ণুতাও জন্মেছিল শৈশবেই। ভূতের ভয়ে গান্ধীজি যখন কাতর হতেন, তখন তাঁর দাই রম্ভা বাঈ তাঁকে বোঝাতো, রাম নাম করলে ভূতের ভয় থাকে না। পরবর্তী জীবনে গান্ধীজি বলেন, "রাম নাম আজ আমার কাছে অমোঘ শক্তি। রম্ভা বাঈএর রোপিত বীজই তার কারণ ব'লে মনে করি।"

ভূতের ভয়ের মতো একটা ভীরুতা থেকেই যে ভগবানের জন্ম, তা আধুনিকরাও স্বীকার করেন!

বিলাতে অবস্থান-কালের বর্ণনা প্রসংগেও গান্ধীজি বলেন: "রোজ ঈশ্বরের নিকট আমাকে রক্ষা করার জন্যে প্রার্থনা করতাম। তাঁর অনুগ্রহও পেয়েছিলাম। ঈশ্বর কে তা আমি জানি না। কিন্তু সেই রম্ভার দেওয়া শ্রদ্ধা নিজের কাজ করছিল।"

রাজকোটে থাকা কালে শৈশবেই গান্ধীজি, হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও পারসী ধর্মাবলম্বীদের সংস্রবে আসেন। এঁরা সকলেই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। ফলে এই সকল ধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা শৈশবেই তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। বাকী ছিল একমাত্র খৃস্টান ধর্ম। খৃস্টান ধর্মের প্রতি প্রথমে গান্ধীজির ছিল অভক্তি। কারণ, হাইস্কুলের এক কোণে দাঁড়িয়ে

পাদরীরা যখন খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিত, তখন তারা হিন্দু ও হিন্দুর দেবতাদের গালাগালি করতো। কিন্তু গান্ধীজি পরবর্তী জীবনে খৃস্টান ধর্মের প্রতি এমন আকৃষ্ট হন এবং খৃস্টের বাণীগুলিকে এমনভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করেন যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে খৃস্টের সংগে গান্ধীজির নাম আজ অবিচ্ছেদ্য হ'য়ে পড়েছে। কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ খৃস্টান একথা-ও বলেছেন, গান্ধীজির জীবনের সংগে খৃস্টের জীবনের বহু ঘটনার হুবহু মিল দেখা যায়। এ কথা অত্যন্ত সত্য। খৃস্টান শাস্ত্রের 'সারমন অন দি মাউণ্ট' অধ্যায়টি গান্ধীজিকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট ও অভিভূত করেছিল।

এইরূপেই এই মানব-বনস্পতির পূর্বাভাস আমরা শৈশবে এবং কৈশোরে অংকুরে লক্ষ্য করি।

কৈশোরেই গান্ধীজির পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে গান্ধীজি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বোম্বাই থেকে বিলাত রওনা হন। তখন তাঁর বয়স উনিশ বৎসর এবং তিনি সন্তানের পিতা।

দুই

ম্যাট্রিক পাশ করার পর গান্ধীজি ভাওনগরে শামলদাস কলেজে পড়তে যান। কিন্তু মুস্কিল হোলো, কলেজের লেক্‌চার তিনি বুঝতে পারেন না। অথচ প্রফেসরদেরও কোনো দোষ ছিল না। তখনকার দিনে শামলদাস কলেজে যাঁরা অধ্যাপনা করতেন, তাঁরা সকলেই প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক ব'লেই ছিলেন পরিচিত। ঐ সময় প্রথম কয়েক মাসের পড়া শেষ ক'রে গান্ধীজি বাড়ি ফিরে এলে তাঁদের পরিবারের এক হিতৈষী বন্ধু বললেন, "এখন দিনকাল বদলেছে। ছেলেদের মধ্যে কাউকে যদি কাবা গান্ধীর স্থান নেওয়াতে হয়, তবে শিক্ষিত না করলে চলবে না।" তিনি আরো বললেন, মোহনদাসকে বিলাত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার ক'রে আনাই সব চেয়ে ভালো। তাহ'লে বাবার চাকরিটা সে অনায়াসে পেতে পারবে। এই প্রস্তাবে গান্ধীজিরও কোনো আপত্তি ছিল না। "আমাকে বিলাত পাঠালে তো খুব ভালোই হয়। কলেজে তাড়াতাড়ি পাস করতে পারব মনে হয় না।"

কিন্তু গান্ধীজির ইচ্ছা ছিল বিলাতে গিয়ে ডাক্তারি শেখা। আমরা পরে লক্ষ্য করবো, জনসেবা ও জনকল্যাণের কারণেই হোক, কিম্বা সহজাত কোনো প্রবণতার ফলেই হোক, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে গান্ধীজি চিরদিন আলোচনা, গবেষণা ও অনুশীলন ক'রে এসেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁর "স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশ" (Guide to Health) পুস্তকখানিতে।

তিনি পরবর্তী জীবনে জার্মাণ জল-চিকিৎসক ডাক্তার লুই কুহ্নে-র জল-চিকিৎসক পদ্ধতিতে-ও গভীর বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। এমন কি জল-চিকিৎসা

ক'রে তিনি নিজের পুত্রের কঠিন টাইফয়েড রোগও সারিয়ে তোলেন।

ডাক্তারির প্রতি একটি সহজ প্রণবতা থাকা সত্ত্বে-ও পারিবারিক কারণে ডাক্তারি পড়া গান্ধীজির হোলো না। দাদা প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "বাবা তা পচ্ছন্দ করতেন না। তোমার কথাতেই বলতেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের হাড়-মাংস কাটার কাজ করতে নেই। বাবার ইচ্ছা ছিল তুমি উকীল হও।"

স্থতরাং ব্যারিস্টার হওয়াই স্থির হোলো। টাকা পয়সাও কোনো রকমে হোলো সংগ্রহ। কিন্তু ছেলেকে বিলাত পাঠানো মায়ের পছন্দ হোলো না। ছেলেরা বিলাত গিয়ে মদমাংস খায়, মেয়ে নিয়ে বিগড়ে যায়। কিন্তু গান্ধীজি মাকে বোঝালেন, "……আমি তোমাকে প্রতারণা কোরব না। দিব্যি নিয়ে বলছি, ঐ তিন বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচাব।"

গান্ধীজি এই শপথ গ্রহণ করায় মা তাঁকে বিলাত যাওয়ার আদেশ দিলেন।

কিন্তু আরো একটি অন্তরায় দেখা গেলো। জাতের প্রধানরা একত্রিত হ'য়ে এই বিলাত-যাত্রার বিরোধিতা করতে লাগলেন, গান্ধী-পরিবারকে জাতিচ্যুত করার ভয় দেখালেন। কিন্তু গান্ধীজির দাদা তাতে ভয় পেলেন না। কনিষ্ঠের বিলাত-যাত্রার সকল স্থব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

ঐ সময় জুনাগড় থেকে এক উকীল, ত্র্যম্বক রায় মজুমদার-ও ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে বিলাত যাচ্ছিলেন। তিনিই হোলেন মোহনদাসের পথের সংগী।

জাহাজে অনেকের সমুদ্র-রোগ হয়, গা বমি-বমি করে। গান্ধীজির তা হয় নি। জাহাজে সবচেয়ে তাঁর অস্থবিধা হচ্ছিল কথা বলা সম্পর্কে।

কারণ, সবার সংগেই ইংরেজিতে কথা বলতে হয়। এ-ব্যাপারে কিন্তু মজুমদারের কোনো বালাই ছিল না। তাঁর মতে ইংরেজি বিদেশীর ভাষা, সুতরাং ভুল-চুক তাতে হবেই। তা নিয়ে ব্যস্ত হ'লে চলবে না। ভুল ইংরেজি তিনি অনর্গল বলতেন এবং গান্ধীজিকে-ও তাই করার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু গান্ধীজি ছিলেন লাজুক। ভুল বলতে তাঁর বড়ো লজ্জা করতো, আর ভুল করার ভয়টা-ও ছিল ভয়ানক। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে নীরব থাকতে হোতো। এই সময় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক গান্ধীজির সংগে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আলাপ করেন এবং খাওয়া দাওয়ার সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকেন। গান্ধীজির নিরামিষ আহারের কথা শুনে হো হো ক'রে হেসে ওঠেন, বলেন, "বিস্কে উপসাগরে গিয়ে পৌছলেই বুঝতে পারবে। ইংল্যাণ্ডে যা শীত, তাতে মাংস ছাড়া চলেই না।"

কিন্তু বিস্কে উপসাগরে এসে-ও গান্ধীজি দেখলেন, মাংসাহারের কোনো প্রয়োজন নেই।

গান্ধীজি সাদাম্পটন বন্দরে এসে পৌছলেন। তাঁর কাছে চারখানি পরিচয়পত্র ছিল—ডাক্তার প্রাণজীবন মেহ্‌তা, দৌলতরাম শুক্ল, প্রিন্স রণজিৎ সিংজী ও দাদাভাই নওরোজীর নামে। সাদাম্পটন থেকে ডাক্তার মেহতার নামে একটা তার ক'রে দিয়ে মজুমদারের সংগে গান্ধীজি ভিক্টোরিয়া হোটেলে এসে উঠলেন। যথাসময়ে ডাক্তার মেহতা এলেন এবং তিনি তাঁর পরিচিত এক ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে গান্ধীজির থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ইংরেজ বন্ধুটি গান্ধীজিকে নিজের কনিষ্ঠ সহোদরের মতো দেখতে লাগলেন, ইংরেজি রীতিনীতি আদব কায়দা শেখালেন। ইংরেজি

বলাও-অভ্যাস হোলো। যতো গোলযোগ করলো কিন্তু খাদ্যটা। নুন আর মশলাবিহীন শাক-সব্জী। সকালে ওট মিলের জাউ। বিকালে প্রায় অনাহার। ইংরেজ বন্ধুটি মাংসাহারের জন্যে নানা উপদেশ, পরামর্শ, প্রলোভন দিতে লাগলেন। কিন্তু গান্ধীজি অটল। তিনি তাঁর শপথের কথা জানালেন। অবশ্য মাঝে মাঝে দুর্বলতা-ও বোধ করলেন। ইংরেজ বন্ধুটি হতাশ হলেন না। তিনি বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজম বা ব্যবহারিকবাদ বিষয়ক লেখা প'ড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু তার কীই বা প্রয়োজন ছিল? দেশেই তো গান্ধীজি মনুস্মৃতি পড়েছিলেন এবং মনুস্মৃতিতে মাংসাহারের সমর্থন-ই পেয়েছিলেন। তখন সর্পাদি জীব ও পোকামাকড় মারা তাঁর কাছে নীতিসংগত বোধ হ'য়েছিল। কিন্তু তাই ব'লে তো শপথ ভাঙা যায় না! তাই শুভাকাংখী ইংরেজ বন্ধুটিকে সবিনয়ে তিনি জানালেন, "মাংস খাওয়া উচিত—এ কথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞার বন্ধন আমি ছিঁড়তে পারব না।"

বন্ধু-ও এবিষয়ে নিরস্ত হ'লেন, তাঁর ভয় হচ্ছিল, এইভাবে ইংল্যাণ্ডে থাকা গান্ধীজির পক্ষে সম্ভব হবে কিনা।

ওখানে মাস খানেক ধ'রে আদব-কায়দার শিক্ষানবিশী শেষ হবার পরে গান্ধীজিকে অন্য একটি পরিবারে ভর্তি ক'রে দেওয়া হোলো। এখানেও আহারের অসুবিধা ছিল প্রচুর। কিন্তু গান্ধীজি এই সময় ফেরিংডন স্ট্রীটে একটি ভেজিটেরিয়ান্ রেস্তোরাঁর সন্ধান পান, কাজেই তাঁর আহারের অসুবিধাটা প্রায় দূর হয়। এখানে তিনি সল্টের লেখা নিরামিষ আহার সম্পর্কে একখানা বই-ও পান। ফলে এতোদিন যে-নিরামিষ আহার তাঁর কাছে শপথ মাত্র ছিল, তা তাঁর কাছে যুক্তিসংগত, বিজ্ঞানসংগত, স্বাস্থ্য-সংগত হ'য়ে উঠলো। এখন থেকে তিনি নিরামিষাশিতার সমর্থক হ'য়ে

উঠলেন। সল্ট সাহেবের বইখানা প'ড়ে তিনি যে-সব যুক্তি পেয়েছিলেন, তা আরো পুষ্ট হোলো হাউয়ার্ড উইলিয়ামসের লেখা আহার-নীতি (Ethics of Diet) প'ড়ে। এই বইখানিতে বিভিন্ন যুগের জ্ঞানী মহাজনদের আহারের এবং আহার্য সম্পর্কে তাঁদের মতামতের বর্ণনা ছিল। পাইথাগোরাস এবং যিশু যে নিরামিষাশী ছিলেন, তা প্রমাণ করার চেষ্টা-ও ছিল। এর পর ডাক্তার মিসেস অ্যানা কিংসফোর্ডের লেখা একখানি বই এবং ডাক্তার এলিন্‌সনের কিছু লেখা গান্ধীজির যুক্তিকে আরো পুষ্ট করে। গান্ধীজি বলেন, "এই সকল পুস্তক পড়ার ফল এই হোলো যে, আমার জীবন খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা করার একটা বড়ো স্থানরূপে গড়ে উঠল। এই সকল পরীক্ষা প্রথম প্রথম কেবল স্বাস্থ্যের দিক থেকেই করতাম। পরে ধর্মের দিক থেকে-ও এই সকল পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে।"

বিলাতে তাঁর প্রথম দিনগুলি সম্পর্কে গান্ধীজি বলেন: "এখনো পাঠাভ্যাস আরম্ভ করি নি। সংবাদপত্র পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। এই আরম্ভটা ভাই শুক্লের কৃপায় হ'য়েছিল। ভারতবর্ষে আমি কখনো সংবাদ-পত্র পড়ি নি। অনবরত পড়তে পড়তে পড়ার সখ হোলো। ডেলী নিউজ, ডেলী টেলিগ্রাফ, পলমল গেজেট ইত্যাদি সংবাদপত্রের উপর চোখ বুলাতাম।"

শীঘ্র মধ্যেই গান্ধীজি অনুভব করলেন, এবার তাঁর সাদাসিদে পোশাক ছেড়ে একটু সৌখিন হওয়া-ও প্রয়োজন। সুতরাং অচিরে বেশভূষায় পরিবর্তন দেখা গেলো। সে-পরিবর্তন কেবল পরিবর্তন নয়, একেবারে বিপ্লব। কিন্তু কেবল পরিচ্ছদের পারিপাট্য-ও তাঁর যথেষ্ট মনে হোলো না। তিনি ইংরেজ-পুরুষদের মতো নাচ শিখ্‌তে শুরু করলেন। আবার নাচের তালে পা ফেলানো নিয়ে ঘটলো এক বিভ্রাট। তাল সম্বন্ধে কান দুটোকে

সজাগ করার জন্যে শুরু হোলো বেহালা-শিক্ষা। কিন্তু নাচ জানলেই তো সভ্য হওয়া যায় না! ইংরেজ সমাজে কাল্‌চার্ড ব'লে পরিচিত হ'তে হ'লে চাই ফরাসী ভাষা জানা। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস থাকাও প্রয়োজন। গান্ধীজি ফ্রেঞ্চ শিখতে লাগলেন। বক্তৃতার জন্যে বেল সাহেবের লেখা "ট্যাণ্ডার্ড ইলোকিউশনিস্ট" বইখানিও কিনলেন। বক্তৃতার পাঠ শুরু হোলো পিটের বক্তৃতা দিয়ে।

কিন্তু শীঘ্রই গান্ধীজির মোহ ভাঙলো। কী প্রয়োজন তাঁর নাচে, ফরাসী ভাষায়, বক্তৃতায়? বিদ্যার্থী তিনি। বিদ্যা অর্জন করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং গান্ধীজি এবার বিদ্যাভ্যাসে মন দিলেন। গান্ধীজির জীবনে এক নূতন যুগের পত্তন হোলো—জ্ঞানার্থীর যুগ। কিন্তু তাঁর এই জ্ঞানার্জন যে অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঘটেছিল, তা আমরা পরে যথাস্থানে লক্ষ্য করবো।

গান্ধীজি পড়াশুনায় মন দিলেন। স্থির করলেন, তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন। সেজন্যে তিনি লাতিন এবং ফরাসীভাষা শিখতে লাগলেন। প্রতি ছয় মাসে পরীক্ষা হয়। প্রথম বারের পরীক্ষায় গান্ধীজি ফেল করলেন—গোলযোগটা ঘটলো লাতিন ভাষায়। কিন্তু পরবর্তী পরীক্ষায় তিনি ভালোভাবেই পাশ করলেন। এই সময় থেকে গান্ধীজির মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধনার-ও সূত্রপাত হোলো। গান্ধীজি ব্যয়সংকোচের জন্যে ইংরেজ পরিবারের বাইরে এসে দু খানি কামরা ভাড়া নিয়ে থাকতে লাগলেন। এতে তাঁর অর্থ এবং সময় দু-ই প্রভূত পরিমাণে বাঁচলো। নিজের রান্না-ও তিনি নিজে ক'রে নিতে লাগলেন। ফলে, খাদ্য সম্পর্কে নানা রকম পরীক্ষা-প্রতিপরীক্ষা শুরু হোলো। এই পরীক্ষা ও প্রতিপরীক্ষার ফল পরবর্তীকালে সত্য ও অহিংসার অংগ রূপে তাঁর জীবনে একটি বিশিষ্ট

স্থান অধিকার করেছিল। এই সময়ে কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে, গান্ধীজি বলেন, তাঁর অন্তর ও বাহিরের মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল। জীবনের মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল, তিনি অপার আনন্দভোগ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মনে হোতে পারে, এ কেমন আনন্দ? বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করা, নিজেকে একটা নিয়মের খাঁচায় পুরে আটকে রাখা, এতে আবার আনন্দ কী? এর উত্তরে বলবো, বিরাট একটা অংকের যোগফল যখন মিলে যায়, তখন অংক-কর্তার যে মানসিক আনন্দলাভ হয়, এ-ও ঠিক তেমনি। অংকের যোগফল নির্ভুল হ'লে সুস্পষ্টভাবে কোনো দৈহিক উপভোগ ঘটে না একথা সত্য, কিন্তু তাতে মনের এবং মস্তিষ্কের (যদি-ও সেগুলি দেহেরই অংশমাত্র) মধুর একটি অনুভূতি ঘটে। কারো কারো কাছে সেই 'মানসিক' আনন্দ 'দৈহিক' আনন্দের চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। গান্ধীজীর কাছে-ও হয়েছিল তাই। "প্রতিজ্ঞা-পালনের স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ও স্থায়ী স্বাদ আমার কাছে সেই (উপভোগের) ক্ষণিক স্বাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় লাগলো।"

এমনি ভাবেই অল্প দিনের মধ্যে গান্ধীজি নিরামিষ আহারের একজন উৎসাহী সমর্থক হ'য়ে উঠলেন। তখন তিনি বেজওঅটারে থাকতেন। সেখানে নিরামিষাশীদের একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। ক্লাব গ'ড়ে উঠলো। ওই পাড়ায় থাকতেন কবি সার এডউইন আর্ণল্ড। তিনি হোলেন এই ক্লাবের সহকারী সভাপতি এবং ডাঃ ওল্ডফীল্ড হ'লেন সভাপতি। এই ক্লাবের আলাপ-আলোচনায় কিন্তু গান্ধীজি অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। বলবার মতো তাঁর অনেক কথা ছিল, কিন্তু বলতে কেমন যেন লজ্জা করতো। বুকের মধ্যে শুরু হ'য়ে যেতো হাতুড়ির ঘা, হাপরের মতো হাঁপাতো বুকটা। ডাঃ ওল্ডফীল্ড গান্ধীজিকে এ-বিষয়ে

তিরস্কৃত এবং উৎসাহিত করতেন। কিন্তু গান্ধীজি কোনো মতেই জোর পেতেন না। এমন কি লিখিত রচনা পাঠ করতে গিয়ে-ও বিব্রত হ'য়ে পড়তেন।

নিরামিষাশী ক্লাবের অন্যতম সদস্য ছিলেন ডাঃ এলিন্সন। কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের তিনি ছিলেন উগ্র-প্রচারক। কিন্তু নিরামিষাশী ক্লাবে অনেক সদস্য কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণকে আতংকের চক্ষে দেখতেন, তাই তাঁরা ডক্টর এলিন্সনকে এই ক্লাব থেকে বিতাড়িত করতে চাইলেন। কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গান্ধীজির মতামত ভারতবাসীর নিকট সুবিদিত। তিনি ব্রহ্মচর্যের পক্ষপাতী, কৃত্রিম জন্মনিরোধের ঘোরতর বিরোধী। (এ-বিষয়ে আমরা পরে বিভিন্ন স্থলে আলোচনা করবো।) কিন্তু তা সত্ত্বে-ও গান্ধীজি ডাঃ এলিন্সনেরই পক্ষ সমর্থন করতে চাইলেন। কারণ, অন্য বিষয়ে ডাঃ এলিন্সনের মতামত যাই হোক না কেন, নিরামিষাশী ক্লাবের সংগে তার কোনো সংযোগ নেই। তিনি যতোক্ষণ নিরামিষাশী থাকবেন, ততোক্ষণ এই ক্লাবের সভ্য থাকার ন্যায়সংগত অধিকার তাঁর থাকবেই। নিজের মতামত ব্যক্ত ক'রে গান্ধীজি একটি বক্তৃতা লিখলেন। কিন্তু কার্যকালে আবার তাঁর অভ্যস্ত লজ্জা এসে বাধা দিলো। প্রবন্ধটি পড়লেন আর একজন।

পরবর্তী কালে গান্ধীজি যখন অসাধারণ বাক্‌নৈপুণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রথম জীবনের এই লাজুক ভাবের জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দেন। বলেন, বাচালতা মানুষকে আজে-বাজে কথা বলতে বাধ্য করে। ফলে, মানুষ নিজের অতর্কিতে অনেক সময় মিথ্যা-ভাষী হ'য়ে ওঠে। তাই গান্ধীজি তাঁর জীবনে সত্যসাধনার অংগরূপে স্বল্পভাষিতার আশ্রয় নিতেন, এবং নিয়মিত ভাবে মৌনব্রত অবলম্বন করতেন। তিনি বলেন: "অভিজ্ঞতা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে যে,

সত্যের পূজারীকে মৌনের সেবা করতে হয়"। তিনি বলেন, সত্যের পূজায় তাঁর লাজুকতা থেকে তিনি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য-ও পেয়েছিলেন। অবশ্য লাজুকতার ফলে একবার সত্য গোপন ক'রে যে বিপদে পড়েছিলেন, সে-কথা-ও তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি তাঁর বিলাতে থাকার প্রথম বৎসরে ঘটেছিল। ব্যাপারটি সাধারণ মানুষের কাছে কৌতুক-কর হ'লে-ও গান্ধীজির কাছে তা ছিল একটি সংগ্রামের বস্তু। এক দিন ব্রাইটনের এক হোটেলে তিনি খেতে ওঠেন। কিন্তু খাবারের তালিকাটি ফরাসী ভাষায় লেখা থাকায় তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়। তাঁর টেবিলে এক প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলাও ছিলেন। তিনি গান্ধীজিকে সাহায্য করলেন। ফলে প্রৌঢ়া মহিলাটির সংগে গান্ধীজির বন্ধুত্ব খুব জমে উঠলো। গান্ধীজি নিয়মিতভাবে ঐ ভদ্রমহিলার বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন। ঐ বাড়িতে এক তরুণী ইংরেজ মহিলার সংগে গান্ধীজির আলাপ হোলো এবং আলাপটা ক্রমেই নিবিড়তর হ'য়ে উঠলো। তিনি এ-ও লক্ষ্য করলেন যে, এই মহিলাটির সংগে অবাধ মেলা-মেশার জন্যে নানা প্রকারে সুযোগ ক'রে দেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজির সত্যাশ্রয়ী মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। তিনি বুঝলেন, ত্রুটি তাঁরই হয়েছে। প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলাকে তাঁর আগেই জানানো উচিত ছিল যে তিনি বিবাহিত, এবং সন্তানের পিতা। ব্যাপারটি গান্ধীজির কাছে প্রতারণা ও মিথ্যাভাষণের সমান হ'য়ে উঠলো। তিনি কোনোমতেই শান্তি পেলেন না, তাই অবিলম্বে প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলাটিকে একটি পত্র লিখে তাঁর স্নেহের জন্যে বহু ধন্যবাদ দিয়ে নিজের সত্য পরিচয় গোপন করার জন্যে মার্জনা চাইলেন। জানালেন, "যে-ভগ্নীর সংগে আপনি আমার পরিচয় ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর সংগে আমি কোনো রূপ অযোগ্য আচরণ করি নি। কতোদূর যে যাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে।" এই চিঠির

জবাবে শীঘ্রই সস্নেহ মার্জনা এসে পৌছলো। প্রৌঢ়া লিখলেন : "তোমার উদার মনের পরিচয় পেলাম। আমরা দু জনেই খুব খুশী হয়েছি, আর ভারি হেসেছি। আগামী রবিবার আমরা তোমার পথ চেয়ে থাকবো—তোমার বাল্যবিবাহের গল্প শুনবো এবং তোমাকে ঠাট্টা-তামাসা ক'রে আনন্দ পাবো ”

গান্ধীজি বলেন, তাঁর মধ্যে অসত্যের যে বিষ প্রবেশ করেছিল, সেদিন এমনি ভাবেই তার অপসরণ ঘটলো।

বিলাতে আসার পরেই ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে গান্ধীজির কৌতূহল এবং উৎসাহ জন্মে। অবশ্য সেজন্যে কয়েকটি ব্যক্তির প্রভাব বিশেষরূপে দায়ী। বিলাত প্রবাসের এক বছর বাদে দু জন থিওজফিস্টের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁদের সংগে গান্ধীজি গীতাপাঠ শুরু করেন। এর আগে তিনি সংস্কৃতে কিংবা গুজরাটিতে কোনোদিন গীতা পড়েন নি। অবশ্য, আগেই বলেছি, বাড়িতে বাবাকে গীতা পড়তে তিনি প্রায়ই দেখেছেন। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকগুলির মধ্যে "ধ্যায়তোবিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদি শ্লোকগুলি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। এই শ্লোকগুলিতে বলা হ'য়েছে : বিষয়-চিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি থেকে কামনা—কামনা থেকে ক্রোধের উদ্ভব হয়। ক্রোধ থেকে মূঢ়তা এবং মূঢ়তা থেকে জন্মে বিভ্রম। বিভ্রম থেকে জ্ঞানের নাশ হয়। আর যার জ্ঞানের নাশ হয়, সে মৃত-তুল্য।" গান্ধীজি যাকে-ই সত্য ব'লে স্বীকার করেছেন, তাকেই তিনি নিজের জীবনে,—সবার জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। গান্ধীজির মধ্যে সমাজ চেতনা যথেষ্ট প্রবল ছিল। তাই তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগ করতে চেয়েছেন—সমাজের বাইরে গিয়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে নয়—সমাজের মধ্যে ফিরে এসে। তাই তিনি

সমস্ত জীবন ধ'রে বিষয়-আসক্তি সম্পর্কে উপলব্ধ তাঁর এই মহাসত্যকে চূড়ান্ত বিষয়-আসক্তির মধ্যেই প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। আমাদের সমাজে এই বিষয়-আসক্তির নাম রাজনীতি ও অর্থনীতি। মহাত্মাজি তাঁর জীবনে একদিকে যেমন অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যকে মেনে নিয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি তেমনি মেনে নিয়েছিলেন অসংখ্য মানুষকে। অবশ্য পরবর্তী কালে আমরা লক্ষ্য করবো, তাঁর এই তথাকথিত সত্য এবং অহিংসা তাঁকে অসংখ্য মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, গণ শব্দটি হিংসার সংগে হ'য়ে উঠেছে একার্থক। তাই গণ শব্দে হয়েছে তাঁর আতংক, বহুতে তাঁর অবিশ্বাস। যাই হোক, তাঁর কর্মজীবনের প্রথম দিকে একদা তিনি এক ও অখণ্ড সত্যের অন্যান্য পূজারীদের মতো সংসার ত্যাগ ক'রে গিরিগুহাবাসী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী হন নি। তিনি ফিরে এসেছিলেন সেদিন সন্ন্যাসী-বেশে কোটি কোটি মানুষের গৃহে। কোটি কোটি মানুষের গৃহই হয়েছিল তাঁর আশ্রম, তাঁর যোগ-সাধনের স্থল। তাই তাঁর পরম 'এক' একদা অসংখ্যের সংগে একাকার হ'য়ে গিয়েছিল। তাই তিনি বুদ্ধের মতো সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিবাগী হ'য়ে সাম্রাজ্য ত্যাগ করলেন না, তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে ফিরে এলেন কোটি কোটি ভারতীয়ের মুকুটহীন সম্রাট হ'য়ে —তাদের রাজনীতির, অর্থনীতির, সমাজনীতির, ধর্মনীতির দৈনন্দিন সমস্যার মধ্যে। অন্যান্য ভারতীয় যোগী বা ধর্মগুরুর সংগে এখানেই গান্ধীজির মূল পার্থক্য। তিনি অন্যান্য ভারতীয় সন্ন্যাসীর মতো অসংখ্য ক্ষুদ্রকে ত্যাগ ক'রে এক পরম বিরাটের সন্ধানে গেলেন না। তিনি এলেন সেই অদ্বিতীয় পরম বিরাটের সন্ধানে অসংখ্য ক্ষুদ্রের মধ্যে। আর এই কারণেই এমন কি ভারতীয়েরা-ও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারলো না। তারা সহস্র সহস্র বৎসর ধ'রে দেখে এসেছে, অখণ্ড একের সাধনায়

সন্ন্যাসীরা সকল পার্থিব ক্ষুদ্রকে ত্যাগ করেছেন। তাঁরা তো এমনি ভাবে কই অখণ্ড অদ্বিতীয়ের সন্ধানে সংখ্যাতীত ক্ষুদ্রের মধ্যে ফিরে আসেন নি! সেদিক থেকে পৃথিবীতে গান্ধীজির তুলনা নেই। এমন কি নেই বুদ্ধের মধ্যে, খৃস্টের মধ্যে। গান্ধীজির কাছে ধর্ম ছিল অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের উপলব্ধি। আর এই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র সম্ভব ছিল তখনই, যখনই তাকে অসংখ্য মানুষের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ঘটনা ও আচারের মধ্যেও প্রয়োগ করা ছিল সম্ভব। তাই গান্ধীজি অর্থনীতির, রাজনীতির ও সমাজ-নীতির মধ্যে প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর সত্যের ও অহিংসার ধর্মকে। তাই তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ গৃহত্যাগ ক'রে নির্জন অরণ্যে গিয়ে আশ্রম রচনা করুক, এ নয়। তিনি চেয়েছিলেন, তাদের কোটি কোটি গৃহ পরিণত হোক আশ্রমে, এই। পৃথিবীতে তাঁর সগোত্রদের মধ্যে তাঁর জোড়া মেলে না, এই কারণেই যে, তিনি যাকে মূল সত্য ব'লে নিঃসন্দেহে গ্রহণ ক'রেছিলেন, তা থেকে যে সিদ্ধান্তে মানুষ উপনীত হ'তে পারে, তা তিনি তাঁর জীবনে তাঁর সমাজে প্রয়োগ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত বা ভীত হন নি। এ বিষয়ে তাঁর মধ্যে কখনো কণামাত্র দ্বিধা, সংকোচ, আতংক, বা কাপট্য দেখা যায় নি। কিন্তু অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের যুক্তি থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়, এই খণ্ডিত দ্বন্দ্বিত সত্যের পৃথিবীতে তার প্রয়োগ অসম্ভব। এখানে ১ যেমন সত্য, তেমনি সত্য -১-ও। এখানে যা আছে, তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যা নেই-ও। সত্তা যখন আছে, তার প্রতিসত্তা-ও থাকবে। ক্রিয়া থাকলে তার প্রতিক্রিয়া থাকা অবশ্যম্ভাবী। আকর্ষণ থাকলে, থাকে তার বিকর্ষণ। তাই গান্ধীজি তাঁর অখণ্ড সত্যকে যখন পার্থিব কর্মে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে ঘটেছে এতো অসামঞ্জস্য। এমন দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছে যে, অত্যন্ত গোঁড়া গান্ধীবাদীরা-ও

বলেছেন, এ সব মহাত্মাজির কূটনৈতিক চাল, বৃটিশকে ধোঁকা দেওয়া। আর একথা ভেবে অনেক গান্ধীবাদীর বুক মহাত্মার প্রতি 'বিশ্বাসে' ভ'রে-ও উঠেছে। তাঁরা ভুল বুঝেছেন মহাত্মাকে। মহাত্মার অখণ্ড সত্যের বিশ্বাস এই খণ্ডিত ও দ্বন্দ্বিত জগতে প্রায়ই তাঁকে বিভ্রান্ত বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু তাঁর এই বিভ্রান্তি ও অসামঞ্জস্য-ই তাঁর আন্তরিকতার বা অকাপট্যের চূড়ান্ত প্রমাণ।

যাই হোক, বিলাতে ঐ সময় থেকেই গীতার বাণী অনুসারে মহাত্মা তাঁর জীবনকে গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। অবশ্য পরে সে চেষ্টা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। গান্ধীজি ইংরেজি ভাষায় গীতার বিভিন্ন অনুবাদ পাঠ করেন। সেগুলির মধ্যে, তাঁর মতে, সার এডুইন আর্ণল্ডের অনুবাদখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ। পরে গান্ধীজি সার এডুইন আর্ণল্ডের 'দি লাইট অব এশিয়া' কাব্যখানি-ও পড়েন। 'এশিয়ার আলো' হলেন বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেবের কাহিনী এবং বাণী প্রভূত পরিমাণে গান্ধীজিকে প্রভাবিত করে। এ গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি বলেন: "বুদ্ধ-চরিত আমি ভাগবত গীতার চেয়ে-ও বেশি আনন্দের সংগে পড়লাম। পুস্তকখানা হাতে নিয়ে শেষ না ক'রে থাকতে পারি নি।"

বিলাতে থাকা-কালেই থিওজফিস্ট মাদাম ব্লাভাতস্কি এবং মিসেস এনী বেসাণ্টের সংগে গান্ধীজির পরিচয় ঘটে। পরবর্তী কালে মিসেস এনী বেসাণ্ট ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম পরিচালিকা এবং গান্ধীজির সহকর্মিণী হয়ে ওঠেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই যে ভারতবর্ষ তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হবে, গান্ধীজির এই ভ্রান্ত ধারণাকে-ও গড়ে তোলার জন্যে মিসেস বেসাণ্ট কম দায়ী নন। তাঁদের সংস্পর্শে আসার ফলে মহাত্মাজি ধর্মশাস্ত্র পড়তে শুরু করলেন। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তো বটে-ই, খৃস্টান

ধর্মশাস্ত্র-ও তাঁর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলো। বাল্যকালে খৃস্টান ধর্মের প্রতি তাঁর যে বিরূপভাব জন্মেছিল, তা দ্রুত অন্তর্হিত হোলো। তিনি বলেন, "যিশুর 'সারমন অন দি মাউন্ট' একেবারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলো। 'তোমার কোটটি যদি কেউ চায়, তাকে কম্বলটি-ও দিও', এবং 'তোমাকে যে এক গালে চড় মারবে অপর গালটি-ও তার দিকে এগিয়ে দেবে' এই কথাগুলি প'ড়ে আমার অপার আনন্দ হোলো।" এমনিভাবেই গান্ধীজির তরুণ মন গীতা, বুদ্ধচরিত এবং যিশুর বাণীর মধ্যে একটি সুসাদৃশ্য লক্ষ্য করলো। এ সব থেকেই তিনি এক নিষ্কাম ত্যাগের অভিন্ন বাণী শুনতে পেলেন।

তবে এই প্রসংগে একথা-ও উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীজি বাইবেলের 'সারমন অন দি মাউণ্ট' থেকে প্রতিহিংসায় বিরতি ও ক্ষমা সম্পর্কে যে-জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা তাঁর রক্তের মধ্যেই ছিল। বৈষ্ণব পরিবারে তাঁর জন্ম। অহিংসা ও জীবে দয়া ছিল তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার, ধর্ম। আমরা জানি, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মের যে-প্লাবন এসেছিল, অহিংসা, প্রেম ও ক্ষমাই ছিল তার মূল কথা। জগাই-মাধাই-এর কাহিনী বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কে না জানে! "মেরেছ কলসীর কানা তাই ব'লে কি প্রেম দেবো না!" এই প্রেম, অহিংসা ও ক্ষমার বাণীর বন্যা সেদিন আর্যাবর্তে দাক্ষিণাত্যে সুদূরে প্রবাহিত হয়েছিল। গান্ধীজির পরিবারেও যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন ছিল, অহিংসা, প্রেম এবং ক্ষমাই ছিল তার মূলকথা। সুতরাং গান্ধীজিকে অহিংস এবং ক্ষমাশীল হবার জন্যে 'সারমন অন দি মাউণ্টের' কাছে সম্পূর্ণরূপে ঋণী করার কোন কারণ নেই। গান্ধীজির রক্তের সুপ্ত সংস্কারকে খৃস্টান ধর্মের বাণী জাগিয়ে দিয়েছিল মাত্র। সৃষ্ট করে নি, পুষ্ট করেছিল।

এই সময়ে গান্ধীজি কারলাইলের লেখা 'বীর এবং বীরপূজা' গ্রন্থখানিও পড়েন। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহম্মদের জীবন-কথা তাঁর খুবই ভালো লাগে। এমনিভাবেই গান্ধীজির অন্তরের গভীরে ধর্ম ও ভগবৎ-প্রেম সুদৃঢ়ভাবে মূল সঞ্চার করে—যে-ধর্ম ও ভগবৎ-প্রেম পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্ত প্রচেষ্টাকেই পরিপূর্ণরূপে পরিচালিত করেছে।

গান্ধীজি ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কিন্তু ব্যারিস্টারি করার মতো সাহস ও শক্তি কোনোটাই তিনি অর্জন করলেন না। আইন বিষয়ক জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে না হ'লে-ও নোট-পড়া ব্যারিস্টারদের চেয়ে যে অনেক বেশি হোলো, সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গান্ধীজি ছিলেন বড়ো লাজুক ; তাই আইনের যেসব কথা তিনি বুঝতেন, সেগুলিকে-ও প্রকাশ করতে পারতেন না। এ-বিষয়ে তিনি দাদাভাই নওরোজী এবং মিঃ ফ্রেডরিক পিংকাট-এর শরণাপন্ন হ'লেন। ঐ সময় পিংকাট সাহেব গান্ধীজিকে ওকালতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করতে বলেন। তিনি বলেন, "তোমার ব্যাধি আমি বুঝেছি। তোমার সাধারণ বিদ্যা খুব কম। সাংসারিক জ্ঞানের অভাব। আর উকিলের ওটি না থাকলে চলেই না। তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস-ও পড়ো নি।" পিংকাট সাহেবের তখনকার কথা-গুলি নিতান্ত সত্য ছিল। তবে সেদিন পিংকাট সাহেব কল্পনা-ও করেন নি যে, এই ভারতবর্ষের ইতিহাস-না-পড়া ছোকরাই একদিন ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন ক'রে রচনা করবে—কালি আর কাগজে নয়, কাজে।

তবে একথা-ও সত্য যে ইতিহাসের সম্যক জ্ঞান গান্ধীজির কোনো দিন জন্মে নি। ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীর ইতিহাসকে যদি গান্ধীজি

সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতেন, তবে আজকের ভারতের চেহারা হোতো অন্য রকম। ইতিহাসের প্রতি গান্ধীজির চরিত্রগত একটি বিরূপ ভাব ছিল। আর তার একমাত্র কারণ, তাঁর ধর্মপ্রাণতা। ইতিহাস মানুষকে শেখায়, সমাজ গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যাপক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তার পদক্ষেপ। অন্য পক্ষে, ধর্ম মানুষকে শেখায়, ঈশ্বর সনাতন, তাই সমাজ সনাতন। সুতরাং ধর্মের সংগে ইতিহাসের প্রকৃতিগত, গোত্রগত, উদ্দেশ্যগত একটা বিরাট পার্থক্য আছে। গান্ধীজি তাঁর প্রথম জীবন থেকেই ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তাই ইতিহাসকে তিনি কোনোদিন বুঝতে পারেন নি,—বোঝার চেষ্টাও করেন নি। আমরা লক্ষ্য করেছি, গান্ধীজি যখন ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, গীতা পড়ছেন, বুদ্ধের বাণী পড়ছেন, তখনো তিনি ভারতের ইতিহাস পড়েন নি। গান্ধীজি যদি গীতা এবং বুদ্ধের বাণী পড়বার আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসটা পড়তেন, তবে গীতা এবং বুদ্ধের বাণীকে তিনি তার কালগত সমাজগত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পেতেন, ধর্ম দিয়ে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণের অসম্ভব চেষ্টা করতেন না।

বিলাতে গান্ধীজির বহু বন্ধুর মধ্যে একজনের নাম উল্লেখ করা এখানে বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। একদা "অর্ধোলংগ সন্ন্যাসী" ব'লে গান্ধীজির প্রসিদ্ধি ঘটেছিল পৃথিবীতে। তাঁর এই স্বল্প বেশের দিকটায় যে এ ব্যক্তির প্রভাব কিছু ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। ইনি গুজরাটী লেখক নারায়ণ হেমচন্দ্র। বহু ভাষা শেখা, বহু দেশ দেখা, আর বহু ভাষা থেকে নিজের মাতৃ-ভাষাকে সম্পদশালী ক'রে তোলাই ছিল নারায়ণ হেমচন্দ্রের জীবনের সব চেয়ে বড়ো সাধ, সব চেয়ে বড়ো আকাংখা। পোশাকের দিকে তিনি কোনোদিন নজর দিতেন না। এমন কি বিলাতে-ও তিনি অনেক

সময় ধুতি চাদর প'রে রাস্তায় বেরোতেন। রাস্তার ছেলেরা তাঁর পেছনে লাগতো। কিন্তু সেদিকে তিনি ভ্রূক্ষেপ-ও করতেন না। এই স্বল্প পরিচ্ছদের কারণে তিনি আমেরিকায় গ্রেফ্‌তার-ও হয়েছিলেন। সেখানে ধুতি শার্ট পরায় তাঁর "অসভ্য পোশাক পরিধানের অপরাধ" হ'য়েছিল। এই নারায়ণ হেমচন্দ্রের সংগে লণ্ডনে গান্ধীজির যে আলাপ হয়, গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে তার সুন্দর স্মৃতিসজল একটি চিত্র দিয়েছেন। এই চরিত্র-চিত্রণটি এমন সুন্দর হয়েছে যে তা যে-কোনো কথা সাহিত্যি-কের সৃষ্টির গৌরব অর্জন করতে পারে। যাই হোক, পরবর্তীকালে যখনই শুনেছি, বাণী ও বিবৃতিলোভী বিদেশীরা এই "অর্ধোলংগ ফকিরের" পায়ের তলায় এসে বসেছে, তখনই নারায়ণ হেমচন্দ্রের বন্দিত্বের কাহিনীটি আমার মনে পড়েছে। মনে হয়েছে, মহাত্মাজি তাঁর চিরাভ্যস্ত অহিংসা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের রীতিতেই বুঝি পরিচ্ছদগর্বী বিদেশীদের ঔদ্ধত্যকে নাশ ক'রে তাঁর পুরাতন বন্ধু নারায়ণ হেমচন্দ্রের কারাবাসের-ই শোধ নিচ্ছেন!

১৮৯১ খৃস্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে গান্ধীজি বিলাত থেকে দেশে রওনা হন। বাড়ি ফিরে তিনি শুনলেন, তাঁর বিলাতে থাকা কালেই মাতৃবিয়োগ হয়েছে। পাছে তিনি দুঃখে বিহ্বল হ'য়ে পড়েন, তাই বিদেশে বিভূঁইয়ে তাঁকে দুঃসংবাদ পাঠানো হয় নি। গান্ধীজি বেদনায় ভেঙে পড়লেন, কিন্তু বিহ্বল ভাবটা বাইরে খুব বেশি প্রকাশ করলেন না। ইতিপূর্বেই তিনি আত্মসংযমের শক্তি কতক পরিমাণে আয়ত্ত করেছিলেন।

দেশে ফিরে ডাক্তার মেহতার পরিবারের সংগে গান্ধীজির অন্তরংগতা গ'ড়ে উঠলো। বিশেষ ক'রে, এখানে এমন একটি মানুষের সংগে তাঁর পরিচয় ঘটলো, যাঁর প্রভাব গান্ধীজির ভবিষ্যৎ জীবনে প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। ইনি ডাক্তার মেহতার দাদা রেবাশংকর জগজীবনের জামাতা,

কবি রায়চাঁদ বা রাজচন্দ। রেবাশংকরের বিরাট কারবারের অংশীদার এবং হর্তাকর্তা-বিধাতা। বয়স-ও বেশি নয়, বছর পঁচিশ হবে। চরিত্রবান, জ্ঞানী। স্মৃতি-শক্তি-ও তাঁর অসাধারণ। তাঁকে "শতাবধানী" বলা হোতো। গান্ধীজি একবার লাতিন, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী ভাষা থেকে বিশৃংখলভাবে কতকগুলো শব্দ ব'লে গিয়েছিলেন এবং রায়চাঁদ সেগুলিকে ঠিক হুবহু তেমনি ভাবেই করেছিলেন পুনরাবৃত্তি। গান্ধীজি বলেন, "এই শক্তি দেখে আমার হিংসা হ'য়েছিল, কিন্তু তাতে আমি মুগ্ধ হই নি। তাঁর যে-গুণ আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তার পরিচয় আমি পরে পেয়েছিলাম। তাঁর বিস্তৃত শাস্ত্রজ্ঞান, শুদ্ধ চরিত্র ও আত্মদর্শন করবার তীব্র ইচ্ছা।......তাঁর বুদ্ধিকে আমি যেমন সম্মান করতাম,তাঁর নৈতিক চরিত্রের উপরেও ছিল আমার তেমনি বিশ্বাস।" লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চালাবার ফাঁকে যে-মানুষটি নিবিড়ভাবে ধর্ম-আলোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে দেখে গান্ধীজির মনে গীতার নিষ্কাম ধর্মের কথা মনে হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। জীবনের প্রথম ভাগে রায়চাঁদের মতো একজন সাধু কারবারীকে দেখার ফলে গান্ধীজি পুঁজিবাদীদের সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। যারা ব্যক্তিগতভাবে সহৃদয়, সহানুভূতিশীল, তারা যে সমাজগতভাবে অত্যন্ত ভয়ংকর ও অনিষ্টকর হ'তে পারে,এ-কল্পনা বা চিন্তা কখনো গান্ধীজির মস্তিষ্কে আসে নি। তাঁর চোখে পুঁজিবাদীদের অন্যায়, শোষণ, নির্যাতন তাদের ব্যক্তিগত স্খলন বা ত্রুটি মাত্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি যদি রায়চাঁদের মতো মানুষদের মহত্ত্বকে ব্যক্তিগত ব'লে ভাবতেন, আর তাঁদের সমাজগত স্বরূপটিকে নির্ভুল দৃষ্টিতে দেখতেন, তবে গান্ধীজির পরবর্তী জীবন এবং ভারতের বর্তমান ইতিহাস অন্যতরো হোতো। আজকের ভারত শ্রেণীগত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতাকে

জয় করতো, আর গান্ধীজির অহিংসা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই হোতো সে-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। গান্ধীজি নিজে-ও স্বীকার করেন: …"এই পর্যন্ত বলা যথেষ্ট মনে করি যে, আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ আধুনিক জগতের তিন ব্যক্তি অংকিত করেছেন। রায় চাঁদ ভাই তাঁর জীবন্ত সংসর্গ দিয়ে; টলস্টয় তাঁর 'বৈকুণ্ঠ তোমার হৃদয়ে' (Kingdom of God is within You) গ্রন্থ দিয়ে এবং রাস্কিন তাঁর 'আন্‌টু দিস্ লাস্ট' রচনা দিয়ে।"

এখানে এ-কথাও উল্লেখযোগ্য, জীবনের প্রথম ভাগে বহু বিশিষ্ট ধনী ও ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সংসর্গে আসায় এবং তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্রে মুগ্ধ হওয়ায় গান্ধীজি দেশের বর্তমান দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্যে দেশের অর্থনীতির কর্ণধার ধনিক ও ব্যবসায়ী সমাজকে দায়ী করতে পারেন নি। তিনি পরোক্ষে হ'লে-ও দায়ী করে বসেছেন যন্ত্রকে, কলকারখানাকে। এ যেন মানুষের রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে বলা: মনুষ্য দেহটাই সর্বনাশের মূল—উপদেশ দেওয়া, মনুষ্য দেহটাকে বিতাড়িত করো, মনুষ্য দেহ অপেক্ষা পশুদেহ-ই ভালো। মানুষের যন্ত্র-সভ্যতার রূপ, তার সামাজিক উদ্‌বর্তনের ফলেই ঘটেছে। আজ তাকে যন্ত্রহীন, কলকারখানাহীন সমাজে ফিরে যেতে বলা, সে যেন হোলো মানুষের সমাজে যে-হেতু অন্যায় ও দুঃখ-দারিদ্র্য আছে, সেই-হেতু পৃথিবীকে আজ মনুষ্যহীন জানোয়ারের সমাজে ফিরে যেতে উপদেশ দেওয়া। উদ্‌বর্তনের ফলেই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে মানুষের। আবার সেই উদ্‌বর্তনের ফলেই যন্ত্র-সভ্যতার জন্ম হয়েছে মানুষের সমাজে। যেমন মনুষ্যদেহের রোগ দূর করার জন্য মনুষ্য দেহটাকে নাকচ ক'রে দেওয়া যায় না, তেমনি যন্ত্র-সভ্যতার ব্যাধিটাকে সারাবার জন্যে যন্ত্র-সভ্যতাকে বিতাড়িত

করা-ও চলে না। তাই যন্ত্র-সভ্যতার রোগের চিকিৎসায় গান্ধীজির হাতযশ বাড়ে নি। গান্ধীজি যন্ত্র-সভ্যতার ব্যাধিকে নয়, যেন যন্ত্র-সভ্যতাকে দেখেই আঁৎকে উঠেছেন। তাই ডাক্তার যদি রোগকে নয়, রোগীকে দেখে আঁতকে ওঠেন, তবে যেমন হয়, এ-ও হয়েছে ঠিক তেমনি।

এই ত্রুটি কেবল যে গান্ধীজির হ'য়েছিল তাই নয়। রবীন্দ্রনাথও একদা চীৎকার ক'রে বলেছিলেন, তিনি "বংশীবটের তলে" ফিরে যেতে পেলে "সুসভ্যতার আলোক" ছাড়তে রাজী আছেন। বলেছিলেন, "দাও সে অরণ্য, লও এ নগর।"

তবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-কথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ ছিল সাময়িক কাব্যবিলাস। তা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ, নগরের লৌহ-লোষ্ট্রকে দূর ক'রে ভারতে আরণ্যক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যা অনিবার্য প্রয়োজন, গান্ধীজি যখন সে-দিকে হাত বাড়ালেন, তখন জীমূতমন্দ্রকণ্ঠে তার প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গান্ধীজির পূর্বমুখী পথ যে উত্তরমুখী নয়, রবীন্দ্রনাথ সকলের চেয়ে দৃঢ়তার সংগে তা প্রচার করেছিলেন আগে। এখানে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর চরিত্রের মধ্যে আমরা মূলত একটি গভীর পার্থক্য লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যানুভূতির মধ্যে যাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন, জীবনে কার্যত তাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন নি। অনেক সময় তাঁর কাব্যানুভূতির সংগে তাঁর চিন্তা ও কার্যের ঘোরতর বিরোধ দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথের অরণ্যপ্রীতি এবং সেই একই সংগে চরকা বিরোধিতাই তার যথেষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সংগেই আমি আরো একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে চাই, যাতে গান্ধীজির এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের পার্থক্যটি সহজেই প্রতিপন্ন হবে। রবীন্দ্রনাথ-ও গান্ধীজির মতোই

অন্যান্য জীবজন্তুর সংগে স্বজাতীয়তা অনুভব করতেন। কিন্তু এই অনুভূতির উপসংহার রূপে গান্ধীজি যখন নিরামিষাশী হয়ে উঠলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনো র'য়ে গেলেন আমিষাশী। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ নিরামিষাশী হবার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি, একথাও তিনি স্বীকার করেন। এ-ব্যাপারটি গান্ধীজির এবং রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের পার্থক্যটিকে স্পষ্টতর ক'রে তোলে।

যাই হোক, কেবল যে আরণ্যক উপনিষদের আওতায় মানুষ আদর্শবাদীদের এই ভুল ঘটেছিল, তাই নয়। যন্ত্র সভ্যতার যেখানে জন্ম, সেই ইউরোপে-ও যন্ত্রসভ্যতার আসল রূপটিকে চিন্‌তে বেশ দেরী হয়েছিল। ✓যন্ত্রের উন্নতির সংগে সংগে শ্রমিক সমস্যা হ'য়ে উঠলো প্রবল। একশো জন শ্রমিকের কাজ বিশ জন শ্রমিক যখন করতে লাগলো, তখন বাকী আশী জনের বেকারত্ব দেখা গেলো অনিবার্যরূপে। ফলে, শ্রমিকরা এবং মানবহিতৈষীরা যন্ত্রকে ভয়ংকর কিছু একটা বস্তু ভেবে তার বিরুদ্ধেই লড়াই শুরু করলেন। যন্ত্রের নাম হোলো, যন্ত্রদানব। এই দানব নিধনের জন্যে মানবহিতৈষীরা তাঁদের লেখা ও বক্তৃতায় যেমন প্রচার চালাতে লাগলেন, তেমনি শ্রমিকরাও তাদের চাকরি-খেকো পোড়ারমুখো ঐ যন্ত্রগুলোকে দূর করতে চাইলো। এই ভাবে সংগ্রামের রূপটা যন্ত্রের বিরুদ্ধে এসে পড়লো। ডাক্তাররা রোগকে না পিটিয়ে পেটাতে লাগলো রোগীকে।

কয়েক জন মাত্র ধনিকের হাতে যদি যন্ত্র-পরিচালনা, অর্থাৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার ভার থাকে, তবে তারা অধিকতর লাভের লোভে যন্ত্রের উন্নতির সাহায্যে শ্রমিকদের ছাটাই করতে থাকবে। এবং কর্মচ্যুত শ্রমিকদের মাইনেটা মালিকের ব্যাংকে গিয়ে জমা হবে নিরাপদে। আপাত দৃষ্টিতে শ্রমিকদের এই দুর্দশার প্রতিকার যন্ত্রের প্রতিরোধের মধ্যেই আছে মনে

হবে। কিন্তু বস্তুত তা নয়। মানুষের বুদ্ধি ও কৌতূহল এতোই প্রবল যে, তা সামনে এগোতে থাকবেই। সে-বুদ্ধি ও কৌতূহলকে আটক রেখে কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব হবে না। তাই যন্ত্রকে মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েই সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব? তা কেবলমাত্র সম্ভব শ্রমিক এবং যন্ত্রকে স্বীকার ক'রে নিয়ে এবং শ্রমিক ও যন্ত্রের বর্তমান বিধাতাপুরুষ ধনিক ও পুঁজিপতিদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা থেকে সরিয়ে দিয়ে। পূর্বে, যন্ত্রের উন্নতির আগে, একশো জন মানুষ একটি কাজ দশ ঘণ্টায় করতো। এখন যন্ত্রের উন্নতির ফলে, ধরুন, সেই কাজটি দশ ঘণ্টায় বিশ জন লোকে করছে। আর বাকী আশী জন শ্রমিক হয়েছে বেকার এবং ঐ আশী জনের মাইনেটা নিয়মিত ভাবে জমা পড়ছে মালিকের জমার খাতায়। কেবল তাই নয়। বেকার আশী জন শ্রমিক এসে চাকরির জন্যে ধর্ণা দিচ্ছে মালিকের দরজায়। ফলে যে বিশ জন লোক চাকরি করছে, তাদের মাইনেটা-ও বাকী বেকার আশী জনের সংগে প্রতিযোগিতার ফলে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যাকে কৃচ্ছ্র-সাধন বলা চলে। আর তাতে মালিকের জমার খাতা ক্রমেই পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হয়ে উঠছে। এমনি ভাবে উন্নত যন্ত্র ধনিকের হাতে থাকায়, শ্রমিকদের মধ্যে আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই শ্রমিকের কর্মহীনতা এবং মালিকের মুনাফা চক্রবৃদ্ধিহারে চলেছে বেড়ে। সুতরাং এই রোগের প্রতিকার করতে হবে দুই পথে। প্রথমত, প্রতিযোগী শ্রমিকদের প্রতিযোগিতার আত্মঘাতী পথ থেকে ফিরিয়ে তাদের ক'রে তুলতে হবে সংঘবদ্ধ, এবং সেই সংঘবদ্ধতার দ্বারা আঘাত করতে হবে মালিককে তার অপসরণের জন্যে। শ্রমিকদের হাতে যখন যন্ত্র আসবে, তখন তার দানবীয় রূপ আর

থাকবে না। তখন যে-কাজ মুনফা-খোর মালিকের জন্যে বিশ জন শ্রমিক দশ ঘণ্টায় করতো, সেই কাজ এক শ জন শ্রমিক, প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নয়, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে, করবে মাত্র দু ঘণ্টায়। মার্কসবাদই যন্ত্রকে তার এই সত্যকারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দেখেছে। মার্কসবাদের পূর্বে যন্ত্রভীরু সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ বহুরূপেই দেখা দিয়েছে। গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলেছিলেন, "আমি একজন সেরা কমিউনিস্ট"। তাঁর কমিউনিজম যন্ত্রভীরু কমিউনিজম রূপে দেখা দিয়েছে। তিনি যন্ত্রকে অস্বীকার ক'রে বা কখনো কখনো যন্ত্রপতিদের সদাশয়তার উপর নির্ভর ক'রে মনুষ্য-সমাজকে এক বৃহৎ পরিবারে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উদ্দেশ্য ও উপায় চিরদিনই পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে সাহায্য করে নি। তাই যখন তিনি কলকারখানার শ্রমিকদের বলেছেন, কলকারখানা শ্রমিকদেরই, কিম্বা যখন তিনি কৃষকদের বলেছেন, শ্রম যার ফসল তার, তখন-ও তিনি শ্রমিক ও কৃষকদের ন্যায্য দাবীর পক্ষ নিয়ে কলকারখানার মালিক ও জমিদারদের নিতান্ত অহিংসা এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে-ও আঘাত করেন নি। তাই অনেকের কাছে আপাত-দৃষ্টিতে তাঁকে জমিদার ও মালিকের চর ব'লে মনে হয়েছে। আর মালিক ও জমিদার তাঁর পন্থার অনুসরণ না ক'রে গান্ধীবাদকে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। গান্ধীবাদের তথাকথিত প্রচারক ধনিকরা তাদের কলকারখানা তুলে দিয়ে চরকা নিয়ে মাঠে যায় নি, গান্ধীজিকে বর্মরূপে ব্যবহার ক'রে নিজেদের যন্ত্র ও কলকারখানাকে মুনাফা-লুঠের নীতিসংগত একটা প্রতিষ্ঠান ক'রে তুলতে চেয়েছে। নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব হ'লে-ও গান্ধীজি চেয়েছিলেন, ভারতীয় ধনিক ও জমিদারদের নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম

ক'রে তুলতে। তিনি ভেবেছিলেন, 'হৃদয়ের পরিবর্তন হবে।' এখানে-ই হয়েছিল তাঁর ভুল। তিনি মানুষকে নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম করতে চেয়েছিলেন ভাগবত গীতার বাণী স্মরণ ক'রে। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহকে যদি বলা যায়, তোমাদের মাধ্যাকর্ষণ ত্যাগ ক'রে তোমরা নিঃস্বার্থভাবে কক্ষ পরিক্রমণ করো আর গ্রহ-উপগ্রহরা যদি তাই করে (মানুষের সৌভাগ্য যে তারা তা করবে না), তবে একটি নিমেষে কি সমস্ত সৌরলোক তালগোল পাকিয়ে যাবে না? গ্রহ-উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণ যেমন, মানুষের স্বার্থ-ও ঠিক তেমনি। মানুষ নিঃস্বার্থ হোলে মানুষের সমাজ অচল হ'য়ে যাবে—হয়ে উঠবে মানুষের ভীড়ের তাল-গোল পাকানো একটা বৃহৎ মনুষ্যপিণ্ড। গান্ধীবাদ যখন মানুষের স্বার্থকে দূর ক'রে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম হ'তে মানুষকে বলেছে, তখন মার্কসিজ্‌ম্ বলেছে মানুষের স্বার্থকে স্বীকার ক'রে নিয়ে সেই সর্ব-স্বার্থের নীতি অনুসারে রচনা করতে মানুষের সমাজ-ব্যবস্থাকে। গান্ধীবাদের নিষ্কাম নিঃস্বার্থতার উপদেশ ধনিক আর জমিদারেরা শোনে নি, তারা তা শোনাতে চেয়েছে শ্রমিক ও প্রজাদের, এবং এমনি ভাবেই শ্রমিক ও প্রজাদের স্বার্থকে নিজেরা আত্মসাৎ ক'রে হ'য়ে উঠেছে এক একটি ভয়াবহ প্রাণী। কোনো একটা গ্রহ যদি সৌর জগতের মাধ্যাকর্ষণ স্বার্থের মূলনীতিকে অস্বীকার ক'রে অন্য গ্রহগুলিকে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিহীন ক'রে নিজের মাধ্যাকর্ষণের প্রকোপটা বাড়িয়ে তোলে, তবে যেমন গ্রহে গ্রহে ঠোকাঠুকি হ'য়ে এক নিমেষে একটা প্রলয় ঘটে যেতে পারে, ঠিক তেমনি আজ মানুষের সমাজে-ও বহুর স্বার্থকে অস্বীকার ক'রে যখন কয়েকটি মানুষ অতি-স্বার্থপর হয়ে উঠেছে, তখন সেই অতিস্বার্থপরদের দ্রুত অপসরণ না ঘটলে, সমগ্র মনুষ্য সমাজটা যে মাথা ঠুকোঠুকি ক'রে মরে যাবে, এ-বিষয় নিঃসন্দেহ।

গান্ধীজি দেশে ফিরে কিছুদিন বোম্বাই-এ এবং রাজকোটে প্র্যাক্‌টিশ করলেন। কিন্তু পসার আদৌ জমলো না। গান্ধীজির ব্যবহারিক জ্ঞানের যেমন ছিল অভাব, তেমনি ছিল সততার সূক্ষ্ম-বিচার। বিশেষ ক'রে তাঁর লাজুকতা এবং বক্তৃতা বা তর্ক করার অসামর্থ্য তাঁর ওকালতির পথে অন্যতম অন্তরায় হ'য়ে উঠলো। গান্ধীজি আরজি লিখে কিছু কিছু রোজগার করতে লাগলেন। এই সময় তিনি ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী-দের সম্পর্কে একটি কঠিন অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মানুষের সদ্‌গুণ সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা সত্ত্বে-ও তিনি কোনো দিন তা ভুলতে পারেন নি। পোরবন্দরের রাণা সাহেব গদি পাওয়ার পূর্বে গান্ধীজির দাদা তাঁর মন্ত্রী এবং পরামর্শদাতা ছিলেন। ঐ সময় তিনি রাণা সাহেবকে কুপরামর্শ দিয়েছেন, এমনি একটি অভিযোগ পলিটিক্যাল এজেণ্টের কানে যায়। ফলে, পলিটিক্যাল এজেণ্ট গান্ধীজির দাদার ওপর বিরূপ হ'য়ে ওঠে। কোনো সামন্ত রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেণ্টের বিরূপ ভাব অত্যন্ত ভয়ংকর, কারণ, তা ঐ রাজ্যের মানুষকে সকল দিক থেকেই বিপন্ন ক'রে তোলে। সৌভাগ্যক্রমে, বা দুর্ভাগ্যক্রমে, গান্ধীজির সংগে বিলাতে এই পলিটিক্যাল এজেণ্টের ব্যক্তিগত পরিচয় হ'য়েছিল। সুতরাং দাদা তাঁর পক্ষে দু একটা কথা পলিটিক্যাল এজেণ্টকে বলার জন্যে ভাইকে অনুরোধ করলেন। বিষয়টির নৈতিক দিকটাকে গান্ধীজি সম্পূর্ণ সমর্থন করতে না পারলে-ও স্নেহশীল দাদার কথা ঠেলতে পারলেন না। কিন্তু পলিটিক্যাল এজেণ্ট গান্ধীজির দাদার প্রতি এমন বিরূপ ছিল যে, গান্ধীজির কোনো কথাই সে কানে তুললো না, দারোয়ান দিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বার ক'রে দিলো। গান্ধীজি বলেন, "সরকারী আমলা যখন নিজ আসনে ব'সে থাকে, আর যখন সে ছুটিতে দেশে থাকে— এ দুএর মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে।"

গান্ধীজি এই অপমানের প্রতিবাদে পলিটিক্যাল এজেণ্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইলেন। কিন্তু বোম্বাই-এর তখনকার শ্রেষ্ঠ আইনজীবী সার ফিরোজশা মেহতা তাঁকে এ বিষয়ে নিরস্ত হ'তে উপদেশ দিলেন: "গান্ধীকে বলবেন, এ রকমের ঘটনা সমস্ত উকীল ব্যারিস্টারের অভিজ্ঞতাতেই আছে। তার রক্ত গরম, সে বিলাত থেকে নূতন এসেছে, তাই বৃটিশ কর্মচারীকে চেনে না। যদি সে সুখে বাস করতে চায় ও দু পয়সা রোজগার করতে চায়, তবে এ-চিঠি যেন ছিঁড়ে ফেলে এবং অপমান সহ্য করে।"

গান্ধীজি নিরস্ত হলেন, কিন্তু সে-অপমান জীবনে ভুললেন না। তাঁর নিজের নৈতিক ত্রুটিটা-ও তাঁর কাছে গুরুতররূপে ধরা পড়লো। তাই আর কোনো দিন কারো সুপারিশ তিনি করবেন না, গান্ধীজি এই শপথ করলেন। সে শপথ তিনি তাঁর অন্য সকল শপথের মতোই কখনো ভাঙেন নি।

কিন্তু ব্যাপারটা আরো দুঃসহ হ'য়ে উঠলো অন্য কারণে। এই বৃটিশ কর্মচারীটির আদালতেই তাঁর সমস্ত মামলা চলে। অথচ তোষামোদ করা-ও তাঁর পক্ষে ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই সময় বিখ্যাত ব্যবসায়ী দাদা আবদুল্লার অংশীদার শেঠ আবদুল্লা করিম ঝভেরির সংগে গান্ধীজির দাদা গান্ধীজির পরিচয় করিয়ে দিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের বিরাট ব্যবসায়। সেখানে আদালতে তাঁদের প্রায় ছ লক্ষ টাকার দাবী সম্পর্কে একটি মামলা চলছিল। বড়ো বড়ো উকীল-ব্যারিস্টার-ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধীজি সেখানে গিয়ে তাঁদের সংগে থেকে কেবল চিঠিপত্রের মুসাবিদা ক'রে-ও তাঁদের সাহায্য করতে পারেন। আফ্রিকা যাওয়ার এই সুযোগটিকে গান্ধীজি ডুবন্ত মানুষের মতো আঁকড়ে

ধরলেন। এ স্বাধীন ব্যবসা নয়, এক প্রকার চাকরি—মাত্র কয়েক মাসের জন্যে—কিন্তু তাতে কি, সাময়িক ভাবে-ও তো কাথিয়াবাড়ের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে তিনি রক্ষা পাবেন? স্থির হোলো, প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের ভাড়া, থাকার খরচ এবং সেই সংগে পারিশ্রমিক ১০৫ পাউণ্ড। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অজ্ঞাত দেশ, অপরিচিত মানুষ তাঁকে ডাক দিলো।

এমনিভাবেই গান্ধীজির এক নূতন জীবনের হোলো সূত্রপাত। দক্ষিণ আফ্রিকাকে গান্ধীজির ভবিষ্যৎ জীবনের ল্যাবরেটরি বলা চলে।

তিন

১৮৯৩ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলেন এবং মে মাসের শেষাশেষি সময়ে নাতালে এসে পৌছলেন। নাতালের বন্দরের নাম ডারবান। গান্ধীজিকে নেওয়ার জন্যে তাঁর নূতন মনিব আবদুল্লা শেঠ নিজেই স্টীমার ঘাটে এসেছিলেন। গান্ধীজি এখানে এসে প্রথমে যা দেখলেন, তা এখানকার ভারতবাসীদের মর্যাদাহীন অবজ্ঞাত জীবন। ভারতবাসীদের অধিকাংশই এখানে চুক্তিবদ্ধ বা চুক্তিহীন কুলির কাজ করে। তাই ভারতবাসীদের নাম হয়েছে কুলি। এমনি ভাবে 'কুলি' শব্দটা তার মূল অর্থ হারিয়ে এখানে 'ভারতীয়' এই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই গান্ধীজিকে ওখানের লোকেরা বলতে শুরু করলো, কুলি-ব্যারিস্টার। কুলির বদলে আর একটি নামে-ও ভারতীয়দের ডাকা হোতো, 'স্বামী'। মাদ্রাজীদের নামের সংগে স্বামী কথাটি প্রায়ই যুক্ত থাকে। 'স্বামী'র প্রকৃত অর্থ মালিক হলে-ও এখানে অবজ্ঞা অর্থেই স্বামী কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল এখানে গিরমিটিয়া, অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের এগ্রিমেণ্ট বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। (গিরমিট কথাটি এগ্রিমেণ্ট কথার অপভ্রংশ।) ভারতীয় গিরমিটিয়াদের মধ্যে ছিল তিনটি শ্রেণী, হিন্দু, মুসলমান এবং খৃস্টান। গান্ধীজি এখানে এসে লক্ষ্য করলেন, ভারতীয়দের ওপর সকল প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারকে কায়েমী করার জন্যে নানারূপে ভারতীয় হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক ভেদ ও বিদ্বেষকে বলবৎ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা প্রথমে জন্মে ডারবানের আদালতে। আবদুল্লা শেঠ গান্ধীজিকে ডারবানের আদালত দেখাতে এবং কয়েকজনের সংগে আলাপ-পরিচয় ক'রে দিতে

নিয়ে গিয়েছিলেন। আবদুল্লা শেঠ আদালতে তাঁর উকীলের পাশেই গান্ধীজির বসবার জায়গা ক'রে দিলেন। তখনকার দিনে গান্ধীজি গায়ে পরতেন ফ্রক-কোট এবং মাথায় হিন্দুস্থানী পাগড়ি। ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজিকে পাগড়ি খুলতে হুকুম করলেন। কিন্তু গান্ধীজি এই অপমানজনক প্রস্তাবে রাজী না হ'য়ে আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। এই ব্যাপারে গান্ধীজি আরো জানলেন, এখানে যারা মুসলমানের পোশাক প'রে আদালতে আসে, তাদের পাগড়ি খুলতে হয় না, অথচ অন্য ভারতীয়দের আদালতে প্রবেশ করতে হ'লেই পাগড়ি খুলতে হয়। পরবর্তীকালে গান্ধীজিকে বারবার এইরূপ অন্যায় ও নানা বিভেদ-চক্রান্তের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, এমন কি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিভেদ-চক্রান্তের কাছেই তাঁকে একদা জীবন-ও দিতে হয়েছিল। যাই হোক, কায়েমি স্বার্থের বিভেদ-চক্রান্তের প্রথম অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন ডারবান আদালতে।

এখানে কেবল যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই ধরণের বহুবিধ ভেদ ছিল, তাই নয়। ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানরা আবার একজোটে ভারতীয় খৃস্টানদের করতো ঘৃণা, তাদের 'ওয়েটার' ব'লে নাক সিটকাতো। তাই গান্ধীজি যখন তাঁর হিন্দুস্থানী পাগড়ি ছেড়ে 'হ্যাট' পরবেন স্থির করলেন, তখন তাঁকে প্রতিবাদে বলা হোলো, 'হ্যাট' পরলে লোকে তাঁকে 'ওয়েটার' ব'লে ভাববে। ভাবুক ওয়েটার, গান্ধীজির তাতে বড়ো একটা অমত ছিল না। কিন্তু সেদিকেও তাঁকে নিরস্ত হ'তে হোলো, কারণ, তাতে ভারতীয় হিন্দুদের ওপর যে অবিচার চলছে, তার কোনো প্রতিবিধান হবে না। গান্ধীজি তাই এই অন্যায়ের প্রতিবাদে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি লেখা পাঠালেন। ব্যাপারটি নিয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি

হ'লো। একদল গান্ধীজির পক্ষ নিলেন, আর অন্য দল করলেন তাঁর তীব্র নিন্দা। সংবাদপত্রে-পত্রে 'আনওএলকাম ভিজিটর' বা 'অবাঞ্ছিত আগন্তুক' শিরোনামায় গান্ধীজির কথা ছাপা হোলো। ফলে তিন চার দিনের মধ্যেই গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় সুপরিচিত হ'য়ে উঠলেন। এমনিভাবেই সেদিন এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে গান্ধীজির বিরাট সমাজনীতিক ও রাজনীতিক জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর প্রোথিত হোলো।

কিন্তু গান্ধীজি তখনো বোঝেন নি যে কী অন্যায় ও অত্যাচার দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের জীবনকে ভয়াবহ ভাবে বিপর্যস্ত করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শীঘ্রই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। গান্ধীজির মনিব বা মক্কেল আবদুল্লা শেঠের মামলা চলছিল তাঁর নিকট-আত্মীয় তৈয়ব হাজি খান মহম্মদের সংগে ট্রান্সভালে, প্রিটোরিয়া শহরে। সুতরাং অবিলম্বেই গান্ধীজির প্রিটোরিয়া যাবার প্রয়োজন হোলো। গান্ধীজি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনে ট্রেণে চড়ে বসলেন। ট্রেণ প্রায় রাত্রি নটায় নাতালের রাজধানী মরিৎস্‌বার্গে এসে পেঁছিলো। একজন শাদা চামড়া প্যাসেঞ্জার গান্ধীজিকে ভালো ক'রে দেখলো,যে তাঁর গায়ের চামড়া শাদা নয় এবং অবিলম্বে সে রেল কোম্পানীর দু'জন কর্মচারীকে সংগে নিয়ে ফিরে এলো। তারা গান্ধীজিকে প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে নেমে যেতে বললো। কিন্তু গান্ধীজি প্রতিবাদ জানালেন, তাঁর প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। কর্মচারী বললো, "থাকগে, ভালোয় ভালোয় নামো, নইলে সেপাই দিয়ে নামিয়ে দেবো।" গান্ধীজি বললেন, "তাই সেপাই দিয়েই নামিয়ে দাও, আমি স্বেচ্ছায় নামবো না।'

সেপাই এলো, গান্ধীজিকে ধাক্কা দিয়ে তারা ট্রেণ থেকে নিচে নামিয়ে দিলো। বিছানা-পত্র ছুঁড়ে ছত্রখান ক'রে ফেললো প্ল্যাটফর্মে। ট্রেণ চ'লে

গেলো। গান্ধীজি মরিৎস্‌বার্গ স্টেসনে দাঁড়িয়ে ভীষণ হিমে এবং দুঃসহ অপমানে কাঁপতে লাগলেন। "আমার কর্তব্য কি তাই স্থির করতে লাগলাম। আমার যা ন্যায্য অধিকার তার জন্যে কি লড়বো না, ভারতবর্ষে ফিরে যাবো ? না,অপমান সহ্য ক'রে-ও প্রিটোরিয়া পৌছব ?…" গান্ধীজি বুঝলেন, তাঁর ওপর যে দুঃখ নেমে এসেছে তা তো বাহ্য দুঃখ, একটা মহাব্যাধি ভিতরে রয়েছে এ তারই বাহ্য লক্ষণ মাত্র। "এই মহাব্যাধি হচ্ছে বর্ণ-বিদ্বেষ। এই ব্যাধি দূর করার শক্তি থাকে তো সেই শক্তির ব্যবহার করবো। তাতে যদি আরো দুঃখ হয়, সে সকল দুঃখ সহ্য করবো।" এই শপথ গ্রহণ ক'রে গান্ধীজি রেল কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার এবং আবদুল্লা শেঠের কাছে তার ক'রে দিলেন। তার পেয়ে আবদুল্লা শেঠ জেনারেল ম্যানেজারের সংগে দেখা করলেন। জেনারেল ম্যানেজার স্বজাতীয়দেরই পক্ষ সমর্থন করলেন, তবে গান্ধীজি যাতে বিনা হাংগামায় গন্তব্য স্থানে পৌছতে পারেন, তার ব্যবস্থা করার জন্যে-ও তিনি স্টেশন-মাস্টারকে নির্দেশ দিলেন। আবদুল্লা শেঠ মরিৎসবার্গের হিন্দুদের-ও তার ক'রে দিলেন, তাঁরা যেন গান্ধীজির সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রাখেন। অন্যান্য স্টেশনে-ও এই মর্মে তার করা হোলো। গান্ধীজি এই ভাবে মরিৎসবার্গ থেকে চার্লস্‌টাউনে এসে পৌছলেন। কিন্তু এখানেই তাঁর অপমান বা দুর্গতির শেষ হোলো না। তাঁকে আরো বহু লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হ'তে হোলো।

চার্লস্‌টাউন থেকে জোহানসবার্গ যাবার জন্যে তখনকার দিনে ট্রেণ ছিল না। ছিল এক রকম ঘোড়ার গাড়ী। সেগুলিকে সিগরাম বলা হোতো। মাঝপথে স্টাণ্ডারটনে একরাত্রি থাকতে হয়। সিগরামের টিকিট গান্ধীজির আগেই করা ছিল। এই টিকিট একদিন পরে পৌছলেও

বাতিল হয় না। তাছাড়া, আবদুল্লা শেঠ চার্লস্‌টাউনে সিগরামওয়ালার কাছে-ও তার করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজিকে গাড়ীর ভেতরে বসতে দেওয়ার আদৌ ইচ্ছা ছিল না সিগরামওয়ালার। একজন কালো 'কুলী' শাদা চামড়াওয়ালাদের সংগে একত্রে ব'সে যাবে, সে কী হয়! তাই তারা অজুহাত হিসাবে বললো, ও-টিকিট চলবে না, বাতিল হ'য়ে গেছে। কোচুয়ানের দুই পাশে দুটো আসন ছিল, তার একটাতে গোরা কণ্ডাক্টার বসতো। সে দয়া ক'রে প্রস্তাব করলো, স্বামী যদি কোচুয়ানের পাশে ব'সে যেতে চায়, তবে কোনো রকমে যেতে পারে। গান্ধীজি নিরুপায় হ'য়ে তাতেই রাজী হ'লেন। ফলে গান্ধীজি বসলেন কোচুয়ানের পাশে, আর কণ্ডাক্টার তাঁর জায়গায় গাড়ির ভেতরে, অন্যান্য গোরা যাত্রীদের সংগে। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট ছিল না। একটু বাদেই গোরা কণ্ডাক্টারের সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছা হোলো। এবং কোচুয়ানের পাশে উন্মুক্ত আকাশের তলায় ব'সে ধূমপান করাটাকেই সে বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত আরামদায়ক ভাবলো। তাই কণ্ডাক্টার গাড়ির বাইরে এসে গাড়ির পা-দানের ওপর একটা নোংরা চট মেলে দিয়ে গান্ধীজিকে বললো, 'স্বামী, তুমি এখানে বস। আমি ড্রাইভারের পাশে বসবো।'

অপমান গান্ধীজির কাছে দুঃসহ হ'য়ে উঠেছিলো, তবু তিনি ভয়ে ভয়ে কেবল প্রতিবাদ করতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে প্রতিবাদ করতে দেখেই গোরা কণ্ডাক্টার তাঁর ওপর চড় কিল ঘুষি চালাতে লাগলো, গান্ধীজির হাত ধরে তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামাবার চেষ্টা করলো। গান্ধীজি কিন্তু পেতলের ডাণ্ডা ধ'রে কোনো রকমে ঝুলে রইলেন। তাঁর এই নির্যাতনে একজন গোরা যাত্রীও প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। ফলে, কণ্ডাক্টার নরম হ'য়ে এলো। কোচুয়ানের অন্যদিকে যে আসনটা ছিল, তাতে একজন

'হোটেণ্টট' চাকর বসেছিল। কণ্ডাক্টার তাকে নামিয়ে পা-দানে বসিয়ে নিজে তার জায়গায় গিয়ে বসলো। গান্ধীজিকে শাসালো, 'স্টাণ্ডারটাউনে চলো, তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবো।'

গান্ধীজি নীরবে ভয়ার্ত মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু স্টাণ্ডারটাউনে এসে লোকটা কিছু উপদ্রব করলো না, যাত্রীর প্রতিবাদে সম্ভবত ভয় পেয়েছিল। প্রথমে গান্ধীজি রাত্রি কাটাবার জন্যে একটা হোটেলে উঠতে গেলেন। কিন্তু গান্ধীজিকে "কুলী" দেখে তারা সেখানে ঠাঁই দিলো না। আবদুল্লা শেঠ গান্ধী সম্বন্ধে স্টণ্ডারটাউনে-ও তাঁর পরিচিতদের কাছে তার করেছিলেন। তার অনুযায়ী গান্ধীজির সংগে আবদুল গণি শেঠের সাক্ষাৎ হোলো। এই আবদুল গণি শেঠ পরে গান্ধীজির জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রেছিলেন।

প্রিটোরিয়ার জন্যে ট্রেণের টিকিট কিনতে গিয়ে আরো এক আশংকা দেখা গেলো, 'কুলী' ব্যারিস্টারের বরাতে প্রথম শ্রেণীর টিকিট জুটবে কি ? গান্ধীজি স্টেশন-মাস্টারের কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট চেয়ে আগে-ই একটি লিখিত দরখাস্ত পাঠালেন। দরখাস্তখানাকে জোরালো করার জন্যে ব্যারিস্টার ব'লে নিজের পরিচয়টুকু-ও দিলেন। পরে গান্ধীজি যখন টিকিট কিনতে গেলেন, তখন স্টেশন-মাস্টার হেসে তাঁকে বললেন, "আমি ট্রান্সভালার নই, আমি হল্যাণ্ডার। আপনার অবস্থা বেশ বুঝতে পেরেছি। আপনাকে আমি প্রথম শ্রেণীর টিকিট দিতে পারি। কিন্তু একটি শর্তে— রাস্তায় গার্ড যদি আপনাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে দেয়, তবে প্রথম শ্রেণীর টিকিটের জোরে আপনি কোনো দাবী করবেন না। কারণ, তাতে আমিই ফ্যাশাদে পড়বো।' এই শর্তেই রাজি হ'লেন গান্ধীজি, স্টেশন মাস্টারকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন।

শ্বেতকায় মানুষদের সম্বন্ধে গান্ধীজির কোনোরূপ ভ্রান্ত ধারণা কোনো দিন ছিল না। তাই আফ্রিকার এই বর্ণ-বিদ্বেষটা তাঁর কাছে আরো অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজদের কাছে কতো সহজ স্নেহই না তিনি পেয়েছেন! সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার এই ঔপনিবেশিক শ্বেতাংগদের বর্ণ-দর্পটি যে স্থানীয় সংকীর্ণতা ও অশিক্ষার ফল, তা বুঝতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হোলো না। শ্বেতকায়দের সেই স্বাভাবিক সদাশয়তার পরিচয় তিনি ট্রেণে উঠে-ও আবার পেলেন। ট্রেণ জার্মিস্টনে এসে পৌঁছলে গার্ড টিকিট পরীক্ষা ক'রতে এলো। গান্ধীজিকে প্রথম শ্রেণীতে দেখে বললো, "তৃতীয় শ্রেণীতে যাও।"

কামরায় একজন ইংরেজ ছিলেন, তিনি গার্ডকে ধমক দিয়ে উঠলেন, "তুমি এই ভদ্রলোককে বিরক্ত করছ কেন? দেখছ না, ওঁর কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে?"

গার্ড গজগজ ক'রে উঠলো, "আপনার জন্যেই বলছি। আপনি যদি কুলীর সংগে যেতে চান, তাতে আমার কি?"

বকতে বকতে গার্ড নেমে গেলো।

রাত প্রায় আটটায় গান্ধীজি প্রিটোরিয়া পৌঁছলেন।

ট্রান্সভালে আসার পূর্বে তিনি নাতালে আবদুল্লা শেঠকে জানিয়ে এসেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ শেঠ তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের সংগে দেখা করবেন। নাতালে দাদা আবদুল্লার যেমন প্রতিষ্ঠা ছিল, তেমনি ট্রান্সভালে ছিল শেঠ তৈয়ব হাজী খান মহম্মদের। তাই প্রিটোরিয়া পৌঁছার প্রথম সপ্তাহেই গান্ধীজি তাঁর সংগে পরিচয় ক'রে তাঁকে জানালেন, তিনি আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের অবস্থা ভালো ভাবে বুঝবার জন্যে তাঁদের

সংগে আলাপ করতে চান। শেঠ তৈয়ব হাজী আনন্দিত হ'য়ে এ-বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন।

ভারতীয়দের একটি সভা আহূত হোলো। বক্তৃতা করার ক্ষমতা গান্ধীজি যেন অকস্মাৎ কোথা থেকে পেলেন। তাঁর লাজুক ভাব তিরোহিত হোলো। তিনি এই সভায় দুটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিলেন। প্রথমত, ব্যবসায়ের মধ্যে সত্য ও সততার স্থান।

গান্ধীজির আজীবন এই সরল বিশ্বাস ছিল যে, সত্য ও সততার মধ্য দিয়ে-ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্ভব। গীতার বাণীকে তিনি কোনো বিশেষ সমাজের তৎকালীন বর্ণনা বা প্রচার হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তা ছিল তাঁর কাছে চিরন্তন দৈব-বাণী। গীতায় ভগবান বলেছেন, তিনিই বর্ণ-চতুষ্টয়ের স্রষ্টা। অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কাল থেকেই বর্ণ-চতুষ্টয় বা 'ডিভিশন অব লেবার' রয়েছে,—সমাজের ক্রম-বিকাশের ফলে, তার উৎপত্তি হয় নি। এবং আবার এই বিধাতার নির্দেশ অনুসারেই এই বর্ণ-চতুষ্টয়কে ফলের প্রতি উদাসীন হ'য়ে নিস্পৃহভাবে স্ব স্ব কর্ম ক'রে যেতে-ও বলা হয়েছে। সুতরাং, গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, তিনি যেমন নিস্পৃহভাবে গীতার নির্দেশ অনুসারে কাজ করছেন, তেমনি ব্যবসায়ীরা-ও বা তা করবেন না কেন? গান্ধীজি তাই ব্যবসায়ে সত্য ও সততার কি স্থান, সে-সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করলেন।

গান্ধীজির পরবর্তী জীবনে-ও এই প্রকারের ভ্রান্ত চেষ্টার আমরা বহু প্রমাণ পাবো। গান্ধীজি যদি পৃথিবীর ও সমাজের ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশে বিশ্বাস করতেন, এবং গীতার বাণীকে একটি বিশেষ সমাজের প্রচার হিসাবে গ্রহণ করতেন, তবে তাকে শাশ্বত সনাতন ব'লে ধ'রে নিয়ে আজকের ভিন্নতর সমাজে তার প্রয়োগের ভ্রান্ত চেষ্টা ক'রে ভুল করতেন না।

সমাজ যখন আরো অল্পবয়স্ক ছিল, তখন তাতে যে নীতি ও রীতির প্রয়োগ ঘটেছিল, আজকের সমাজে সেই রীতি ও নীতির প্রয়োগ-চেষ্টা নিছক শক্তিক্ষয় এবং অনেকখানি হাস্যকর। এ যেন কোনো যুবককে তার অন্ন-প্রাশনের নিকারবোকারটা পরতে বলা!

এ-ধরণের পরামর্শকে মানুষে হয় ব্যবহারিক বিষয়ে অজ্ঞতা, নয় দায়িত্বজ্ঞানহীন রসিকতা ব'লেই গ্রহণ করে। মানুষ তখন কৌতুক-বোধ ক'রে, কিন্তু সে-পরামর্শের অনুসরণ করে না। তাই গান্ধীজি যখনই তাঁর সরল উদার মনে কলকারখানার মালিককে, জমিদারকে, ব্যবসায়ীকে গীতার বাণী শুনিয়েছেন, তখনই তারা তাঁকে লুকিয়ে স্ব স্ব আস্তিনের আড়ালে হেসেছে, আর বাপুজীকে ইহলৌকিক সকল ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে ব'লে ঘোষণা ক'রে তাদের 'ক্ষুদ্র' স্বার্থের কাছে ঘেঁসতে দেয় নি। তাই তারা গান্ধীজিকে সহজে অবতার বানিয়েছে। কারণ, তারা বলতে চায়, অবতারের উপদেশ, মহামানবের পরামর্শ পুঁথিতে টুকে রাখা যায়, কিন্তু পার্থিব দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করা চলে না। ভগবৎ-গীতার নিষ্কাম কর্মের বাণী পাঠ ক'রে পুণ্য-সঞ্চয় করা যায়; কিন্তু তাই ব'লে কার্যত তাকে প্রয়োগ করা চলে না। তাই গান্ধীজির বাণী প্রচারের জন্যে দেশীয় পুঁজিপতিরা যখন বহু অর্থব্যয় করেছে এবং করছে, তখন তাঁর একটি বাণীকে-ও তারা কার্যে পরিণত করে নি, বা করছে না। গীতার ফলসম্পর্কহীন কর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে তাদের প্রয়োজন আছে। কারণ, দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকরা তাদের লাভ-লোকসানের দিকে উদাসীন হ'য়ে কাজ না করলে দেশের পুঁজিপতি ও জমিদারদের নির্ভয়ে উদরপূর্তি ঘটবে কিসে? তাই পুঁজিপতি ও জমিদার-জোতদারদের আজ অহিংসার বাণী প্রচারেরও এতো সমারোহ। তারা যে রাতারাতি অহিংস্রক গান্ধীবাদী হ'য়ে উঠেছে তা নয়,—পাছে

নির্যাতিত নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষাণের ক্ষুধিত আক্রোশ হিংসার বহ্নিতে আত্মপ্রকাশ করে এই ভয়। কিন্তু গান্ধীজি কেবল অহিংসার কথাই যে বলেন নি, একথা আমাদের ভুললে চলবে না। গান্ধীজির কাছে অহিংসা ছিল উপায়মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল শোষণ-পেষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার। তিনি শ্রমিকদের সভায় উচ্চকণ্ঠে তাই বলেছিলেন, "শ্রমিকরাই কলকারখানার সত্যিকারের মালিক", তিনি তেভাগা আন্দোলনের সময় বলেছেন, "শ্রম যার ফসল তার।" কিন্তু সে-বাণীগুলির তো কই প্রয়োগ বা প্রচার চলছে না দেশে? সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ক'রে দেশে ব্যাপকভাবে অহিংসা প্রচারের আজ যে কি প্রয়োজন,তা সহজেই বোঝা যায়। শোষণহীন পেষণ-হীন একটি সমাজ প্রবর্তনের উদ্দেশ্যকে অস্বীকার ক'রে তাঁর অহিংসা উপায়ের প্রচারের গভীরে যে বিরাট একটি ষড়যন্ত্র গোপনে রয়েছে,তা বিন্দুমাত্র ভোলা যায় না। সুতরাং গান্ধীবাদে সত্যিকারের বিশ্বাসী যাঁরা, তাঁরা গান্ধীজির উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য দেবেন। কেবল তাঁর উপায়টির দিকে নয়। গান্ধীজির কাছে উদ্দেশ্য এবং উপায় ছিল এক। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সত্য ও সততায় পূর্ণ, হিংসাহীন, বিদ্বেষহীন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাঁর উপায়-ও ছিল সেই একই সত্য, সততা, অহিংসা এবং বিদ্বেষহীনতা। কিন্তু আজকের তথাকথিত গান্ধীবাদী পুঁজিপতি, জমিদার এবং ব্যবসায়ীদের কাছে উদ্দেশ্য ও উপায় এক নয়। তাদের উদ্দেশ্য, তাদের ইতিহাসগত, চরিত্রগত মিথ্যা, অসাধুতা, হিংসা এবং শোষণ। আর, সেই মিথ্যা, অসাধুতা, হিংসা ও শোষণকে কার্যত প্রয়োগের জন্যে তারা উপায়রূপে গ্রহণ করছে শ্রমিক ও কৃষাণদের মধ্যে সত্য, সততা, অহিংসা ও বিদ্বেষহীনতার প্রচার। এই ধরণের প্রচার শোষকদের মধ্যে কেবল আজ বা ভারতেই নূতন নয়। পাশ্চাত্য দেশে-ও খৃস্টের সাম্যবাদী বাণীকে অস্বীকার ক'রে খৃস্টান ধনিকরা

প্রচার করে ঃ "ছুঁচের ছিদ্রের মধ্যে হস্তীর প্রবেশের মতোই ধনিকদের স্বর্গে প্রবেশ একান্তই অসম্ভব"। অথচ স্বর্গের প্রতি তাদের নিজেদের বিন্দুমাত্র আসক্তি দেখা যায় না। কারণ, এই স্বর্গ-প্রবেশের বাণীটি কৃষক ও শ্রমিকদের উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হয়। তাতে ভবিষ্যৎ স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বর্তমান পারিশ্রমিক থেকে তাদের সহজে বঞ্চিত রাখা যায়।

ফরাসী বিপ্লবের সময়কার 'স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য' এই ত্রিনীতি থেকে সৌভ্রাত্র্যের বাণীটিকে ফরাসী বুর্জোয়ারা কি ভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রচার করেছিল, ফরাসী বিপ্লব ও ফরাসীদেশে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁরাই তা লক্ষ্য করেছেন। বুর্জোয়ারা তখন শ্রেণী-সংগ্রামের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের বিরত করার জন্যে প্রচার করতো, পুঁজিবাদী এবং শ্রমিক, এরা সবাই ভাই ভাই। আমাদের দেশে-ও ভাই-ভাই-এর বাণী আমরা রাত্রিদিন শুনছি। কিন্তু বিন্দুমাত্র-ও লক্ষ্য করছি না, যে ভাই-ভাই সম্পর্কের মধ্যে এক ভাই অন্য ভাইকে প্রতারণা করে, শোষণ করে, নির্যাতন করে, নিজে রাজভোগে থেকে ভাইকে অনাহারে রাখে, আর, ভ্রাতৃত্বের অজুহাতে কলহ করতে-ও নিষেধ করে, সে কেমন ভাই, কি সে ভাই-ভাই সম্পর্ক! তথাকথিত গান্ধীবাদীরা আজ গান্ধীজির অহিংসা ও সৌভ্রাত্র্যের বাণীকে স্বশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রেণী-চেতনা ও শ্রেণী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিয়োগ করতে চাইছে। তাই ব্যাপারটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে গির্জার প্রাচীরের আড়ালে থেকে গুলী ক'রে নরহত্যার মতোন।

এই প্রসংগে রোমঁ্যা রোলঁার একটি সতর্ক বাণী আমাদের মনে জি।
হবে ঃ ভগবান গান্ধীজিকে গান্ধীবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করুন তিহাসের
রোলঁার ভগবান গান্ধীজিকে রক্ষা করেন নি। কিন্তু জ্বর কোনো
করতে হবে। গান্ধীবাদকে আজ তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্যমূল কথা।

কোটি ভারতবাসীকে সচেতন হ'তে হবে—গান্ধীজির প্রচারিত সত্যিকারের সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে দেশে।

আজকের মতোই সেদিন-ও সকল দেশের জমিদার, পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের মতো প্রিটোরিয়ার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে গান্ধীজির এই পরামর্শকে অকেজো ব'লে মনে হয়েছিল, একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু গান্ধীজির দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাঁরা সকলে আন্তরিক ভাবে গান্ধীজির সমর্থন করেছিলেন। সেই প্রস্তাবটি ছিল, সরকারী বর্ণবিদ্বেষী অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি। তার কারণও আমরা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো।

যাই হোক গান্ধীজি অবিলম্বে তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর ভাবী সৈনাপত্যের হাতে-খড়ি হোলো।

ও শো।
ও কৃষাণদে
ধরণের প্রচা
পাশ্চাত্য দে

চার

বর্ণ-বিদ্বেষ সম্পর্কে আসল কারণটি নির্ণয় করা
রূপ না জেনে তার চিকিৎসা করতে গিয়ে বড়ো
বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতীয়দের
ঘে... পরও আজকে ভারতীয় নির্যাতন সেখানে সমানভাবেই
বর্ণ... ষের ব্যাধির স্বরূপটি জানলে তার চিকিৎসা-ও সহজ হ'য়ে

পুঁজিবাদের পরিণতি ঘটে সাম্রাজ্যবাদে এবং ঔপনিবেশিক শাসনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় শাদা পুঁজি তার একাধিপত্য করতে চায়। তাই এশিয়াবাসী কালো পুঁজির প্রতি তার এই কঠিনতম বিদ্বেষ। ভারতীয় পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীরা যাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনোরূপে প্রভাব বা স্থায়িত্ব বিস্তার করতে না পারে, সেই জন্যে শত বিধিব্যবস্থা। সেইজন্যে তাদের জমির মালিকানা স্বত্ব থেকে সকল ভাবে বঞ্চিত করতে হবে, তাদের ভোটাধিকার নিতে হবে ছিনিয়ে, সেই জন্যে, এমন কি ভারতীয় শ্রমিকদের-ও ভারতীয় মনিবের অধীনে চুক্তিবদ্ধভাবে কাজ করতে দেওয়া হবে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষটি তাই শাদা পুঁজির সংগে কালো পুঁজির লড়াই মাত্র ছিল এবং আছে-ও। ইতিহাসের দুর্লংঘ্য নিয়ম অনুসারে পুঁজিকে দুই দিকে দুই শত্রুর সংগে লড়াই করতে হচ্ছে। এক দিকে তার বাইরের শত্রু শ্রমিক, অন্যদিকে তার ঘরের শত্রু বিভীষণ,—অন্য পুঁজি। এই দ্বিবিধ সংঘাতের ফলেই পুঁজিবাদের মৃত্যু অনিবার্য। আবার ইতিহাসের কঠিন নিয়তি অনুসারে এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্বের হাত থেকে পুঁজির কোনো অব্যাহতি-ও নেই। কারণ, এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্বই তার অস্তিত্বের মূল কথা।

সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের অভ্যুত্থানের জন্যে যতোগুলি বিপ্লব ঘটেছে, সর্বত্রই দেখা গেছে, পুঁজিবাদীদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা কৃষাণরা জুগিয়েছে বিপ্লবের উপকরণ ও শক্তি। কারণ, গণতান্ত্রিক অধিকারের সত্যিকারের আধার বা অধিকারী হোলো শ্রমিক ও কৃষাণরা। সুতরাং, পুঁজিবাদীরা নিজেদের বিকাশের জন্যে যখনই কোনো অধিকার দাবী করেছে, তখনই তারা গণতান্ত্রিকতার ভেখ নিয়েছে, তখনই তাদের নিশানে সাম্য সৌভ্রাত্র্য ও স্বাধীনতার বাণী অংকিত হ'য়েছে, তখনই নির্যাতিত গণমানবের জন্যে কুম্ভীরের ক্রন্দন তারা ধ্বনিত করেছে বারে বারে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার বুর্জোয়া বিপ্লবগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কেবল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয়ের সময়েই নয়, যে কোনো ঔপনিবেশিক দেশের স্থানীয় পুঁজিবাদী সমাজ যখন বিদেশীয় পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে আপনার বিকাশ ও বিস্তারের জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখনও দেখা যায়, বিদ্রোহী পুঁজিবাদীরা দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। কৃষাণ ও শ্রমিকদের নির্যাতনের নামে, নিপীড়নের নামে, গণতান্ত্রিক অধিকার দাবীর নামে, স্থানীয় নব-জাগ্রত বুর্জোয়া সমাজ বিদ্রোহের নিশান উড়ায়। এর উদাহরণ খোঁজার জন্যে আমাদের বিদেশে যেতে হবে না, উদাহরণ এখানে ভারতবর্ষেই মিলবে। বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি হিসাবে ভারতবর্ষ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের পদানত হোলো, তখন ইতিহাসের নিয়ম অনুসারেই ভারতে সে জন্মদান করলো এক জারজ বুর্জোয়া সমাজ। বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজের জারজ সন্তান ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হোলো, তখন সে তার জন্মদাতাকে দূর ক'রে মাতার ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হ'তে চাইলো। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের ন্যায়সংগত দাবীদার, মাতার সত্যিকারের সন্তান

ও তার অসীম সম্পদের স্রষ্টা—কৃষাণ ও শ্রমিকরা। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ তাদের নিজেদের স্বার্থকে সত্যিকার দাবীদারের ন্যায্য দাবীর অন্তরালে গোপন ক'রে বৃটিশ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভয়ংকর স্বার্থ সুন্দর ও শোভনীয় হ'য়ে উঠলো গণ-স্বাধীনতার কপট মাংগলিকতায়; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রের ধ্বনিতে তাদের স্বার্থলোলুপ দ্রংষ্টার ঘর্ষণ সেদিন কারো কাণে এলো না। ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ ঘন ঘন রেজ্যুলেশন পাশ ক'রে জানাতে লাগলো, দেশের নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষাণ ভাইদের সকল দুঃখ দারিদ্র্যের, বেদনার, গ্লানির অবসান হ'তে পারে, কেবল একবার বৃটিশরা যদি চলে যায়। ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের এই ঘন ঘন ঘোষণার মধ্যে 'কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার' নীতিরই মহড়া চললো—তারা চাইলো ভারতীয় কৃষাণ ও শ্রমিকদের দিয়ে বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজকে বিতাড়িত করতে—অর্থাৎ কথামালার বিখ্যাত শৃগালের অংশ নিতে। ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের এই রূপটি আজ জনসাধারণের কাছে বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বৃটিশ বুর্জোয়ারা যখন নেপথ্যে গিয়ে হাঁপাচ্ছে, যখন পুনরায় তার মল্ল ভূমিতে অবতীর্ণ হবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নি, তখনই ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ তাদের সাম্য ও স্বাধীনতার টিকি-তিলকের ভেখ মুহূর্তে বর্জন ক'রে প্রবল মাংসাশী হয়ে উঠেছে—সমগ্র ভারতবর্ষে কৃষাণ ও শ্রমিক নিষ্পেষণের এক বিপুল কার্যক্রম হয়েছে গৃহীত।

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও যখন শাদা পুঁজির সংগে ভারতীয় কালো পুঁজির সংঘাতের সূচনা হোলো, তখন দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় ধনিক ব্যবসায়ীরা ভারতীয় জনসাধারণের অধিকারের দাবী ও বর্ণবিদ্বেষের প্রতিবাদের মতো কয়েকটি গণতান্ত্রিক সূচী নিয়েই তাঁদের সংগ্রাম শুরু

করতে চাইলেন। তবে একথাও উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল পরিপূর্ণরূপেই। তাই ভারতীয় শ্রমিকদের অসন্তোষ এবং সংগ্রামী শক্তির পিঠে চড়েই সেদিন কালো পুঁজি দক্ষিণ আফ্রিকায় শাদা পুঁজির পাশে গিয়ে পৌছতে চাইলো।

কিন্তু ইতিহাসের এই জটিল ঘটনাগুলিকে সেদিন গান্ধীজি বুঝতে পারলেন না। যদিও শাদা ও কালো পুঁজির লড়াইকে স্পষ্ট ক'রে তোলার মতো বহু তথ্য ও ঘটনা তিনি তাঁর 'দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ' গ্রন্থে-ও উল্লেখ ক'রে গেছেন। কিন্তু ঘটনাগুলিকে তিনি যথাযথ ভাবে লক্ষ্য করেন নি। তাই বর্ণ-বিদ্বেষের বীভৎস ব্যাধির স্বরূপ তাঁর চোখে ধরা পড়লো না। তিনি কেবল দেখলেন তার বাইরের বিকট উপসর্গ, আর কুৎসিত গলিত ক্ষত। তাই পীড়িতের বেদনায় তাঁর প্রাণ বিগলিত হোলো, তিনি কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্তকে একদা যেমন সস্নেহে সেবা ক'রেছিলেন, তেমনি সস্নেহ করুণায় সেবা করতে চাইলেন বর্ণ-বিদ্বেষ-কাতর নিপীড়িত দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসা নয়, সেবা—সেবা করতে চাইলেন।

ব্যাধির স্বরূপ গান্ধীজি জানতেন না, তাই কেবল ব্যাধির উপসর্গ উপশমের জন্যে তিনি সস্নেহে প্রলেপ দিলেন। আর এইটিই তাঁর চরিত্রের প্রকৃত দিক,—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁর মানসিক গঠন-ভংগীর দিক থেকেও তিনি চিকিৎসক ছিলেন না, ছিলেন শুশ্রূষাকারীমাত্র। অবশ্য সমাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে এই ধরণের শুশ্রূষা ও সেবার রীতিকে তিনি অনেক সময় চিকিৎসা ভেবেও ভুল করেছেন। একটি মহান স্নেহময় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। আর শ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারী হবার জন্যে এই গুণটিই ছিল সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাঁর এই

স্নেহময় হৃদয়টিই তাঁকে বুয়ার যুদ্ধে, জুলু যুদ্ধে সেবাদল গঠন করিয়েছে, তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে দীন হীন ভারতীয়দের দুঃখে বেদনায় ভারতীয় রাজনীতিতে, তাঁকে শান্তির বাণী হাতে পাঠিয়েছে নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে। তাই দেশ যখন আসন্ন অর্থনীতিক মৃত্যু-সংকটে পতিত, রাজনীতিক, সাম্প্রদায়িক নানা উপসর্গে বিপন্ন বিপর্যস্ত, তখনও তিনি মূল ব্যাধির দিকে লক্ষ্য দেন নি, তার উপসর্গগুলির যন্ত্রণাকে সাময়িক উপশম করার চেষ্টাতেই ছিলেন ব্যস্ত। তাই তিনি দেশের অর্থনীতিক রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক সংকটের মূল ব্যাধি পুঁজিতান্ত্রিকতার দিকে দৃষ্টি দেন নি, সেই বীভৎস ব্যাধির বিকট যন্ত্রণায় কাতর দেশকে তিনি দিয়েছেন তাঁর বিপুল স্নেহসিক্ত হৃদয়ের সেবা ও শুশ্রূষা, তাঁর চরকা, তাঁর প্রেম, তাঁর অহিংসা, তাঁর হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, পার্শী, শিখের 'মিলনের মহা মৈত্রীর' বাণী। শুশ্রূষাকারীর চাই স্নেহসজল হৃদয়, কিন্তু কেবল হৃদয়েই তো চিকিৎসকের চলে না। চিকিৎসকের চাই দৃপ্ত বুদ্ধি, ব্যবহারিক জ্ঞান, কঠোর, এমন কি নৃশংস নিষ্ঠা। তাই সোভিয়েট বিপ্লবের সময় আমরা যখন লেনিনকে * দেখেছি কঠোর নিপুণ চিকিৎসক রূপে, তখন ভারতীয় বিপ্লবের কালে গান্ধিজীকে আমরা দেখি, এক স্নেহময় শুশ্রূষাকারীর ভূমিকায়, যে-শুশ্রূষাকারী স্নেহের অতি প্রাবল্যে অনেক সময় ব্যাধির কোনো উপসর্গের সাময়িক উপশমের জন্যে রোগীকে অনিষ্টকর পথ্য বা ঔষধ দিচ্ছেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছে, তিনি যেন সেই স্নেহ-পরবশ জননী, যিনি স্নেহের বিহ্বলতায় রুগ্ন মুমূর্ষু পুত্রের মুখে অনিষ্টকর

* লেনিন বুঝি হ্যামলেটের মতোই বলেছিলেন, "I must be cruel only to be kind." (অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেট বা টুর্গেনেভের বাজারভ চরিত্রের সংগে তাঁর তুলনা করা-ও অন্যায়।

পথ্য-ও তুলে দিচ্ছেন, কিম্বা যিনি কঠিন অস্ত্র চিকিৎসকের কবল থেকে পুত্রকে সস্নেহে আগলে রাখছেন, কোনো মতেই বুঝতে চাইছেন না যে, এই অস্ত্রচিকিৎসা ভিন্ন তাঁর মুমূর্ষু পুত্রের কোনো গত্যন্তর নেই। লেনিনের কঠোর, নিপুণ, এমন কি কতক পরিমাণে নৃশংস অস্ত্র চিকিৎসায় আজ সোভিয়েট দেশগুলি এক নূতন জীবনে প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে, আজ সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্বেত পীত কৃষ্ণ বিভিন্ন বর্ণের মানুষ সমান অধিকার পেয়েছে, এশিয়াবাসী স্টালিনকে ইউরোপীয়েরা তাদের সর্ববরেণ্য নেতা হিসাবে গ্রহণ করতে-ও কুণ্ঠিত হয় নি। যে-উজবেকিস্থানের বাসিন্দাদের নাম (উজবুক) বাংলা ভাষায় একদা মূর্খতাব্যঞ্জক তিরস্কার রূপে প্রচলিত ছিল, তারা মাত্র কয়েক বৎসরে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় আজো বর্ণবিদ্বেষের অবসান হয় নি, আর ভারতবর্ষ আজো তার মুমূর্ষু রোগ শয্যায় প'ড়ে কাতরাচ্ছে। কিন্তু আজকের রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু ভারতের সেই-ই চরম ক্ষতি নয়। তার রোগ শয্যার পাশ থেকে তার স্নেহসজল শুশ্রূষাকারী মহাপ্রাণটিকে-ও সেই পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাধির মারাত্মক সংক্রমণ নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে নিয়েছে। সেই তার পরম সর্বনাশ।

তাই বলেছি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজি যখন বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, সেখানে তাঁর ভূমিকাটিকে আমরা, চিকিৎসকের নয়, শুশ্রূষাকারীর রূপেই দেখলাম। এ জন্যে গান্ধীজিকে দোষ দেওয়া যায় না, যেমন দেওয়া যায় না চিকিৎসা জানে না ব'লে শুশ্রূষাকারিণীকে। গান্ধীজি ইতিহাসকে ও অর্থনীতিকে কখনো তাদের সত্যিকারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান নি। তাঁর বিরাট অতল একটি হৃদয় তাঁর বুদ্ধিকে চিরদিনই কোয়াশাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, গভীর সমুদ্র যেমন ভাবে উর্ধ্ব আকাশকে

কোয়াশাচ্ছন্ন ক'রে রাখে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে-ও তার ব্যত্যয় হয় নি। তাই গান্ধীজি ১৮৯৪ সালের মে মাসে নাতালে শেঠ হাজী মহম্মদ হাজী দাদা, শেঠ আবদুল্লা হাজী আদম, শেঠ দাউদ মহম্মদ, মহম্মদ কাসম কমরুদ্দীন, শেঠ আদমজি মিঞা খাঁ, কোলেন্দভেলু পিল্লে, সি. লক্ষ্মীরাম, রংগস্বামী পড়িয়াচি, আদমজীভা ও পার্শী রস্তমজী প্রভৃতি বিরাট ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললেন। ভারতীয় কংগ্রেসের সংগে যোগাযোগ রাখার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হোলো 'নাতাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস'।

আমরা যথাস্থানে দেখবো,শাদা পুঁজির বিরুদ্ধে কালো পুঁজির লড়াইএর রথকে খনির শ্রমিকরা কী ভাবে টেনেছে, যদিও ভারতীয়দের ভোটাধিকার হ'লেও আসল ভোটাধিকার তাদের হাতে আসবে না, যদি-ও দক্ষিণ আফ্রিকায় জমি বা জমিদারি কেনার অধিকার ভারতীয়রা পেলে-ও, তারা জমির বা জমিদারির মালিক হবে না। অবশ্য এ নূতন কিছু ঘটনা নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা গেছে, যেখানেই কোনো অবিচারের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে,—স্বাধীনতার জন্যে, সাম্যের জন্যে বা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে লড়াই হয়েছে, শ্রমিক বা কৃষাণের শক্তিই সেখানে তাকে জয়যুক্ত করেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের খণ্ড জয়ের ইতিহাসগুলির মধ্যে-ও সন্ধান করলে তারই একান্ত প্রমাণ মিলবে। ভারতীয় কংগ্রেসের পরাজয় ও বিপত্তি তখনই ঘটেছে, যখনই তার দেশীয় বুর্জোয়া নেতারা দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকের বিপুল শক্তির সাহায্য না নিয়ে বিদেশীয় বুর্জোয়াদের সংগে বন্ধুত্ব করেছে। এই বন্ধুত্বের সংগে সংগে সমস্ত গণতান্ত্রিক ভেখ-ও তারা ফেলেছে ছেড়ে। তারা রাতারাতি ভারতে বৃটিশ শোষণের রথের

চাকাগুলোকে নিজেদের রথে জুড়ে দিয়ে দেশে শোষণ-রথ-যাত্রার মেলা বসিয়েছে। আর সেই শোষণ-তাণ্ডবের নাম দিচ্ছে 'স্বাধীনতা'—ভারতীয় শ্রমিক, কৃষাণ ও মধ্যবিত্তকে শোষণ করার দেশীয় বুর্জোয়াদের অবাধ স্বাধীনতা!

গান্ধীজিই ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতৃত্ব ক'রেছিলেন, কিন্তু সে-স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপটিও তিনি যেমন বুঝতে পারেন নি, তেমনি বুঝতে পারেন নি দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের রূপটিও। * তাই গান্ধীজিকে এমন কোনো মোটর চালকের সংগে তুলনা করা চলে, যে মোটর-চালক মোটরের বিভিন্ন যন্ত্রের গুণাগুণ না জেনে, কোনো দুর্যোগের রাত্রে কেবল হৃদয় আর দুঃসাহসের জোরে বিপন্ন যাত্রীদের নিয়ে দুর্গম পাহাড়ের পথে যাত্রা করলো। মাঝপথে মোটরের ঘটলো দুর্ঘটনা, সহৃদয় দুঃসাহসী চালকের ঘটলো মৃত্যু, বিপন্ন যাত্রীরা বিপন্নতর হোলো, যানের কলগুলো গেলো বিগড়ে। কী ভারতে কী আফ্রিকায় গান্ধীজি ঠিক এমনি একটি ভূমিকাতেই বারে বারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর বিরাট হৃদয় ও দুরন্ত দুঃসাহস নিয়ে তিনি নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু তাতে স্থায়ী কোনো ফল লাভ হয় নি। তা আজকে ভারতীয় জন-সাধারণের দুর্দশা দেখলে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় নির্যাতনের সংবাদ-গুলি শুনলে স্পষ্টই বোঝা যায়।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দে বা তার কিছু আগে একটা আইন ক'রে অরেঞ্জ-ফ্রী স্টেটের ভারতীয়দের সমস্ত স্বত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। যারা হোটেলে

* আমরা পরে লক্ষ্য করবো, গান্ধীজি এক দুরন্ত ঐতিহাসিক স্রোতাবর্তের সম্মুখে কেবল রাম নামের ভরসা নিয়ে তাঁর তরী ভাসিয়ে দিয়েছেন, তাই তাঁর তরী নিরাপদে বন্দরে পৌছতে পারে নি।

ওয়েটার বা অনুরূপ চাকরিতে সামান্য মজুরি নিয়ে থাকতে চায়, কেবল সেই রকম ভারতীয়রাই সেখানে থাকার অনুমতি পেয়েছিল। সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের-ও নাম মাত্র খেসারত দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ট্রান্সভালেও ভারতীয় দমনের জন্যে ১৮৮৫ সালে কড়া আইন পাশ হ'য়েছিল। স্থির হ'য়েছিল, ভারতবাসী মাত্রকেই মাথাপিছু তিন পাউণ্ড হিসাবে প্রবেশ-ফি দিতে হবে, কেবল নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তারা জমি পাবে, তবে সে-জমিতেও তাদের কোনো রকম মালিকী স্বত্ব থাকবে না। ভোটের-ও থাকবে না অধিকার। ফুটপাত দিয়ে তারা হাঁটতে পারবে না। রাত্রি নটার পর বিনা লাইসেন্সে বাইরে আসা তাদের পক্ষে হবে বে-আইনী। অর্থাৎ, ধনী ভারতীয়রা, যাদের পক্ষে এই সব নিয়ম কানুন মেনে চলা মুনাফার খাতিরে-ও প্রায় অসম্ভব, এমনি ভাবেই তাদের বিতাড়নের ব্যবস্থা হ'য়েছিল। গান্ধীজি নিজে-ও একদিন ফুটপাতে চলতে গিয়ে ভয়াবহভাবে প্রহৃত হ'য়েছিলেন। সুতরাং আমরা স্পষ্টই লক্ষ্যই করছি, ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়কে দক্ষিণ-আফ্রিকায় কোণ-ঠাসা ক'রে রাখার জন্যেই শাদা পুঁজিবাদীরা এই বর্ণ-বিদ্বেষকে জাগিয়ে রেখেছে। আর ভারতীয় ধনিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের লড়াইএর দ্বারা বর্ণ-বিদ্বেষের সম্পূর্ণ বিনাশ হবে, এমন আশা করা বৃথা। বর্ণ-বিদ্বেষ বিনাশের জন্যে চাই শাদা ও কালো পুঁজির সম্পূর্ণ নিপাত—এবং শাদা ও কালো শ্রমিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। সোভিয়েট দেশে ইউরোপীয় এবং এশীয় মানুষেরা যে বর্ণ-বিদ্বেষহীন হ'য়ে বাস করছে, তা উল্লেখ করেছি। যাই হোক, ধনিক গণতান্ত্রিক লড়াইকে-ও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে সাধারণ মানুষকে তা প্রস্তুত করে। সাধারণ মানুষের

মধ্যে যে বিদ্বেষ-বিক্ষোভ খণ্ড বিক্ষিপ্তরূপে দেশময় ছড়িয়ে থাকে, ধনিক পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি তাকে সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী করে।

ভারতবর্ষে ধনিক পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্যে ডাক দিয়ে গান্ধীজি যেমন ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে অন্তত সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও প্রস্তুত ক'রে তুলেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তিনি ক'রেছিলেন তেমনিটি। ধনী ব্যবসায়ীদের পতাকাতলে দাঁড়িয়ে জনসাধারণকে জানিয়েছিলেন অন্যায়ের কথা, অবিচারের কথা, জাগরণের কথা, সংগ্রামের কথা। ভারতবর্ষে সে-সংগ্রামের যেমন শেষ হয় নি, দক্ষিণ আফ্রিকাতে-ও হয় নি তেমনিটি। তবু উভয় স্থানেই গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে সাধারণ মানুষকে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও প্রস্তুত ক'রে তোলার গৌরবের তিনিই যে প্রধান অধিকারী, সে-বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

কয়েক মাসের মধ্যে আবদুল্লা শেঠের মামলা শেষ হোলো। গান্ধীজিই মধ্যস্থ হ'য়ে মামলাটি মিটিয়ে দিলেন। তারপর, তিনি প্রস্তুত হলেন দেশের সেবার জন্যে। এই কয়েক মাসেই গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের মধ্যে প্রচুর প্রভাব বিস্তার ক'রেছিলেন। তাই গান্ধীজিকে বিদায় দেওয়ার জন্যে একটি ভোজ-সভা আহূত হোলো। এই ভোজ সভায় একটি সংবাদ-পত্রে গান্ধীজির চোখে পড়লো, নাতাল আইনসভায় ভারতীয়দের "ভোটের অধিকার রদ" করার ব্যবস্থা। অর্থাৎ অরেঞ্জ-ফ্রী স্টেট এবং ট্রান্সভালে ভারতীয় ধনিকদের কোণ-ঠাসা করার যে ব্যবস্থা হয়েছে, নাতালেও ঠিক তেমনি একটি ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। শেঠ আবদুল্লা এবং তাঁর ধনিক সম্প্রদায় এর সুদূরবিস্তৃত তাৎপর্য বুঝলেন। তাঁরা অরেঞ্জ-ফ্রী স্টেট থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত হয়েছেন, ট্রান্সভালে হচ্ছেন এবং নাতালে-ও অচিরেই

হবেন। স্থতরাং বিদায়ী ভোজ-সভা রাজনীতিক আলোচনা সভায় পরিণত হোলো। সংঘবদ্ধ ভাবে সরকারী কাজের প্রতিবাদের জন্যে গান্ধীজিকে আরো মাসখানেক থেকে যেতে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হোলো। গান্ধীজি স্বীকার ক'রলেন সানন্দে। নাতাল ভারতীয় কংগ্রেসের হোলো প্রতিষ্ঠা। চাঁদা উঠতে লাগলো, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হোলো—ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যুবকরাই এ-বিষয়ে হলেন অগ্রণী। বিল পাশ হ'য়ে যাবে, একথা সবাই জানতেন। কিন্তু তাতে তাঁরা ভয় পেলেন না। এই তো তাঁদের সংগ্রামের শুরু। সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে আরজি পাঠানো হোলো। ফলে এ-বিষয়ে সংবাদপত্রগুলিতে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা চলতে লাগলো। ঐ সময় ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ছিলেন লর্ড রিপন। তাঁর কাছে-ও একটি দরখাস্ত পাঠানো হোলো। দরখাস্ত রচনা করলেন গান্ধীজি স্বয়ং এবং দরখাস্তে দশ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষর সংগ্রহ হোলো। এই আবেদন ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতবর্ষে-ও প্রচুর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। গান্ধীজি দেখলেন, এখন নাতাল ছেড়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্থতরাং নাতালেই স্থায়ীভাবে ব্যারিস্টারি করার কথা তিনি স্থির করলেন। কালা আদমি ব'লে 'বার' থেকে প্রথমে বহু প্রতিবাদ এলে-ও অবশেষে গান্ধীজি ব্যারিস্টারি করার অনুমতি পেলেন। এমনি ভাবে এই লাজুক নম্র মানুষটি দক্ষিণ আফ্রিকার বদ্ধ জলায় বিদ্রোহের তুমুল তরংগ তুলে সেই তরংগ শীর্ষে নির্ভীক দৃপ্ততার সংগে এসে দাঁড়ালেন।

আমি একটু আগেই ব'লেছি, গণতন্ত্রের নামে ধনিকরা যেখানে যতো আন্দোলন করেছে, সর্বত্রই তাদের শ্রমিক ও কৃষাণ জনসাধারণকে সংগে নিতে হয়েছে এবং তাদেরই নামে আন্দোলন চালাতে হ'য়েছে। কারণ, সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্র্যের গণতান্ত্রিক অধিকারের মূল আধার বা

অধিকারী কেবল তারাই। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাতে-ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা যখন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে বর্ণ-বিদ্বেষ-বিরোধী আন্দোলন চালাতে লাগলো,—অর্থাৎ রোগই যখন চিকিৎসকরূপে দেখা দিলো,—তখন শ্রমিকদের সাহায্য না নিয়ে তাদের গত্যন্তর রইলো না। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত শ্রমিকদের সুনিয়ন্ত্রিতরূপে বিপুল শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে কে? সে ভার পড়েছিল গান্ধীজির ওপর। শ্রমিকরা তাদের শোষক ধনিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বিশ্বাস ক'রে সংগ্রামে যোগ না দিলে-ও গান্ধীজির মতো মহাপ্রাণকে তারা সহজে বিশ্বাস করতে পেরেছিল। আর এমনি ভাবে তারা চিরদিন বিশ্বাস করে ব'লেই ধনিকদের লড়াই-ও সম্ভব হয়।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার গিরমিটিয়া বা চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের সংগে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেন। তাদের ব্যক্তিগত নির্যাতনে ও নিপীড়নে গান্ধীজি সর্বদাই সহায় ছিলেন। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে বালাসুন্দরম নামে একজন ভারতীয় শ্রমিকের যে নির্যাতনের উল্লেখ করেছেন, তা-ই ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দস্তুর। তাদের শ্রমিক বলা চলে না, তারা ছিল ক্রীতদাস। গোরা মনিবরাই কেবলমাত্র চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক রাখতে পারতো। চুক্তিতে নির্দিষ্ট কালের মধ্যে মনিবরা শ্রমিকদের ওপর যথেচ্ছ নির্যাতন করতো—এক শতাব্দী পূর্বে ক্রীতদাসদের উপর তারা করতে পারতো যেমনটি। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা গোরা মনিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে গণ্য হোতো। এমনি একজন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক বালাসুন্দরম্ একদা ছিন্নবস্ত্রে, রক্তাক্ত দেহে গান্ধীজির সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। গান্ধীজি শুনলেন, বালাসুন্দরম্ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন গোরা মনিবের কাছে কাজ করে। গোরা

মনিব কোনো কারণে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকে এমন প্রহার ক'রেছে যে তার দুটি দাঁত পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে। গান্ধীজি বালাসুন্দরমকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তাকে নিয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। বালাসুন্দরমকে তিনি পরমাত্মীয়ের মতো সেবা ও সাহায্য করলেন। এই কাহিনীটি গিরমিটিয়াদের মধ্যে অচিরে ছড়িয়ে পড়লো। বালাসুন্দরমের দুর্ভাগ্যকে-ও হিংসা করে এমন গিরমিটিয়ার অভাব ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজির কাছে গিরমিটিয়ারা দলে দলে আসতে লাগলো। এমনিভাবে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের পরম মিত্র হ'য়ে উঠলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে-ও প্রবেশের পূর্বাহ্নে আমরা গান্ধীজিকে এমনি একটি ভূমিকায় আবার লক্ষ্য করবো। তিনি কৃষাণ ও শ্রমিক-বিদ্রোহের পরীক্ষিত নেতা হিসাবেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করছেন!

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ভারতীয় গিরমিটিয়াদের ওপর বৎসরে পঁচিশ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩৭৫৲ কর ধার্য করার জন্য নাতালে চেষ্টা হোলো। গিরমিটিয়াদের রোজগারের তুলনায় এই করটি আপাত দৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর লাগে। কারণ, এর পরিমাণ গিরমিটিয়াদের বাৎসরিক আয়ের চেয়ে-ও বহুগুণ বেশি। সুতরাং কর আদায়ের জন্যে নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গিরমিটিয়া ভারতীয়-দের তাড়াবার জন্যে যে নাতাল সরকার এই কর ধার্যের প্রস্তাব করলেন, তা সুস্পষ্ট। অথচ ১৮৬০ খৃস্টাব্দে ভারতীয় গিরমিটিয়াদের নাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে শাদা পুঁজি-চালিত দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের কী সাধাসাধি, কী চেষ্টাই না ছিল! কিন্তু চল্লিশ বৎসর বাদে ভারতীয়দের নাতাল থেকে তাড়াবার কী এমন কারণ ঘটলো? পুঁজির ধর্মই হোলো সস্তায় শ্রমিক খোঁজা। ভারতের উলংগ উপবাসী শ্রমিকের মতো সস্তার শ্রমিক আর

কোথায় মিলবে? তাই শাদা পুঁজি একদিন কালো শ্রমিককে পরম আদরে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু পুঁজির আর একটি আত্মঘাতী ধর্ম হোলো, যেখানের শ্রমিককে সে শোষণ করে, সেখানের স্থানীয় ধনিক সম্প্রদায়কে সে ক্রমে শক্তিশালী ক'রে তোলে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরমিটিয়া ভারতীয়দের আমদানীর সংগে সংগে সেখানে ভারতীয় পুঁজির-ও ঘটলো আমদানী। কিন্তু শাদা পুঁজির তা সইলো না। তারা ভারতীয় পুঁজিকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিতাড়িত করার জন্যে বর্ণ-বিদ্বেষের প্রচার ও ভারতীয় নির্যাতন শুরু করলো। নাতালে গিরমিটিয়াদের উপর বৎসরে ৩৭৫ টাকা কর ধার্য করার প্রস্তাব-ও এই ভারতীয় পুঁজিকে বিতাড়িত করার অস্ত্র মাত্র ছিল। ভারতীয় গিরমিটিয়াদের আগমনের পশ্চাতে যেমন ভারতীয় পুঁজির আমদানি হয়েছিল, গিরমিটিয়া ভারতীয়দের পলায়নের পশ্চাতে তার প্রস্থান-ও ঘটবে, শাদা পুঁজির এই ছিল বিচক্ষণ মতলব। গিরমিটিয়াদের উপর রোষটা যে আসলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের-ই ওপর, গান্ধীজি-ও তা বুঝতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি বলেন: "যখন তারা (শাদা পুঁজির মালিকরা) ভারতীয় মজুরদের আদর ক'রে নিয়েছিল, তখন ভারতীয়দের ব্যবসা-বুদ্ধির শক্তি সম্পর্কে তাদের খেয়াল ছিল না। গিরমিটিয়ারা কৃষক হিসাবে স্বাধীনভাবে যদি থাকে, তাতে এখন-ও তাদের ক্ষতি ছিল না। কিন্তু ভারতীয়েরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশ করবে এ অসহ্য হোলো।" * এই কথাগুলির মধ্যে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা

* এই ধরনের বহু উল্লেখ গান্ধীজি তাঁর 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' গ্রন্থে ও করছেন: "ভারতীয়রা ১৮৮১ সালে প্রথম ট্রান্সভালে প্রবেশ করে। শেঠ আবুবেকার প্রিটোরিয়াতে একটি দোকান খোলেন এবং একটা প্রধান রাস্তার উপর এক টুকরা জমি কিনেন। তাঁহার পথ ধরিয়া অন্য বেপারীরাও যায়। তাহাদের অতিশয় কৃতকার্যতা

যাবে, গান্ধীজি "ভারতীয়দের ব্যবসায়-বুদ্ধি-শক্তি"কে ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদীর প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। যে-মেদের চাপে রোগীর হৃৎপিণ্ডের কাজ একদিন বন্ধ হ'য়ে যাবে, সেই অতিরিক্ত মেদকে-ই তিনি স্বাস্থ্যের লক্ষণ ব'লে ভেবেছেন। বস্তুত, আজকের পুঁজিবাদী ব্যবসায়ের সত্যিকারের বীভৎস গলিত রূপ গান্ধীজির চোখে কখনো ধরা পড়ে নি। না পড়ার-ই কথা। কারণ, ভারতে বুর্জোয়া সম্প্রদায় যখন সবেমাত্র স্বপ্রতিষ্ঠ হ'তে চলেছে, তারই শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি মানুষ হ'য়ে ছিলেন। এবং সেই একদা-লব্ধ শিক্ষাকে পরবর্তী জীবনে-ও তিনি কখনো ত্যাগ করতে পারেন নি। ভারতের স্থানীয় ধনিক অভ্যুত্থানের যুগের মানুষ গান্ধীজি। তাই দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সংগে সহযোগমূলক সংগ্রামের এবং ধনিক জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক তিনি। কিন্তু কেবল তাই-ও নয়। ধর্মবিশ্বাসী হওয়ায় তিনি ইতিহাসের পরিবর্তনের অপেক্ষা তার সনাতনত্বে গভীরতর বিশ্বাসী। ফলে

দেখিয়া ইউরোপীয় বেপারীদের ঈর্ষা হয় এবং তাঁহারা সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন ও পার্লামেন্টে দরখাস্ত দেন যে ভারতীয়দিগকে যেন বহিষ্কার করা হয় এবং তাহাদের ব্যবসা যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।"

"সকলেই ইহা মনে করিতেন যে, স্বাধীন বেপারীরাই ইউরোপীয় আক্রমণের লক্ষ্যস্থল।" "নাতালে কেবল চুক্তিবদ্ধ মজুর রাখিয়া অন্য সকল ভারতীয়কে তাড়াইয়া দেওয়ার কল্পনা চলিতেছিল, আর সেইজন্য স্বায়ত্ত শাসনাধিকারও লওয়া হইয়াছিল।" (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের অনুবাদ থেকে)

কেবল এই ধরনের কয়েকটি উদ্‌ধৃত বাক্য নয়, সমগ্র 'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ' বইটি পড়লে বোঝা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষটা শাদা ও কালো পুঁজির লড়াই মাত্র ছিল। কিন্তু গান্ধীজি পড়ন্ত সামন্ত তান্ত্রিক ও বাড়ন্ত বুর্জোয়া সমাজের আবহাওয়ায় মানুষ হওয়ায় ধনিকের লড়াইকে নিঃসন্দেহে জনসাধারণের লড়াই হিসেবে গ্রহণ করেছেন—এ জন্যে তাঁকে অপরাধী করা যায় না।

ভারতের নবোদ্ভূত ধনিক সম্প্রদায়কে তিনি ইতিহাসের গতিশীল অবয়বের মধ্যে দেখেন নি, দেখেছেন তাকে প্রাচীন কিছু একটা বস্তুরূপে, যদি-ও সম্পূর্ণরূপে তাকে তিনি গ্রহণ-ও করেন নি। গান্ধীজির ধারণা, ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় আদিম ও অকৃত্রিম, সনাতন, শাশ্বত। কারণ, ভগবৎ-গীতায় ভগবান-ও তাঁর 'শ্রীমুখে' বৈশ্যবর্ণের সৃষ্টির কথা ব'লে গেছেন। গান্ধীজি ইতিহাসকে তার গতিশীল পরিবর্তনশীল ধর্মের মধ্য দিয়ে না দেখার ফলে গীতায় উল্লিখিত বৈশ্য সমাজ এবং আজকের বৈশ্য সমাজকে অভিন্ন দেখে ফেলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে, গীতা-ও যেমন একটি বিশেষ সমাজের বস্তু, সেই গীতার উদ্গাতা ভগবান-ও তেমনি একটি বিশেষ সমাজের বস্তু এবং সেই গীতায় উল্লিখিত বৈশ্য সমাজ-ও কেবল সেই বিশেষ সমাজেই প্রযোজ্য বা প্রশংসনীয়। গীতার সমাজে মানুষ এমন একটি অবস্থায় এসেছে, যেখানে বংশগতভাবে শ্রমবিভাগ কার্যকরী হয়েছে এবং বিনিময় প্রথার পরিবর্তে বিক্রয় প্রথার হয়েছে প্রবর্তন। আর এই সমাজ ব্যবস্থাটি ভারতে বহু শতাব্দী কাল ধ'রে অনড়

পূর্বে আমি লেনিনের সংগে গান্ধীজির তুলনা করেছি। সে জন্যে কেউ যেন না ভাবেন যে, গান্ধীজি লেনিন হন নি ব'লে আমি তাঁর ওপর দোষারোপ করছি। রাশিয়ার যে অর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে লেনিন জন্মেছিলেন বা নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, গান্ধীজি যখন জন্মেন বা দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনকার ভারতের অবস্থার সংগে তার ছিল অনেক প্রভেদ। রাশিয়া ছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষক এবং ভারত ছিল শোষিত সাম্রাজ্য। তাই আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটনের সংগে গান্ধীজির যেমন তুলনা চলে, তেমনটি আর কারো সংগে চলে না। দু জনেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সহযোগী সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। জেনারেল চার্লস্ লী বা টমাস জেফার্সনের মতো জনসাধারণের মুখপাত্রের চাপে প'ড়ে জর্জ ওয়াশিংটন যে বুর্জোয়া বিপ্লবকে পূর্ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, গান্ধীজি তাকে অপূর্ণ রেখে গেছেন, এই যা পার্থক্য।

হয়ে ছিল। তাই ভারতের বদ্ধ সমাজে গীতার বাণী শুদ্ধ সনাতন হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ সে-সমাজ ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে অন্তর্ধান করেছে। সুতরাং গীতার সমাজে যা ছিল প্রচার্য, আজ তা অপপ্রচার্য হ'য়ে উঠেছে। একদা সমাজে যা ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজনের একান্ত অপরিহার্য বস্তু—অগ্নি, আজ বিংশ শতাব্দীতে তা অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে উঠেছে। বস্তুত, ধর্ম-শাস্ত্রে অগ্নি-পূজার বিহিত বিধি আছে, তাই ব'লে কেউ যদি অগ্নিকাণ্ডের পূজা করতে বসেন, তবে তাঁর দোহাই। আজকের সমাজের ব্যবসায়কে তার যথাযথ ঐতিহাসিক পরিণতির মধ্যে না দেখার ফলেই গান্ধীজির সমগ্র জীবনের প্রচেষ্টা এমন ব্যর্থ হয়েছে। এমন মহাশক্তিতে তিনি হাওয়ায় উঠে হাউই-এর মতো প্রচণ্ড শব্দে শূন্যে বিলীন হ'য়ে গেছেন!

তাই গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের জন্যে যখন সংগ্রাম শুরু করলেন, তখন শ্রমিকদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সত্ত্বেও ধনিকদের সাহায্যেই তাঁকে যুদ্ধে নামতে হোলো। তাই তিনি তাঁর সংগ্রামে চমকপ্রদ কলাকৌশল বহু দেখালেন সত্য, কিন্তু সংগ্রামটা ব্যাধির বিরুদ্ধে না হ'য়ে উপসর্গের বিরুদ্ধেই হ'তে লাগলো। নাতাল সরকারের এই কর-ধার্যের প্রস্তাব ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে চিন্তিত করেছিল, আসল তাৎপর্য বুঝতে তাদের বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নি। আঘাতটা আপাত দৃষ্টিতে শ্রমিকদের উপরে আসায় তাদের সুবিধাই হোলো। গণতান্ত্রিক দাবীর নামে তাদের পুঁজির লড়াই তারা শুরু করলো। সংগ্রামের ফল হিসাবে কর পঁচিশ পাউণ্ড থেকে প্রথমে তিন পাউণ্ডে এসে নামলো। পরে এই কর সম্পূর্ণরূপে তুলে দেওয়ার জন্যে অবশ্য আরো বিশ বৎসর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। গান্ধীজির এই বিশ বৎসরের সংগ্রামকে আমার কাছে কেবলই বিরাট শক্তির এক অপূরণীয় অপব্যয় ব'লে মনে হয়েছে। গান্ধীজি যদি সমাজকে তার

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত দেখে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত শক্তি-নিয়োগ করতেন, বৃটিশ পুঁজিবাদ, (যার পরিণতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে) নবজাগ্রত ভারতীয় পুঁজিবাদ (হিন্দু ও মুসলিম উভয় শিবির), তথা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ আজ ধ্বসে পড়তো, তাতে একটি আঘাতেই ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশগুলি হোতো স্বাধীন, পৃথিবীতে বর্ণ-বিদ্বেষের হোতো লোপ, ভারতের হিন্দু-মুসলমানের হোতো মৈত্রী। কিন্তু গান্ধীজি সে-পথে অগ্রসর হন নি। পরবর্তীকালে-ও এই সুযোগ তিনি বারে বারে পাওয়া সত্ত্বেও জনসধারাণের প্রতি অবিশ্বাসের এবং অতিরিক্ত ধর্মবিশ্বাসের ফলে তাকে গ্রহণ করেন নি। লক্ষ্যস্থানের চেয়ে পথের মোহ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তাই তীর্থে তিনি কোনদিন পৌঁছতে পারলেন না, তীর্থের পথকেই তীর্থ ব'লে গ্রহণ ক'রে সমস্ত জীবন তিনি পথেই কাটালেন। তবে একথা-ও মনে রাখা দরকার, হয়তো তখনো ভারতীয় পুঁজি পুষ্ট না হওয়ায় পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্যে দেশে-ও তার নেতৃত্ব পরিণত হয় নি। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, সেদিন বিষ-বৃক্ষের মূল গান্ধীজি কোনো রকমেই দেখতে পান নি। তাই বৃক্ষের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা, অজস্র বিষ-ফলের বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র জীবন তাঁর আক্রমণ চালিয়েছেন, এক শাখায় ব'সে অন্য শাখা কাটতে গেছেন, —ভারতীয় পুঁজির উপর নির্ভর ক'রে বৃটিশ পুঁজির পরিণতিকে করতে গেছেন ধ্বংস, হিন্দু পুঁজির ঘাড়ে চ'ড়ে শান্ত ক'রতে চেয়েছেন মুসলিম পুঁজিকে। তাই বিভ্রান্ত হ'য়েছেন, ক্লান্ত হ'য়েছেন, দিশেহারা হ'য়েছেন। বিষ-বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, বিষ-ফল কেবলই অজস্র-অসংখ্য হ'য়ে উঠেছে। তিনি অবশেষে আর্তনাদ করে ব'লেছেন, এই বিভ্রান্তিকর পৃথিবী থেকে কবে তাঁর অবকাশ মিলবে। (মৃত্যুর দিন অপরাহ্ণে গান্ধীজি তাঁর স্নেহ-ভাজনদের কাছে এমনি একটি উক্তি ক'রেছিলেন ব'লে-ও সংবাদপত্রে

প্রকাশিত হ'য়েছে!) তাই গান্ধীজির জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বড়ো খেদ হয়, একটি প্রচণ্ড শক্তির কী ভয়াবহ অপব্যয়ই না ঘটেছে —যে-বারুদের স্তূপে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক মহা বিপ্লবের রচনা হ'তে পারতো, কোটি কোটি মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্যের হোতে পারতো অবসান, সেই বিরাট বারুদের স্তূপ মুষ্টিমেয় ভারতীয় পুঁজিবাদীর মুনাফা-মৃগয়ায় নিঃশেষ হ'য়ে গেছে! পুঁজিবাদের ইতিহাসে এমন অপব্যয় কী আর ঘটেছে!

পাঁচ

বস্তুত, গান্ধীজি ধর্মনীতিকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এই প্রয়োগ-প্রয়াসই তাঁর জীবনেতিহাস। গান্ধীজি ধর্মকে সকল দেশে ও সকল কালে অভিন্ন ও সনাতন ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন এবং সেই 'অভিন্ন ও শাশ্বত' বস্তুটিকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন অর্থনীতি ও রাজনীতির মতো দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি বস্তুর মধ্যে। * কিন্তু কোনো ধর্ম বস্তুত চির শাশ্বত বা অভিন্ন হ'তে পারে না। স্থান ও কালের পার্থক্যে তার

---

* ধর্মকে অভিন্ন ও শাশ্বত ব'লে গ্রহণ করার জন্যে গান্ধীজি যে রীতিকে আশ্রয় করেছিলেন, তা অন্যান্য সকল চয়নপন্থী বা eclecticদের মতোই সুবিধাবাদী। তিনি সকল ধর্ম থেকেই নিজের ইচ্ছামত পছন্দমত 'নীতিকে' গ্রহণ করেছেন। বাইবেলে খৃস্টের 'সারমন অন দি মাউন্ট' যখন তাঁর অত্যন্ত ভালো লেগেছে, এবং ক্ষমা, তিতিক্ষা ও ত্যাগের বাণীকে যখন তিনি সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন, তখনই বাইবেলের নোআ বা মোজেস-এর 'চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত লওয়ার' বাণীকে তিনি মিথ্যা ব'লে ত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। বাইবেলের করুণাময় ভগবান তাঁর কাছে সত্য, কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগবান জেহোভা তাঁর কাছে অলীক কল্পনা মাত্র। গান্ধীজি যখন খৃস্টের বাণী অনুসারে সকল মানুষকে ভগবানের আত্মজ হিসাবে সমান ব'লে প্রচার করছেন, ঠিক সেই সময়ই যখন তিনি দেখলেন ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট পল ক্রুগার বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাকেই ভারতীয় নির্যাতনের ন্যায়সংগত প্রেরণা ব'লে ভারতীয়দের বোঝাচ্ছেন, তখন তিনি বিরক্ত হন এবং ক্রুগারের ওল্ড টেস্টামেণ্টকে অলীক এবং তাঁর নিজের নিউ টেস্টামেণ্টকে অভ্রান্ত সত্য ব'লে ঘোষণা করেন।

"তিনি (প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার) খানিকক্ষণ তাহাদের (ভারতীয়দের) কথা শুনিয়া বলেন—'তোমরা হইতেছ ইসমেলের সন্তান, সেই জন্য তোমরা ইসাউএর সন্তানগণের দাসত্ব করিতে বাধ্য। আমরা ইসউএর সন্তান, আমরা তোমাদিগকে আমাদের সমান

রীতি ও নীতির বৈষম্য ঘটবেই। লিখিত শব্দের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মনুষ্য-সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সমাজের ভিন্নতর অর্থনৈতিক অবয়বের মধ্যে ধর্মের নীতি এবং রীতির পার্থক্য ঘটেছে। * কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের মতো ধর্মনীতির, সংস্কৃতির, সাহিত্যের ও শিল্পের পরিবর্তনটা অতো দ্রুত ঘটে না। ফলে, অর্থনীতির অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার পদক্ষেপের সংগে তাল দিয়ে সমাজের ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্প চলতে পারে না। তখন ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প, এরা

অধিকার দিতে পারি না। আমরা যেটুকু দিই তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিও। প্রেসিডেন্টের এই জবাব যে ক্রোধ বা দ্বেষ প্রণোদিত একথা বলা যায় না। প্রেসিডেন্ট ক্রুগার বাল্যকাল হইতেই পুরাতন বিধানের (New Testament-এর) গল্প শুনিয়া আসিয়াছেন, এবং তাহা সত্য বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।"—'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ, ৫৩পৃঃ।

গান্ধীজি যদি নিউ টেস্টামেন্টের বাণীকে সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করেন, তবে ওল্ড টেস্টামেন্টের বাণীকে সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করার অযৌক্তিকতার যুক্তি কোথায়? আসলে গান্ধীজি এবং মিঃ ক্রুগার উভয়ের একই ত্রুটি। তাঁরা ধর্মকে বা তার বাণীকে সাময়িক ও পরিবর্তনশীল না ভেবে তাকে সনাতন ও চিরস্থায়ী ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও গান্ধীজির ত্রুটি অনুরূপ। গীতার কথাই ধরা যাক। গান্ধীজি যখন গীতার নিষ্কাম কর্ম ও চতুর্বর্ণের বিষয়গুলিকে উচ্ছ্বসিত সমর্থনের সংগে গ্রহণ করছেন, তখনই তিনি সুবিধা মতো "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম" কথাগুলিকে এড়িয়ে গেছেন। দুষ্কৃতের বিনাশ সম্পর্কে গান্ধীজি যতোই অহিংস ব্যাখ্যা দেন না কেন, তা যে ব্যাখ্যার বিকৃতি মাত্র তা বুঝতে দেরি হয় না। তা ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিংসাত্মক যুদ্ধই ছিল।

* এখানে উদাহরণ স্বরূপ খৃস্টান ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। একই খৃস্টান ধর্ম সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার তারতম্যের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানের সংগে সংগে যখন ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে প্রতিযোগিতার

একযোগে বলতে থাকে, আমরা সনাতন, আমরা অভিন্ন, আমরা সকল কালে সকল দেশে এক, আমরা নড়বো না। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা বলে, অসম্ভব, আমার সংগে পা মিলিয়ে তোমাদের চলতেই হবে, কারণ, আমি পরিবর্তনশীল, প্রগতিশীল, আমি ভিন্ন, আমি বহুরূপী। এমনি ভাবে প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক কালেই দেখা গেছে, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পের সংগে সেই যুগের উৎপাদন-ব্যবস্থার বিরোধ ঘটেছে, প্রতিবারেই উৎপাদন-ব্যবস্থা হয়েছে জয়ী। আর এ জয়ের নামই ধর্মে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে ও শিল্পে বিপ্লব। দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা যে পথে চলবে, সে-দেশের ধর্মকে, সংস্কৃতিকে, সাহিত্যকে, শিল্পকে সে-পথেই চলতে হবে। এই টানাটানির ব্যাপারটিকে আমরা যদি গো-শকটের সংগে তুলনা করি, তবে বলতে পারবো, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা হোলো গোরু, আর সেই

বাজারে শ্রম বিক্রয়ের স্বাধীনতাকে চালু করার চেষ্টা হয়েছে, তখনই ব্যক্তিগত ধর্ম-চর্চার হয়েছে উদ্ভব, লুথার্যানিজম বা ক্যালভিনিজম-এর হয়েছে জন্ম। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে চতুর্দশ শতাব্দীতে জন উইক্লিফের যুগ থেকে যে ননকনফর্মিটির শুরু হ'য়েছিল, তা প্রেসবিটেরিয়ানিজম ইণ্ডিপেডেণ্টস, কোয়েকার, ললার্ডি, প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এক বর্ধমান বুর্জোয়া অর্থনীতিকেই প্রকাশ করেছে। এই প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, বুর্জোয়া অভ্যুত্থান যেমন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রচার ক'রলেও সত্যিকারের ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেনি, প্রোটেস্টাণ্টিজম-ও তেমনি ধর্ম স্বাধীনতার প্রচার ক'রেও সত্যিকারের ধর্ম স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করে নি। প্রোটেস্টাণ্টিজমও ক্যাথোলিসিজমের অপেক্ষা কম গোঁড়া বা কম আনুষ্ঠানিক নয়। বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের ফলে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। ধর্মে তার প্রতিফলন রূপে ইউরোপে আমরা রোমান ক্যাথলিক চার্চের স্থলে জাতীয় প্রোটেস্টাণ্ট ও জাতীয় ক্যাথলিক চার্চের জন্ম হ'তে দেখি। ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে-ও ভারতের নবোদ্ভুত বুর্জোয়া সম্প্রদায় কী ভাবে গ'ড়ে ওঠে, তার প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্প, এগুলো হোলো মাল-বোঝাই শকট। চলন্ত গো-শকটে আমরা গোরু আর শকটকে সর্বদাই এক সংগে একযোগে চলতে দেখি এবং গোরুর চেয়ে বোঝাই-করা শকটটাকেই লাগে অনেক বেশি বড়ো। গোরুর মুখ দিয়ে যখন ফেনা উঠতে থাকে, যখন সে ক্রমেই ক্লান্তিতে মাটির সংগে মিশিয়ে যেতে চায়, তখন গাড়ির বোঝা মাথা উঁচিয়ে স্পর্শ করে আকাশ। এই দেখে কোনো পথিক দার্শনিক যদি ভাবেন, যেহেতু মাল-বোঝাই গাড়িটা বিরাট, এবং যেহেতু তা আকাশ স্পর্শ করছে, আর গোরু দুটো ক্রমেই ক্ষীণ দেহে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে, সেই হেতু চলন্ত গো-শকটের শক্তির আধার হোলো ভেঙে-পড়া গোরু নয়, বোঝা-ভরা আকাশস্পর্শী গাড়িটা, তখন তিনি যে ভুল করবেন, যাঁরা উৎপাদন শক্তির উর্ধ্বে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা শিল্পকে স্থান দেন, তাঁরা-ও করেন ঠিক তেমন-টি। গান্ধীজি এই ভুলই করেছিলেন। তিনি গাড়ির বোঝাটাকে কেবলই আকাশস্পর্শী ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন, এবং গাড়ি যে টানে তাকে ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন ক্ষীণতর। কেবল তাই নয়, তিনি গাড়িটাকে শক্তির উৎস ভেবে গাড়িকে গোরুর সামনে বেঁধে দিয়েছিলেন। ফলে আমাদের সমাজটা 'গাড়িতে টানা গোরুর' মতো একটা কিম্ভুত-কিমাকার অবস্থার মধ্যে এসে পৌচেছে। গান্ধীজি যদি ধর্মের মধ্যে সামাজিক শক্তির সন্ধান না ক'রে উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে করতেন, তবে তাঁর ধর্মের বোঝা যথাসময়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌছতো। কিন্তু গান্ধীজি তার উল্টোটি করায়, তাঁর ধর্মের বোঝা যথাস্থানে গিয়ে পৌছয় নি, উৎপাদন ব্যবস্থার গোরুগুলো বেসামাল হ'য়ে যে-দিকে ইচ্ছে পালাতে চেয়েছে। আর সেই টানাটানির ফলে আকাশস্পর্শী ধর্মের বোঝা প'ড়েছে ধ্বসে এবং সেই ধ্বসে-পড়া বোঝার চাপে শকট-চালকের-ও ঘটেছে মৃত্যু!

তাই এ-কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে গান্ধীজি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হবার ফলে তাঁর ধর্মালোচনা বা ধর্মানুশীলনে বিন্দু মাত্র ছেদ পড়লো না। দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েকজন খৃস্টান মিশনারির সংগে তাঁর অন্তরংগতা ঘটলো। তাঁদের সংগে আলাপ-আলোচনার ফলে খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে গান্ধীজির জ্ঞান ব্যাপকতর হোলো। তাঁদের কারো কারো স্বধর্ম সম্পর্কে সংকীর্ণতা-ও তাঁর চোখ এড়ালো না। তিনি বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে পড়াশুনো করলেন। বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে গান্ধীজি লক্ষ্য করলেন, খৃস্টের প্রেমের অপেক্ষা বুদ্ধের প্রেমের প্রসার ছিল বিপুলতর। কারণ, প্রাণী-মাত্রের প্রতি প্রেম যিশুর জীবনে দেখা যায় নি। তা দেখা গিয়েছিল বুদ্ধের জীবনে। বুদ্ধের এই সর্ব জীবে করুণার ধর্মকে গান্ধীজি নিজের জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত অনুশীলন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ছিলেন নিরামিষাশী, সর্পের প্রতিও ছিলেন স্নেহ-পরায়ণ। রায়চাঁদজি এই সময়ে ধর্ম বিষয়ে গান্ধিজীকে পত্রযোগে পরামর্শ দিতেন। তিনি গান্ধীজির পড়ার জন্যে নর্মদাশংকরের লেখা 'ধর্ম-বিচার' পুস্তকখানি-ও পাঠান। নর্মদাশংকর প্রথম জীবনে ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী। পরবর্তী জীবনে তাঁর মধ্যে বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং তিনি শুদ্ধাচারী হয়ে ওঠেন। এই গ্রন্থখানি গান্ধীজির জীবনে কিভাবে রেখাপাত করেছিল, তা তাঁর বিলাস-বিভবহীন কৃচ্ছ্র-সাধন জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়। এই সময় গান্ধীজি উপনিষদের অনুবাদগুলি-ও পড়েন। ম্যাক্স্‌মুলার রচিত 'হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে' গ্রন্থখানি তাঁর স্বদেশ-প্রীতিকে পুষ্ট করে এবং অনেক পরিমাণে তাঁর পাশ্চাত্য সভ্যতা-বিরোধী ভ্রান্ত সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের জন্যে দায়ী হয়। গান্ধীজি ঐ সময় কেবল যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন, তাই নয়। তিনি ওঅশিংটন

আর্ভিং এবং কার্লাইল, উভয়ের রচিত মহম্মদের জীবন ও বাণী-ও পাঠ করেন। জরথুস্ত্রর প্রবচন-ও তাঁর বাদ গেলো না। লিও টলস্টয়ের লেখা 'গস্‌পেল ইন ব্রীফ' এবং 'হোঅট টু ডু' বইগুলি-ও তাঁর ধর্ম-চিন্তাকে প্রভাবিত করে। এমনি ভাবে গান্ধীজি বিভিন্ন ধর্মের সংগে পরিচয়ের ফলে সকল ধর্মের প্রতি একটি সহজ প্রীতির অধিকারী হন। এবং ধর্মকেই মানব জীবনের প্রথম ও শেষ আদর্শ রূপে গ্রহণ করেন, তাঁর কাছে ধর্মের সংগে অর্থনীতি ও রাজনীতির কোনো পার্থক্য থাকে না। তিনি ধর্ম দিয়েই অর্থনীতিক ও রাজনীতিক সকল সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হন।

এমনিভাবে ধর্মনীতি ও রাজনীতির প্রাথমিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির তিন বৎসর কেটে গেলো। আদালতে ব্যারিস্টারি যেমন জমে উঠতে লাগলো, তেমনি ক্রমেই তাঁর সম্মুখে জমে উঠতে লাগলো নানা অন্যায় ও অবিচারের সমস্যা। তাই গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন স্থির করলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বাস করাই যখন স্থির হোলো, তখন গান্ধীজি ভাবলেন, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে একবার ঘুরে আসা দরকার। সুতরাং ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গান্ধীজি কলিকাতাগামী একটি জাহাজে চ'ড়ে বসলেন। জাহাজের দিনগুলি তাঁর প্রধানত ভাষা শিক্ষাতেই কাটলো। তিনি উর্দু ও তামিল ভাষা শিখতে লাগলেন। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশার জন্যে যেমন প্রয়োজন উর্দু ভাষার জ্ঞান, মাদ্রাজীদের সংগে মেলা-মেশার জন্যে-ও আবার তেমনি প্রয়োজন তামিল ভাষায় অধিকার।

চব্বিশ দিন বাদে গান্ধীজি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। এই তাঁর প্রথম কলকাতা আসা। কলকাতা থেকে প্রয়াগের পথে তিনি সটান

রাজকোটে চ'লে গেলেন। রাজকোটে এসে গান্ধীজি একটি ছোটো বই লেখেন। বইখানি লিখতে ও ছাপতে একমাস সময় লাগে। বইখানির মলাট ছিল সবুজ। তাই বইখানি 'সবুজ বই' ব'লেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। গান্ধীজি বলেন: "এতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুরবস্থার কথা কম ক'রেই লিখেছিলাম। কেন না আমি জানতাম, ছোট দুঃখ-ও দূর থেকে বড়ো দেখায়।" 'সবুজ বই, দশ হাজার ছাপানো হয়েছিল। সেগুলি ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং নেতাদের কাছে পাঠানো হয়।

এই সময় বোম্বাই-এ হঠাৎ মড়ক দেখা দেয়। রাজকোটে ও মড়ক দেখা দেওয়ার ভয় হোলো। গান্ধীজি সেবার-কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। আগেই বলেছি, গান্ধীজি ছিলেন সেবাধর্মী। মহামারীতে, যুদ্ধে, দুর্ভিক্ষে, গৃহদ্বন্দ্বে সেবার ব্রতে তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল কেটেছে। বোম্বাই-এ এই মহামারীর সময়েই সেই সেবার প্রথম পাঠ তিনি পেয়েছিলেন। গান্ধীজির এই সেবা আবার কয়েকদিনের জন্যে সমাজ থেকে তাঁর নিজের বাড়ির মধ্যে-ও সরে এলো। তাঁর ভগ্নীপতি পীড়িত হ'লেন। ফলে গান্ধীজি ভগ্নীপতির সেবায় লেগে গেলেন। তিনি পরে নিজের এই সেবা-প্রীতি সম্পর্কে বলেন: "আমার শুশ্রূষা করার এই আকাংখা ক্রমেই বিশাল আকার ধারণ করলো। অবশেষে তা এমন হ'য়ে উঠলো যে, শুশ্রূষার জন্যে অনেক সময় আমি কাজকে-ও উপেক্ষা করেছি, স্ত্রীকে, এমন কি সমস্ত পরিবারকে-ও, সেবায় নিযুক্ত করেছি।"

কয়েকদিনের মধ্যেই গান্ধীজির ভগ্নীপতির মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে দেশে প্রচার কার্য চালাবার জন্যে বোম্বাই-এর সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্যার ফিরোজশা মেটার সংগে দেখা

করেছিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে বোম্বাই-এ যে-জনসভার আয়োজন হ'য়েছিল, তার পূর্ব দিনেই গান্ধীজির ভগ্নীপতির মৃত্যু হোলো। কিন্তু ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কোনো দুঃখ-শোক গান্ধীজির জনসেবায় কোনো-দিন অন্তরায় হ'তে পারে নি, সেদিন-ও হ'তে পারলো না। যথাসময়ে গান্ধীজি বোম্বাই-এ এসে পৌছলেন। পূর্বে প্রস্তুত না হয়েই গান্ধীজি সভায় বক্তৃতা করবেন স্থির করেছিলেন। সার ফিরোজশা কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে নিরস্ত করলেন, বললেন, এ বোম্বাই শহর, এখানে লিখিত বক্তৃতা দেওয়াই উচিত। নইলে কাগজে অসম্ভব রকমের ভুল রিপোর্ট বেরিয়ে যাবে। গান্ধীজি তাঁর বক্তৃতাটি রাতারাতি লিখে ফেললেন। তখনকার দিনে সার ফিরোজশার বক্তৃতা শোনার জন্যে ভীড় ক'রে লোক আসতো। এতো বড়ো বিরাট সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অভিজ্ঞতা গান্ধীজির এই প্রথম। তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে এলো, সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগলো। বক্তৃতাটি লিখিত থাকায় অন্য একজনে প'ড়ে শোনালেন। বক্তৃতাটি অজস্র করতালি ও প্রশংসা পেলো।

গান্ধীজিকে সার ফিরোজশা দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের ব্যাপারে প্রচুর সাহায্য করলেন। লোকমান্য তিলক এবং গোখলের সংগে-ও গান্ধীজির হোলো পরিচয়। এই পরিচয় সম্পর্কে গান্ধীজি একটি সুন্দর তুলনা-মূলক বর্ণনা দিয়েছেন: "সার ফিরোজশাকে আমার হিমালয়ের মতো মনে হয়েছিল, লোকমান্যকে সমুদ্রের মতো। আর গোখলেকে দেখলাম গংগার মতো। তাতে অবগাহন করা যায়। হিমালয়ে চড়া যায় না, সমুদ্রে ডুবে মরার ভয় আছে। কিন্তু গংগার কোলে খেলা করা যায়, ডিঙি নিয়ে পার হওয়া যায়।" গোখলে সম্পর্কে গান্ধীজি আরো বলেন: "রাজনীতি ক্ষেত্রে গোখলে জীবিতকালে আমার হৃদয়ে যে-স্থান অধিকার

করেছিলেন এবং দেহান্তরের পরে আজো যে-স্থান অধিকার ক'রে আছেন, তা আর কেউ পান নি।" পরে যথাসময়ে আমরা লক্ষ্য করবো, গোখলে এবং তিলক, ভারতীয় রাজনীতির এই তুই বিভিন্ন ধর্মী শক্তির সমন্বয়ে গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের ও নেতৃত্বের গঠন কেমন ভাবে সম্ভব হ'য়েছিল।

অতঃপর গান্ধীজি পুণা থেকে গেলেন মাদ্রাজ। সেখানে গান্ধীজির 'সবুজ বই' আরো দশহাজার ছাপা হোলো। গান্ধীজি এখানে 'মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক পরমেশ্বরণ পিল্লাই এবং 'হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্যমের সংগে দেখা করেন। এরা দু জনেই গান্ধীজিকে প্রচুর পরিমাণে সমর্থন ও উৎসাহ জানান।

মাদ্রাজ থেকে গান্ধীজি এলেন ফের কলকাতা। এখানে সুরেন্দ্রনাথের সংগে তাঁর পরিচয় হোলো। কলকাতায় ঐ সময় গান্ধীজি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের সংগে দেখা করতে আসেন। ঐ ঘটনা সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করেছেন: "যে ভদ্রলোক আমার সংগে দেখা করলেন, তিনি আমাকে কোনো ভবঘুরে ব'লেই ধ'রে নিলেন।" 'বংগবাসী' পত্রিকাতে গিয়ে-ও গান্ধীজির নাকালের একশেষ হোলো। "সম্পাদক মশায় অন্য লোকের সংগে আলাপ করছেন, তাঁর কাছে বহু লোক যাতায়াত করছে। তিনি আমার পানে ফিরে-ও তাকান না।"

বাংলা দেশের 'প্রগতিশীল' পত্রিকাগুলির এই ব্যবহারে গান্ধীজি কিন্তু হতাশ হ'লেন না। কলকাতায় জনসভার-ও আয়োজন হ'তে থাকলো। কিন্তু সে-সভা হওয়ার আগেই গান্ধীজির কাছে ডারবান থেকে ডাক এলো: "পার্লামেণ্ট জানুয়ারিতে বসবে। অবিলম্বে ফিরে আসুন।"

প্রথম যে স্টীমার বোম্বাই থেকে পাওয়া যাবে, তাতেই যাওয়ার

ব্যবস্থা করার জন্যে গান্ধীজি দাদা আবদুল্লার বোম্বাই-এজেন্টকে তার করলেন। দাদা আবদুল্লা নিজে 'কুরল্যাণ্ড' নামে একখানা স্টীমার কিনেছিলেন। সেই স্টীমারে তাঁরা সপরিবারে গান্ধীজিকে বিনা খরচে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। গান্ধীজি ডিসেম্বরের প্রথম ভাগে স্ত্রী, দুই পুত্র এবং তাঁর বিধবা ভগ্নীর একমাত্র পুত্রকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হ'লেন। সংগে আরেক খানি স্টীমার-ও ছিল। স্টীমারটির নাম 'নাদেরী'। ওই স্টীমারের-ও এজেন্ট ছিলেন দাদা আবদুল্লা। দুই স্টীমারে মিলে ভারতীয় যাত্রী ছিলেন প্রায় আট শ। তাঁদের অর্ধেকের বেশি যাচ্ছিলেন ট্রান্সভালে। ১৮ই কি ১৯শে ডিসেম্বর দুটি জাহাজই ডারবান বন্দরে এসে পৌছলো। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ পরীক্ষা ক'রে হুকুম না দিলে জাহাজ তীরে ভিড়ানো যায় না, আইনের বাধা আছে। তাই জাহাজ দুটিকে নোঙর ক'রে অপেক্ষা করতে হোলো। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ার সময় বোম্বাই-এ প্লেগের মড়ক চলছিল। সুতরাং জাহাজ দুটিকে কয়েক দিনের জন্যে ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে রাখা হবে, এমনি ভয়-ও করা হচ্ছিল। বস্তুত হোলো-ও তাই। কিন্তু পরে বোঝা গেলো, কেবল ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা হয় নি। আট শত ভারতীয় যাত্রীসহ গান্ধীজিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরতে না দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাদা বাসিন্দারা তুমুল আন্দোলন চালিয়েছে। তারা এখনো প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সভা-সমিতি করছে, দাদা আবদুল্লাকে ধমক দিচ্ছে। এমন কি, ভারতবর্ষে জাহাজ দুটি ফেরত পাঠাবার জন্যে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লোভ-ও দেখাচ্ছে। এ সমস্ত সংবাদই গান্ধীজির কাছে পৌছতে লাগলো। গোরারা এমন ভয়-ও দেখিয়েছে যে, জাহাজ যদি গান্ধী আর তাঁর দলবলকে নিয়ে ভারত-বর্ষে ফিরে না যায়, তবে জাহাজ তারা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু

গোরাদের এই অন্যায় দাবী স্টীমার কোম্পানী বা যাত্রীরা, কেউ মানতে রাজী হোলেন না। গোরাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন গান্ধীজি। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুটিঃ প্রথমত, তিনি ভারতবর্ষে গিয়ে নাতালবাসী গোরাদের ভয়ংকরভাবে নিন্দা করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি ভারতীয়দের দিয়ে নাতাল ছেয়ে ফেলতে চান। তাই দু জাহাজ বোঝাই ক'রে ভারতবাসী সংগে নিয়ে এসেছেন। গান্ধীজির এবং যাত্রীদের ওপর চরম পত্র এলো, তাঁদের হত্যার ভয় দেখানো হোলো, কিন্তু এই ধমকে-ও গান্ধীজি টললেন না। স্টীমারের অন্যান্য যাত্রীরা-ও অটল রইলেন। সকল কিছু ক্ষতির বিনিময়ে নিজেদের ন্যায়সংগত অধিকার বজায় রাখার জন্যে তাঁরা কৃতসংকল্প হোলেন। অবশেষে বত্রিশ দিন বাদে, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালের ১৩ই জানুয়ারি তারিখে দুইটি স্টীমারের উপর থেকেই সংক্রমণ-অবরোধ তুলে নেওয়া হোলো। যাত্রীরা বন্দরে নামবার হুকুম পেলেন।

নাতাল সরকারের মিঃ এসকম্ব জাহাজের কাপ্তেনকে ব'লে পাঠালেন, তিনি যেন গান্ধীজি ও তাঁর পরিবারকে রাত্রির অন্ধকারে নামিয়ে দেন। গান্ধীজির উপর গোরারা খুব চটে আছে, তাই তাঁর জীবন সম্পর্কেও বিপদ দেখা দিতে পারে। গান্ধীজিকে সংগে নেওয়ার জন্যে তিনি জল-পুলিশ পাঠাবেন বলে-ও জানালেন।

জাহাজের কাপ্তেন গান্ধীজিকে এই সংবাদ দিলেন। গান্ধীজি তা পালন করতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু এই সংবাদ পাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই এলেন স্টীমার এজেন্টের উকীল মিঃ লটন। তিনি কাপ্তেনকে জানালেন, স্টীমার এজেন্টের উকীল হিসাবে তিনি মিঃ গান্ধীকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে যেতে চান। কাপ্তেন রাজী হ'য়ে গেলেন। অতঃপর মিঃ লটন এলেন

গান্ধীজির কাছে। তিনি গান্ধীজিকে জানালেন, মিঃ এস্‌কম্ব যে তাঁকে একাকী রাত্রিতে জাহাজ থেকে যেতে বলেছেন, তার মধ্যে যে কোনো প্রকার দুরভিসন্ধি নেই, তা কে বলতে পারে। এই মিঃ এস্‌কম্বই তো এখানে গোরাদের এক সময় ক্ষেপিয়েছেন, তাঁর হঠাৎ এতো দরদ কেন? তা ছাড়া, তিনি আরো বললেন, "আপনি যে লুকিয়ে চোরের মতো শহরে প্রবেশ করবেন, তা ও অত্যন্ত অশোভন। তার চেয়ে আপনার যদি প্রাণের ভয় না থাকে, তবে চলুন, মিসেস গান্ধী এবং ছেলেমেয়েদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমরা দুজনে তাঁদের পেছু পেছু পায়ে হেঁটে-ই যাই। আমার মনে হয়, কেউ আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে-ও সাহস করবে না।"

মিঃ লটনের কথাগুলি গান্ধীজির খুবই মনঃপূত হোলো। তাঁর কথা মতোই তিনি জাহাজ থেকে নামলেন।

রুস্তমজী শেঠের বাড়িতে গিয়ে গান্ধী-পরিবারের ওঠার কথা ছিল। স্টীমারঘাট থেকে তা দু মাইল পথ হবে। গান্ধীজির দুই পুত্র সহ মিসেস গান্ধী গাড়িতে ক'রে আগে রওনা হ'য়ে গেলেন। গান্ধীজি জাহাজ থেকে নামলে কয়েকজন গোরা ছোকরা তাঁকে দেখতে পেয়ে 'গান্ধী' 'গান্ধী' ব'লে চেঁচাতে লাগলো। চীৎকার ক্রমেই বেড়ে চললো। সেই সংগে জমতে লাগলো ভীড়। গান্ধীজি ও মিঃ লটন এগিয়ে চললেন। তাঁদের পেছনে জনতার লেজুড়টা ক্রুদ্ধ বিড়ালের লেজের মতো ক্রমেই স্ফীত ও দীর্ঘ হ'য়ে উঠলো। মিঃ লটন বিব্রত হ'য়ে পড়লেন। মুহূর্ত মধ্যেই জনতার মধ্য থেকে বৃষ্টি হ'তে লাগলো ঢিল আর পচা ডিম। একজন গান্ধীজির মাথার পাগড়ী টেনে ফেলে দিলো। মিঃ লটন ক্ষিপ্ত জনতাকে রুখতে পারলেন না। দেখতে দেখতে গান্ধীজির উপর শুরু হোলো প্রহার। চড়, কিল, ঘুষি, লাথি। গান্ধীজির মাথা ঘুরে গেলো, তিনি প্রায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়লেন।

এই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন পুলিশের প্রধান কর্তা মিঃ আলেক-জাণ্ডারের স্ত্রী। তাঁর সংগে গান্ধীজির আগেই পরিচয় ছিল। তিনি ভীড় ঠেলে ভেতরে এসে নিজের ছাতার আড়ালে গান্ধীজিকে রক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে একজন ভারতীয় যুবক থানায় সংবাদ দিয়েছিল। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার গান্ধীজিকে বাঁচাবার জন্যে অবিলম্বে একদল পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গান্ধীজি পার্শী রস্তমজীর বাড়িতে কোনো রকমে এসে পেঁ াছলেন।

কিন্তু গোরারা নিরস্ত হোলো না। তারা রস্তমজীর বাড়ির সম্মুখে-ও আবার উন্মত্ত তাণ্ডব জুড়ে দিলো। চীৎকার করতে লাগলো—'গান্ধীকে আমাদের হাতে দাও।' 'গান্ধীকে আমাদের চাই।' ইত্যাদি।

ঐ সময় পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডার সেখানে পৌছে তাদের কাউকে ধমক দিলেন, কাউকে বা মিষ্টি কথায় বোঝালেন। কিন্তু জনতা ক্রমেই এমন ভয়ংকর হ'য়ে উঠলো যে, তিনিও অবশেষে বিপদ গণলেন, বাড়ির ভেতরে গান্ধীজির কাছে সংবাদ পাঠালেন, গান্ধীজি যদি তাঁর বন্ধুর বাড়ি এবং নিজের স্ত্রীপুত্রকে বাঁচাতে চান, তবে তিনি যেন অবিলম্বে গোপনে এখান থেকে পালান। এই অবস্থায় গোপনে কেমন ক'রে পালানো সম্ভব, সে-পরামর্শ-ও দিলেন মিঃ আলেকজাণ্ডার স্বয়ং।

গান্ধীজি ভারতীয় সেপাইএর পোশাক পরলেন। মাথায় ডাণ্ডা মারলে যাতে মাথা না ফাটে, সেজন্যে মাথায় একটা পিতলের রেকাবি বসিয়ে তার ওপর মাদ্রাজী বড়ো একটা ফেটা জড়ালেন। গান্ধীজির সংগে গোয়েন্দা বিভাগের দুজন লোক ছিল, তারা-ও ছদ্মবেশ পরলো। তারপর গান্ধীজি জনতার ভেতর দিয়েই বাড়ির বার হ'য়ে গেলেন। ফলে সেদিনকার জনতার

উন্মত্ত ভাবটা ছেঁদা বেলুনের মতো গেলো চুপসে। এমনি ভাবে সেদিন গান্ধীজি তাঁর বন্ধুর বাড়ি ও নিজের স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করলেন।

এই ঘটনাটি কিন্তু গান্ধীজির জীবনের অন্তর্গত ব'লে মনে হয় না। এ যেন চাণক্য বা মেকিয়াভেলীর জীবনের কোনো ঘটনা, যাঁদের নীতি ও রীতি 'শঠে শাঠ্যম'। এই প্রতারণা যতোই প্রয়োজনীয় হোক, এ যে প্রতারণা মাত্র, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, গান্ধীজির সত্যের নীতি তখনো তাঁর মধ্যে সুদৃঢ় পরিণতি লাভ করে নি, যে-পরিণতি একদিন তাঁকে ঘাতকের সম্মুখেও নির্ভয়ে বুক পেতে দিতে দুঃসাহসী করেছিল !

ঐ সময় মিঃ চেম্বারলেন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিক সচিব। গান্ধীজির নির্যাতনের কথা তাঁর কানে গিয়ে পৌছল। তাঁর নির্দেশে মিঃ এস্কম্ব গান্ধীজিকে জানালেন, তিনি যদি আক্রমণকারীদের মধ্যে কাউকে চিনে থাকেন, তবে যেন নালিশ করেন।

গান্ধীজি কিন্তু মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "যারা আক্রমণ করেছিল, তাদের চেয়ে দোষ আপনাদেরই বেশী। কেন না আপনারা তাদের ঠিক পথে চালিত করতে পারেন নি। আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের তীব্র নিন্দা করেছি ব'লে রয়টার যে খবর দিয়েছিল, আপনারা তাই বিশ্বাস করেছেন এবং সেই বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সত্য সংবাদ প্রকাশিত হ'লে আক্রমণকারীদের অনুশোচনা হবে। আমি তাদের দু একজনকে চিনি। কিন্তু চিনলে-ও অভিযুক্ত করতে চাই না।"

এই ঘটনা থেকে গান্ধীজির যে-অভিজ্ঞতা হয়, তা তাঁর দুইটি মতামতকে অনেক পরিমাণে পুষ্ট করে।

এই পুলিশ সুপারিণ্টণ্ডেট এবং তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত সদাশয়তা ব্যক্তির প্রতি গান্ধীজির বিশ্বাসটিকে আরো বাড়িয়ে দেয়! ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস

গান্ধীজির আদর্শের অন্যতম প্রধান দিক—তাঁর অন্যতম প্রধান দৌর্বল্য-ও। কয়েক জন মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে পুষ্ট করার জন্যে যে-সমাজ ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রচার করে, ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস-ও সেই সমাজই শিক্ষা দেয়। সেই সমাজে ব্যক্তির প্রতি এই বিশ্বাস পরিণতি লাভ করে ব্যক্তিগত মোক্ষের মধ্যে, অর্থনীতিতে একছত্র পুঁজিবাদে, এবং রাজনীতিতে ফাশিস্ট স্বৈর তন্ত্রে। রায় চাঁদজী, রুস্তমজী বা আবদুল্লা শেঠের মতো ব্যবসায়ী এবং মিঃ আলেকজাণ্ডারের মতো সরকারী কর্মচারী, এঁরা যে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে গান্ধীজির মনের মধ্যে একটি বিশেষ করুণা ও স্নেহের স্থান গ'ড়ে তুলেছিলেন, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া, গান্ধীজি ছিলেন সেই সমাজেরই ফসল, যে-সমাজে শাসন ও শোষণের জন্যে স্বার্থলোভীরা শিক্ষায়-দীক্ষায়, সাহিত্যে-ইতিহাসে, শিল্পে-বিজ্ঞাপনে নিজেদের সুবিধামতো ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী ক'রে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। নাতালে গোরাদের বিক্ষোভের জন্যে গান্ধীজি সংবাদপত্রগুলিকে-ও যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী করেন। তাদের মিথ্যাপ্রচারের ফলেই এরূপ ঘটেছিল, গান্ধীজির বিশ্বাস। তিনি জীবনে বহুবার সংবাদসেবীদের কর্তব্যপরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ হতে উপদেশ দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বাহ্নে-ও তিনি সাম্প্রদায়িক দাংগার অনেকখানি দায়িত্বই সংবাদসেবীদের ওপরে আরোপ করতে কুণ্ঠিত হন নি। সংবাদ-পত্রের মিথ্যা-প্রচার সম্পর্কে গান্ধীজির জীবনে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এ-বিষয়ে টলস্টয়ের উপদেশ-ও যে তাঁর মধ্যে কোনো কাজ করে নি, এ-কথা বলা চলে না। টলস্টয়ের কাছে-ও সংবাদপত্র পাঠ ছিল মিথ্যার নিয়মিত অনুশীলনের মতো জঘন্য। সংবাদের নামে একরাশ মিথ্যাকে প্রতিদিন গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে টলস্টয় মানব-কল্যাণের অনুকূল ভাবতেন না।

যাই হোক, নাতালের গোরারা যখন জানলো, গান্ধীজি বৃটিশ ও নাতাল

সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ করেন নি, 'কুরল্যাণ্ড' এবং 'নাদেরি' জাহাজের আট শত ভারতীয়ের অধিকাংশই দক্ষিণ অফ্রিকার পুরাতন বাসিন্দা এবং ভারতে গান্ধীজি কর্তৃক গোরাদের নিন্দা প্রচারের পরিমাণটা-ও যথেষ্ট গুরুতর নয়, গান্ধীজির মতে তখন তাদের মধ্যে অনুশোচনা দেখা গেলো। সংবাদপত্রগুলি-ও গান্ধীজির পক্ষ সমর্থন করলো। এমনিভাবে নাকি ভারতীয়দের সংগ্রামের পক্ষে খানিকটা সুবিধা হোলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় অহিংসার জয় হোক, আর নাই হোক, নাতাল সরকার যে ভারতীয়দের সম্পর্কে আরো কঠিন ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে লাগলেন, তা একান্ত সত্য। একে একে দুইটি আইন পাশ হোলো। একটির ফলে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হোলো, অপরটির ফলে সেখানে ভারতীয়দের যাওয়ার বিরুদ্ধে বিধি নিষেধের হোলো ব্যবস্থা। ভাগ্যক্রমে ভারতীয়দের ভোটের অধিকারটা কোনো রকমে টিকে গেলো। এই সমস্ত আইনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মধ্যে আন্দোলন-ও হোলো প্রচুর। আইনগুলি সম্পর্কে বিতর্ক বিলাত পর্যন্ত গড়ালো। এই ভাবে নাতাল ভারতীয় কংগ্রেস ক্রমেই অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো।

গান্ধীজির রাজনৈতিক কাজের সংগে তাঁর আত্মিক অনুশীলন-ও চললো। তাঁর চির আদরের বস্তু ছিল সেবাব্রত। তিনি সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে লাগলেন, * সাধারণ হাসপাতালে সেবার

---

* খৃস্টের সংগে তুলনা করুন :

"And there came a leper to him beseeching him and kneeling down to him and saying unto him, If thou wilt thou canst mske me clean And Jesus moved with compassion, put forth his hand, and touched him and say unto him, I will, be thou clean." (Mark. I. 40. 41 & Matt. XVIII. 2. 3.)

কাজ নিলেন। এমন কি তিনি নিজের স্ত্রীর সূতিকাচর্যাও করলেন। এই সংগে ব্রহ্মচর্য পালনের কথা-ও তাঁর মনে হোলো। তাঁর মতে, "কেবল যখন সন্তান লাভের ইচ্ছা হবে, তখনই পুরুষ স্ত্রী সংসর্গ করবে। রতি-সুখ এক স্বতন্ত্র পদার্থ, এ-কথা মনে করা ঘোর অজ্ঞতা।" এই কারণেই গান্ধীজি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ঘোরতর বিরোধী হয়ে উঠলেন, যদি-ও সে-বিরোধিতা তাঁর পূর্বেই ছিল। কিন্তু ব্রহ্মচর্য বলতে গান্ধীজি কেবল দৈহিক মিলনের বিরতিকেই বোঝেন নি। তাঁর মতে কুচিন্তা-ও ব্রহ্মচর্যের অন্তরায়। * ব্রহ্মচর্যের উপায় রূপে গান্ধীজি নির্দেশ করেন আস্বাদগ্রাহী রসনার সংযম। তাই গান্ধীজি আহারের মধ্যে-ও পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্মচারীর খাদ্য যে ফলমূল তা আমি নিজে ছ বৎসর পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। আমি যখন টাটকা ফলাদির উপর নির্ভর করতাম, তখন যে-প্রকার বিকার-শূন্যতা লাভ করেছিলাম, খাদ্য পরিবর্তনের পর আর অনুভব করতে পারি নি।"

গান্ধীজি তাঁর নিজের জীবন থেকে সর্বপ্রকার ভোগবিলাসকে বিসর্জন দিতে স্থির সংকল্প করলেন। গৃহের পরিপাট্য গেলো, পোশাক-পরিচ্ছদে এলো সারল্য, আদালতের পোশাক পর্যন্ত তিনি নিজ হাতে ইস্ত্রী ক'রে নিতে লাগলেন। নিজের চুল নিজেই ছাঁটলেন। সাবলম্বন এবং সাধারণভাবে জীবনযাপনের নেশা গান্ধীজিকে পেয়ে বসলো। ইংল্যাণ্ডে কৃচ্ছ সাধনের

* "We have to conquer our passions. It is called *Brahmacharya* in Sanskrit. ......It is a breach of *Brahmacharya* to hear questionable language or obsence songs. It is licentious of the tongue to utter foul abuse instead of reciting the name of God, and so with the other senses."—৬ই অক্টোবর,, ১৯৩১

মধ্যেই যে গান্ধীজির এই সরল জীবনযাপন ও স্বাবলম্বনের মূলটি নিহিত ছিল, তা বলা চলে।

তবে এই স্বাবলম্বনের প্রেরণা সম্ভবত তিনি হজরৎ মহম্মদের জীবনেই পেয়েছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কারলাইলের লেখা "Heroes and Hero-worship" গ্রন্থখানি পড়েন। কারলাইল বর্ণিত মহম্মদের চরিত্র গান্ধীজিকে মুগ্ধ করে: "His household was of the frugalest; his common diet was barley bread and water: sometimes for months there was not a fire once lighted on his hearth. They record with just pride that he would mend his own shoes, patch his own cloak. A poor hard-toiling ill-provided man; careless what vulgar men toil for."

গান্ধীজির মৃত্যুর সময়ে অনেকে তাঁর সংগে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিসের তুলনা করেছেন। গান্ধীজির মতোই সক্রেতিস-ও নিজের জীবনাদর্শের জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কিন্তু এই তুলনার এখানেই শেষ নয়। প্রথম জীবনে সক্রেতিস-ও ছিলেন গান্ধীজির মতোই রাজনীতিক যোদ্ধা। তিনি আথেন্সের পক্ষে মাসিডনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। গান্ধীজির মতোই সক্রেতিস ছিলেন স্বল্প বাস পরিধানের পক্ষপাতী; বরফে ঢাকা পথ দিয়ে-ও তিনি খালি পায়ে হাঁটতেন। গান্ধীজির মতোই আহারে তাঁর বিন্দুমাত্র-ও বিলাস ছিল না, আহার ছিল সামান্য এবং সরল। রসনার অনুভূতিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। সক্রেতিস-ও গান্ধীজির মতোই কোনো কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লেই তাঁর 'অন্তরতর বাণীর' পরামর্শ নিতেন। গান্ধীজির উপর সক্রেতিসের প্রভাব সুপ্রচুর। তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করবো।

এমনিভাবে এক সংগে গান্ধীজি তাঁর ধর্ম, সেবা এবং রাজনীতির অনুশীলন করতে লাগলেন।

এই সময় এলো বুয়ার যুদ্ধ।

বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজি যে অংশ গ্রহণ করেন, তা বহু বিরুদ্ধ মতের সৃষ্টি করেছে। তাই বুয়ার যুদ্ধ এবং বুয়ার যুদ্ধে গান্ধীজির ভূমিকাকে যথাযথ দৃষ্টিতে দেখতে হ'লে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত উপনিবেশগুলির স্থাপনের ইতিহাস জানা প্রয়োজন। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করবো।

ছয়

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির ভূমিকা বা সেখানে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের বৃহত্তর সংগ্রামের জন্যে যুদ্ধের রীতি ও নীতি সম্পর্কে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, এগুলি কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। কারণ, গান্ধীজি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় যান, তার তিন শ বছর আগে থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে ভারতের ইতিহাস অংগাংগীভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল। আর দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে ভারতের এই সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল ইউরোপীয় বণিকরা। বাণিজ্যের নামে তারা এশিয়া মহাদেশে, প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে যে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন শুরু করেছিল, তার ফল একই সংগে ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃহত্তর এক ইতিহাস রচনা করেছিল, সে ইতিহাসের প্রকাশ-ভংগী দুই খণ্ড মহাদেশে যতোই ভিন্নতরো হোক না কেন। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ স্থাপনের ধারাটি আমাদের লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। তাতে আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারাটি যেমন স্পষ্টতর হ'য়ে উঠবে, তেমনি দক্ষিণ আফ্রিকার সংগে ভারতবর্ষের সম্পর্ক বা দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির ভূমিকাটিও হবে সহজবোধ্য।

তখন ইউরোপে উদীয়মান বণিক পুঁজির যুগ, তখন এশিয়ার সংগে, বিশেষত ভারতবর্ষের সংগে ইউরোপে একটি বাণিজ্য সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা চলছে। কিন্তু দুর্গম দুস্তর স্থলপথ ছাড়া ভারতের সংগে তখনো বাণিজ্যের কোনোরূপ যোগাযোগ ছিল না। অথচ সমুদ্রপথে ভিন্ন পণ্যসম্ভার বহনের অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা-ও ছিল না। তাই ভারতে

আগমনের জন্যে জলপথ আবিষ্কারের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। ১৪৩৪ খৃস্টাব্দে পর্তুগালের 'প্রিন্স হেনরি দি নেভিগেটর' এই সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্যে একটি নৌবহর পাঠান। নৌবহর কেপ বোগাডর পর্যন্ত আসে। প্রিন্স হেনরির মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র পোতুর্গালের রাজা দ্বিতীয় জন ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে আবার একটি আবিষ্কারক নৌবহর পাঠান। তার পরে-ও কয়েক বার এই সমুদ্রপথের সন্ধানে সদলবলে আবিষ্কারক পাঠানো হয়। কিন্তু অবশেষে ১৪৯৭ খৃস্টাব্দে ভাসকো ডা-গামা তাঁর 'সান রাফায়েল' জাহাজ নিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করেন ও সমুদ্রপথে ভারতের সংগে যোগাযোগের সন্ধান দেন। ভাস্কো ডা গামা দক্ষিণ আফ্রিকার যে অঞ্চলের মাটী প্রথম ছুঁয়েছিলেন সেই অঞ্চলের তিনি নাম দেন 'টেরা নাতালিস'—যার বর্তমান নাম নাতাল। কারণ, ঐদিন ছিল যিশুর জন্মদিন।

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিল প্রধানত বান্টু কাফ্রীদের* বাস। তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে এসে এখানের পূর্ববর্তী অধিবাসীদের বিতাড়িত ক'রে এখানে বসবাস করছিল। তাছাড়া বেচুয়ানা বাসুতো প্রভৃতি জাতি-উপজাতিগুলিও ছিল। বান্টু কাফ্রীদের মধ্যে জুলুরাই ছিল দেখতে-শুনতে সব চেয়ে সুশ্রী এবং শক্তিশালী। এদের শক্তির পরিচয় আমরা পরে পাবো।

ভাস্কো ডা গামার পরে ইউরোপের অন্যান্য জাতিগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ক'রে জাহাজের অজস্র ডানা মেলে ভারতের দিকে রওনা হোলো। প্রথমে এসেছিল পর্তুগাল ও স্পেন। তাদের

* কাফ্রী কথাটি আরবিক কাফ্র্ বা অবিশ্বাসী কথার অপভ্রংশ। অষ্টম শতাব্দীতে বান্টুদের সংগে মুসলমানদের কাজ-কারবার ছিল। ফলে মুসলমানরা এদের নাম দিয়েছিল কাফের বা কাফ্রী।

পশ্চাতে এলো হল্যাণ্ড, এলো ইংল্যাণ্ড। ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিগুলির সংগে কাড়াকাড়ির যুদ্ধে হল্যাণ্ড আর ইংল্যাণ্ড একযোগে লড়তে লাগলো। বহু যুদ্ধ খণ্ড যুদ্ধ ঘটলো আদেনে, সিংহলে আর মশলার দেশ মালয় দ্বীপ-পুঞ্জে। এই বণিক পুঁজির যুগে পোর্তুগালই কিন্তু পূর্বদেশে পুরোপুরি এক শতাব্দীকাল আধিপত্য বজায় রাখলো। ১৫৩০ খৃস্টাব্দে পোর্তুগীজরা তাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করলো ভারতবর্ষে—গোয়ায়।

এ পর্যন্ত ইউরোপের বাণিজ্য ব্যক্তিগত ভাবেই চলছিল। কিন্তু ১৬০০ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ কয়েকটি ব্যক্তিগত কারবারকে একত্রিত ক'রে একটি বণিক প্রতিষ্ঠান খাড়া করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম হোলো বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানিকে ইংল্যাণ্ডের তরফ থেকে প্রাচ্যে ব্যবসায়ের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হোলো। ইংল্যাণ্ডের দেখাদেখি হল্যাণ্ড-ও একটি অনুরূপ বণিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললো, ১৬০২ খৃস্টাব্দে, ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হোলো জাভাতে—বাটাভিয়ায়। ফরাসীরা-ও স্থির রইলো না। ১৬০৪ খৃস্টাব্দে চতুর্থ হেনরির রাজত্ব কালে তারা-ও একটা কোম্পানি গ'ড়ে তুললো। কিন্তু বিশেষ কোনো ফল হোলো না। ১৬১৫ খৃস্টাব্দে এই কোম্পানির পুনর্গঠন হোলো। কিন্তু তা-ও বড়ো একটা কাজে এলো না। অতঃপর ১৬৪২ খৃস্টাব্দে রিশ্‌ল্যু একটি কোম্পানি খাড়া করলেন—'লা কোঁপানি দেজিন্দ' বা ভারতীয় কোম্পানি। এই কোম্পানিটি-ও আবার ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে পুনর্গঠিত হয় এবং আরো চার বৎসর বাদে তারা মাদাগাস্কারে একটি নৌবহর পাঠায়, এবং ভারতবর্ষের সুরাটে প্রথম ফরাসী ফ্যাক্‌ট্রি প্রতিষ্ঠা করে।

এমনিভাবে সারা সপ্তদশ শতাব্দী ধ'রে ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসী এই তিন জাতি পূর্ব মহাদেশে ও পূর্ব মহাসাগরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করতে থাকে।

১৬২০ সালে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পাঁচটি জাহাজ এণ্ড্রিউ শিলিং এবং হাম্‌ফ্রি ফিজ্‌হার্বার্টের অধীনে টেবল উপসাগরে এসে পৌছলো। ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে যাওয়ার অর্ধপথে বিশ্রামস্থল রূপে দক্ষিণ আফ্রিকা অত্যন্ত উপযোগী, এ-কথা তাদের মনে হয়। তাই তারা সিগ্‌ন্যাল হিলে ইংল্যাণ্ডের পতাকা উত্তোলন করে। এই পতাকা-উত্তোলন উৎসবে ডাচ জাহাজের ক্যাপ্টেন ও বণিকরা-ও অংশ গ্রহণ করলো। এইভাবে সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার আকাশে ইংল্যাণ্ডের পতাকা প্রথম উঠলো, এবং বহু শতাব্দীব্যাপী একটি রক্তাক্ত ইতিহাসের করলো সূচনা।

কিন্তু ১৬৫১ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ভারতযাত্রার মধ্যপথে বিশ্রামস্থল রূপে নির্বাচন করলো সেণ্ট হেলেনা দ্বীপকে। পোর্তুগীজরা করলো মোজাম্বিক, আর ফরাসীরা মাদাগাস্কার। এ-পর্যন্ত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপটিকে বিশ্রামের জন্যে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই ব্যবহার করতো। তারা বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার যে অংশে ত্রিশ বছর আগে একদা বৃটিশ পতাকা উড়েছিল, সেখানেই তাদের নিজেদের আশ্রয়ী বন্দর গ'ড়ে তুললো।

প্রায় একশ বছর ধ'রে পূর্ব মহাসাগরগুলিতে ওলন্দাজদের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে বণিক পুঁজি শক্তিশালী হ'য়ে ওঠার সংগে সংগে ওলন্দাজদের তেজ ক্রমেই স্তিমিত হ'য়ে এলো, এবং ধীরে ধীরে তারা এশিয়ার মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ছাড়া আর সর্বত্রই হোলো বিতাড়িত। বহু আর্থিক ও সামরিক বিপর্যয়ের ফলে হল্যাণ্ড ক্রমেই ক্লান্ত

এবং হতবীর্য হ'য়ে পড়ছিল। অবশেষে এলো ফরাসী বিপ্লবী ফৌজের সংগে ওলন্দাজদের সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে-ও ওলন্দাজদের প্রতিপত্তি হোলো বিনষ্ট—১৭৯৪ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হোলো বাটাভিয়ান রিপাব্‌লিক।

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজরা সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে ১৬৪৮ খৃস্টাব্দে। টেবল উপসাগরে 'হারলেম' নামে একটি জাহাজ ডুবে যায়। ঐ জাহাজের নাবিক-নস্কর ও যাত্রী, যারা কোনক্রমে গিয়ে তীরে উঠেছিল, বাইরের জগতের সংগে তাদের সমস্ত সম্পর্ক লোপ পেলো। ফলে এই আশাহীন আশ্রয়হীন মানুষগুলি নূতন আশায় ভর ক'রে নূতন আশ্রয় রচনার কাজে লেগে গেলো। শুরু হোলো কৃষি। গ'ড়ে উঠলো গির্জা। এমনি ভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সেদিন ওলন্দাজদের বসবাস শুরু হলো—যাঁরা ভবিষ্যতে বুয়ার জাতি বলে পরিচিত হলেন। *

১৬৮৬ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই 'এডিক্ট অফ নাণ্টেস' আইনটিকে বাতিল ক'রে দেন। ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন আতংকগ্রস্ত হিউ-গেনো দলের ‡ বহু লোক ফ্রান্স ছেড়ে পালান। তাঁদের প্রায় সাত-আট শত জন ডাচ ইণ্ডিয়া কোম্পানির মারফৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে আসেন ও বস-বাস করেন। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফরাসীদের সংগে ওলন্দাজদের সংমিশ্রণ শুরু হয়। এখানে যে-শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচলিত হতে থাকে, ফরাসী কিম্বা ডাচ, কোন ভাষা তার মাধ্যম হবে, এ নিয়ে ফরাসী ও ওলন্দাজদের মধ্যে বিবাদ-বচসাও কিছু কিছু চলে। কিন্তু ফরাসীরা এখানে ছিল আশ্রয়প্রার্থী,

* বুয়ারদের মধ্যে ওলন্দাজ রক্তের প্রাধান্যই বেশি। অবশ্য এই রক্তের সংগে ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয়, এমন কি এশীয়, রক্তের-ও সংমিশ্রণ ঘটে।

‡ ইউরোপীয় বুর্জোয়া সমাজ যখন সবে মাত্র গ'ড়ে উঠছিল, তখন ধর্মে-ও তার

আর ওলন্দাজরা আশ্রয়দাতা। সুতরাং অবশেষে ডাচ ভাষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি, এ পর্যন্ত ব্যবসায়-বাণিজ্যে পূর্ব দেশে আধিপত্য স্থাপনে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ড একযোগে কাজ ক'রে এসেছে।* কিন্তু ১৭৮১ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধলো। আর হল্যাণ্ড বন্ধুরূপে গ্রহণ করলো ফ্রান্সকে। ফলে, অবিলম্বে সিংহলে ও বাটাভিয়ায় ইউরোপে যুদ্ধ বাধার সংবাদ পাঠানো হোলো। (কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তখনো টেলিগ্রাফ বা বেতারের আবিষ্কার হয় নি। সুতরাং সংবাদ অবিলম্বে পাঠানো হ'লেও তা পৌছতে সেকালে বেশ বিলম্বই হোতো।) এ-দিকে ইংল্যাণ্ড হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সংগে সংগেই তারা উত্তমাশা অন্তরীপ অধিকারে সিদ্ধান্ত করলো এবং ১৭৮১ খৃস্টাব্দে ১৩ই মার্চ তারিখে কমডোর জনস্টনের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি নৌবহর পাঠানো হোলো। ফরাসী গুপ্তচরেরা কিন্তু এই অভিযানের সংবাদ পেয়ে গেলো এবং তারা বৃটিশ নৌবহরকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলো। ফরাসীদের আশা ছিল, তারা যদি জয়লাভ করে, তবে উত্তমাশা অন্তরীপ তাদেরই অধিকারে আসবে। তখন ভারতবর্ষের পণ্ডিচেরিতে

প্রতিফলন ঘটেছিল। সেই প্রতিফলনের ফল রূপে বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের গোড়ার যুগে ফ্রান্সে যে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের প্রচার শুরু হয়, তার প্রতিনিধি ছিলেন হিউগেনোরা। সামন্ততান্ত্রিক শাসন একদিকে যেমন বুর্জোয়াদের দলন করতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে করতে থাকে হিউগেনোদের।

* চতুর্দশ শতাব্দীতে ইটালীতে পুঁজি উন্নত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু শীঘ্রই তার স্থান অধিকার করে হল্যাণ্ড। আবার বৃটেনে যখন পুঁজি গ'ড়ে উঠতে থাকে, তখন থেকেই ডাচ পুঁজির অবনতি শুরু হয় এবং তারা মহাজনী ও তেজারতিতেই বেশি জোর দেয়। ইংল্যাণ্ডে পুঁজি শক্তিশালী হবার সংগে সংগেই হল্যাণ্ডের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিন্ন হয় এবং তা প্রকাশ্য শত্রুতায় হ'য়ে ওঠে স্পষ্ট।

ছিল ফরাসী সৈন্যাবাস। সুতরাং পণ্ডিচেরি থেকে ফরাসী সেনা বাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলো।

কিন্তু বৃটিশ নৌবহর উত্তমাশা পর্যন্ত অগ্রসর হোলো না। সালডানা উপসাগরে তাদের সংগে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যবাহী জাহাজের ঘটলো সাক্ষাৎ। বৃটিশ নৌবহর সেই বহুমূল্য পণ্যসম্ভার লুণ্ঠন ক'রে দেশে ফিরে গেলো। ১৭৮৫ সালে ইংল্যাণ্ডের সংগে বেলজিয়ামের স্থাপিত হোলো সাময়িক শান্তি। ইংল্যাণ্ড পূর্ব মহাসাগরগুলিতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেলো এবং ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু সম্পত্তি-ও তাদের হাতে এলো।

কিন্তু যুদ্ধের ভংগীতে শীঘ্রই পরিবর্তন দেখা গেলো। শত্রু মিত্র হ'য়ে উঠলো, মিত্র হ'য়ে উঠলো শত্রু। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তাদের সামন্ত-তান্ত্রিক অবয়ব ছেড়ে যে ধণিকতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছে, তার চূড়ান্ত প্রমাণ মিললো ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে ফরাসী বিপ্লবের শুরুতে। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দল গ'ড়ে উঠলো হল্যাণ্ডে—'পাটি্ অটেন' বা 'প্যাটি্ অট' দল। 'প্যাটি্ অট' দল হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ রাজবংশের প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের শাসকরা ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন না থাকায় তারা অরেঞ্জ রাজবংশের সমর্থক হ'য়ে উঠলো। এদিকে ফরাসী বিপ্লবের আলোড়ন দক্ষিণ আফ্রিকাতে-এসে লাগলো। হল্যাণ্ডে এসে যাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবী মতবাদের জন্যে নির্বাসিত অনেকে-ও ছিলেন। তাছাড়া হল্যাণ্ডে 'পাটি্ অটেন' দল শক্তিশালী হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকারও ওলন্দাজরাও ফরাসী বিপ্লব এবং সেই বিপ্লবের সমর্থক ওলন্দাজ 'পাটি্ অটেন' দলের সমর্থন করতে লাগলো। শীঘ্রই খবর এলো, প্রিন্স অব অরেঞ্জ

হল্যাণ্ড ত্যাগ ক'রে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এবং সেই আশ্রয়-দানের উপসংহাররূপে বৃটিশ নৌবহর অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকা 'রক্ষা' করতে চাইছে। কিন্তু হল্যাণ্ডে 'পাটি অটেন' দলের হাতে ক্ষমতা থাকায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরে বাটাভিয়ান রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় স্থানীয় অধি-বাসীরা বৃটিশ 'রক্ষা-ব্যবস্থাকে' মেনে নিলো না এবং তারা সশস্ত্রভাবে বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রতিরোধ করতে লাগলো, প্রতি মুহূর্তেই আশা করতে লাগলো যে ফরাসী মুক্তিফৌজ তাদের সাহায্যে এসে পৌছবে। কিন্তু অবশেষে ১৭৯৫ খৃস্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারা পরাজয় স্বীকার করলো। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ পতাকা হোলো ভূলুণ্ঠিত। বৃটিশ পতাকা আবার মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ালো।

১৮০২ খৃস্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে বৃটেনের সংগে ফরাসী রিপাব্-লিকের হোলো সন্ধি। সন্ধি-শর্ত অনুসারে উত্তমাশা অন্তরীপ বাটাভিয়ান রিপাব্লিকের হাতে গেলো। ইংল্যাণ্ড পেলো সিংহল ও ত্রিনিদাদ।

কিন্তু ১৮০৩ খৃস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে নূতন আকারে আবার যুদ্ধ বাধলো। সুতরাং ১৮০৫ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি সময়ে ইংল্যাণ্ডের এক ঝাঁক রণতরী দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে পৌছলো। নৌবহরের সেনাপতি ছিলেন সার ডেভিড বের্ড।* ১৮০৬ সালের ৮ই জানুয়ারি তারিখে তাদের সংগে ওলন্দাজ সেনাপতি য্যানসেনের অধীনে সৈন্য ও জনসাধারণের এক যুদ্ধ হয়। বৃটিশ সৈন্যেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে। এমনিভাবে সার ডেভিড

* সার ডেভিড বের্ড ভারতবর্ষে-ও বহুদিন ছিলেন। ভারতে ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য-লোভী বহু সংগ্রামেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। হায়দর আলির কারাগারে তিনি চার বৎসর অতিথিরূপে-ও ছিলেন। শ্রীরংগপত্তন আক্রমণের কালে তিনি নেতৃত্ব ক'রে যথেষ্ট 'কৃতিত্ব' অর্জন করেন।

বের্ড দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘস্থায়ীভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ডেভিড! অচিরেই বৃটেনের হুইগ গভর্ণমেন্ট তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হুকুম করলো। বহু অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে ডেভিড বের্ড ফিরলেন দেশে।†

কিন্তু ইংল্যাণ্ডের হাতে এই পরাজয়কে স্থানীয় ডাচ বাসিন্দা অর্থাৎ বুয়াররা স্বীকার ক'রে নিলো না। তাদের অসন্তোষ ও বিদ্বেষ বৎসরের পর বৎসর ধ'রে ক্রমাগত ধূমায়িত হ'তে লাগলো। স্থানীয় কাফ্রীদের সংগে এক-ত্রিত হ'য়ে ১৮১৫ খৃস্টাব্দে তারা ইংরেজদের 'সমুদ্রে তাড়িয়ে' দেবার জন্যে করলো বিদ্রোহ। ইংরেজরা কিন্তু এই বিদ্রোহকে নৃশংসভাবে দমন করলো। নাপলেয়ঁ-র সংগে যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রায় ভেঙে পড়েছিল। দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য হ'য়ে উঠেছিল অসহনীয়। সে-জন্যে ১৮২০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বহু ইংরেজ দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে এলো। ফলে ইংরেজেরাও বেশ দল-ভারি হ'য়ে উঠলো। এদিকে ইংরেজদের কাছে লাঞ্ছনা অত্যাচার সইতে না পেরে বুয়ারদের একটা প্রকাণ্ড অংশ উত্তর দিকে হোলো রওনা। এমনি ভাবে বুয়ার উপনিবেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়লো।

নাতালে তখন ছিল জুলুদের প্রবল প্রতাপ। তাদের রাজা ছিলেন চাকা। চাকা দুর্দান্ত ব্যক্তি। তিনি জুলু জাতিকে সামরিক শিক্ষায় গ'ড়ে তোলেন এবং অন্যান্য উপজাতিগুলি তাঁর ভয়ে দেশের পর দেশ ছেড়ে পালাতে থাকে। চাকা এক সময় অসুস্থ হ'লে ইংরেজ ডাক্তার হেনরি ফাইন তাঁর চিকিৎসা করেন। ফলে চাকা ইংরেজদের বন্ধুত্বের চোখে দেখেন। ডাক্তার হেনরি ফাইনের সংগে বন্ধুত্বের ফলে চাকা এফ, সি, ফেয়ারওয়েল অ্যাণ্ড

† পাঠক, 'হতভাগ্য' লর্ড ক্লাইভের কথা স্মরণ করুন।

কোম্পানিকে একখণ্ড বিস্তৃত ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে বর্তমান ডারবান * বন্দরটি-ও ছিল। ১৮২৪ খৃস্টাব্দের ২৭শে আগস্ট তারিখে ঐ মাটির ওপর বৃটিশ পতাকা তোলা হয় এবং কামানের তোপে এই অঞ্চলকে বৃটিশ সম্পত্তি ব'লে ঘোষণা করা হয়। ডাক্তার হেনরি ফাইন আরো অনেক ভূসম্পত্তি পান। অতঃপর ১৮২৯ খৃস্টাব্দে ফেয়ারওএল সাহেব খুন হ'লে তাঁর সম্পত্তি তাঁর বাকী দুজন অংশীদারের হাতে আসে। তাঁরা জুলু রাজার অধীনে জমিদার হিসাবে বাস করতে থাকেন। এই সময়ে নাতালে ইংরেজ ব্যবসায়ীরা-ও আসতে আরম্ভ করেন।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ডারবান* শহরের পত্তন হয়। তখন সেখানে ইংরেজ অধিবাসীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫।

প্রায় ঐ সময়েই বুয়াররা বর্তমান ট্রান্সভাল এবং অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের অর্ধেকখানি অধিকার ক'রে নেয়। নাতালে-ও তাদের সংগে জুলুদের বাধে বিবাদ। তখন চাকাকে হত্যা ক'রে তাঁর ভাই ডিংগান জুলুদের রাজা হ'য়েছে। শাদা চামড়া সম্পর্কে ডিংগানের ধারণা মোটেই উচ্চ নয়, এ কথা শীঘ্রই বোঝা গেলো। ফলে বুয়ারদের সংগে ইংরেজরা-ও যোগ দিলো। বুয়ারদের সংগে জুলুদের যে যুদ্ধ হোলো, সেই যুদ্ধে পরবর্তী বুয়ার যুদ্ধের নেতা তরুণ পল ক্রুগার-ও ছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে ডিংগান পলায়ন করলো। ডিংগানের ভাই পাণ্ডা বুয়ারদের সংগে সন্ধি করলো—এই শর্তে যে বুয়াররা তাকে রাজা হবার জন্যে সাহায্য করবে। ডিংগান নিহত হ'লো। জুলুরা-ও বুয়ারদের তাঁবে এলো। †

অনতিবিলম্বেই বুয়ার নেতা আন্‌ড্রিস প্রিটোরিয়াস এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে

* সার বেঞ্জামিন ডারবানের নাম অনুসারে।

† ভারতবর্ষে ইউরোপীয় কূটনীতির ইতিহাস-ও এই প্রসংগে স্মরণীয়।

একটি রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা হোলো ব'লে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইংরেজরা এই রিপাব্লিককে সহজে স্বীকার ক'রে নিতে পারলো না। ফলে আন্ড্রিস প্রিটোরিয়াসের অধীনে বুয়াররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো এবং তাদের পরাজিত ক'রে দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাব্লিকের করলো প্রতিষ্ঠা। এই রিপাব্লিকটি বর্তমান ট্রান্সভাল। রিপাব্লিকটি ভাল্ নদীর উত্তর পারে অবস্থিত থাকায় নাম হোলো ট্রান্সভাল। ভাল নদীর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলের বুয়াররা কিন্তু ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলেও তারা ক্রমাগতই স্বায়ত্তশাসনের দাবী করতে লাগলো। অবশেষে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে সে অধিকার স্বীকৃত হোলো। এই অঞ্চলের নাম হোলো 'অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট'।

১৮৫৫ খৃস্টাব্দে আন্ড্রিস্ প্রিটোরিয়াসের পুত্র মার্টিনাস প্রিটোরিয়াস্ পল ক্রুগারের সংগে একযোগে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট এবং ট্রান্সভাল নিয়ে একটি যুক্ত-রাষ্ট্র গ'ড়ে তুলতে চাইলেন এবং ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তিনি ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট থাকা কালেই অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের-ও প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন। এই ভাবে, আইনত না হলে-ও, বস্তুত, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট মিলিত হোলো।

দক্ষিণ আফ্রিকার আর্থিক অবস্থা এই সময় অত্যন্ত মন্দ ছিল। কিন্তু ঐ সময় অকস্মাৎ একটি শিশু অরেঞ্জ নদীতে এক টুকরা হীরক কুড়িয়ে পায়। অরেঞ্জ নদীর এই অংশ ছিল কেপ কলোনির উত্তর অঞ্চলে। সুতরাং ভালের তীর ধ'রে সকল জাতির ও দেশের খনি-খোদাইকররা এসে ভীড় করতে লাগলো। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে কেপ কলোনিতে-ও স্বায়ত্বশাসনশীল একটি সরকার গঠিত হোলো।

কিন্তু ট্রান্সভালের গোরাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হ'য়ে পড়ছিল। ফলে জুলুদের প্রতাপ-ও বাড়ছিল ক্রমেই। তাই এমন কি পল ক্রুগার পর্যন্ত বৃটিশ উপনিবেশের সংগে ট্রান্সভালকে যুক্ত ক'রে দিয়ে বৃটিশ সরকারের

অধীনে একটি চাকরি নিয়ে থাকতে চাইলেন। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে ট্রান্সভাল বৃটিশ উপনিবেশের সংগে সংযুক্ত হোলো।

কিন্তু ব্যবস্থাটা নিতান্ত দায়ে প'ড়েই বুয়াররা গ্রহণ করেছিল। তাই ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে বুয়ারদের সংগে ইংরেজদের বাধলো যুদ্ধ। যুদ্ধের নেতৃত্ব করলেন পল ক্রুগার এবং মার্টিনাস প্রিটোরিয়াস। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা বুয়ারদের সংগে করলো সন্ধি। ট্রান্সভাল পেলো স্বায়ত্তশাসন। তবে বৃটিশের সার্বভৌমতা গেলো না। পল ক্রুগার ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হ'লেন। মনে রাখতে হবে, এই পল ক্রুগারই গত বুয়ার যুদ্ধের সময় অধিনায়কত্ব করেন। এঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন জার্মাণ। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী প্রচার এঁকে হুন দস্যু ও হিটলারের সমগোত্র ক'রে চিত্রিত ক'রেছে।

১৮৮৬ খৃস্টাব্দে ট্রান্সভালে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ স্বর্ণখনি হোলো আবিষ্কৃত। ট্রান্সভালে স্বর্ণ-শকুনদের ভীড় জমে' উঠলো। গ'ড়ে উঠলো জোহানস্‌বার্গ শহর।

পরে ট্রান্সভালের এই স্বর্ণখনি নিয়েই স্থানীয় শ্বেত-অধিবাসী বুয়ার এবং বৃটিশের মধ্যে যে যুদ্ধ বাধে, তারই নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বুয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে গান্ধীজি সদলবলে অংশ গ্রহণ করেন।

যুদ্ধ শুরু হ'য়েছিল ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখে। ১৯০০ খৃস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ট্রান্সভাল বৃটিশ কলোনিভুক্ত হয়। এর পর-ও এখানে ওখানে খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০২ খৃস্টাব্দের ১লা জুন তারিখে শান্তি স্থাপিত হয়। এবং আরো আট বৎসর বাদে দক্ষিণ আফ্রিকার চারটি উপনিবেশ নিয়ে গঠিত হয় একটি যুক্তরাষ্ট্র—নাম হয় ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা।

বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা বলতে এই ইউনিয়নকেই বোঝায়।

সাত

এ-হেন বুয়ার এক যুদ্ধে গান্ধীজিকে অবতীর্ণ হ'তে হোলো।

বুয়ারদের প্রতি গান্ধীজির সহানুভূতি থাকলে-ও বৃটিশ প্রজা হিসাবে তিনি বৃটিশের প্রতি আনুগত্যকেই কর্তব্য ব'লে ভাবলেন। এই ভাবে তিনি 'ন্যায়ের' নামে অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন ক'রে বসলেন। এমনি ভাবেই গান্ধীজির বিবেকী ন্যায় (casuistry) অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে মাৎস্য ন্যায়ের সমর্থক ক'রে তুলেছে। বৃটিশের পক্ষ সমর্থন করার সময় তাঁর মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'য়েছিল, একথা গান্ধীজি বিস্তৃতভাবে স্বীকার বা বর্ণনা-ও করেছেন। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব তাঁকে যে-উপসংহারে উপনীত করেছিল, এমন কি গান্ধীজির কাছ থেকে-ও, তাকে নিঃসংশয় চিত্তে গ্রহণ করা স্বাধীনতাকামী-দের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। গান্ধীজি তখনো ভাবতেন, ভারতের পূর্ণ সমৃদ্ধি বৃটিশ-শাসনের অধীনেই হ'তে পারে। সুতরাং রাজনীতির দিক থেকে তিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। বহু জাতির বা দেশের একত্রে স্বেচ্ছায় থাকার অর্থ এক, এবং কোনো সাম্রাজ্যের অধীনে কতিপয় দেশের একত্রে থাকার অর্থ যে আর, তা গান্ধীজি পৃথিবীর অর্থনীতিক ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন না থাকায় বুঝতে পারেন নি। সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিকতা-বাদ তাঁর কাছে এক হ'য়ে গিয়েছিল। ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকলে বন্ধুত্বের রাখী এবং ছদ্মবন্ধুত্বের শৃংখলের মধ্যে পার্থক্যটি তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেবা ও সাহায্য দিয়ে কখনো পুষ্ট করতে চাইতেন না। কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সেবার নামে —মানবিকতার নামে সাহায্য করার সহজ অর্থ এই ছিল যে, মানবিকতার

নামে মানুষকে হত্যা ক'রে তার রক্ত মাংস দিয়ে হিংস্র ব্যাঘ্রকে পোষণ করা!

তবে গান্ধীজিকে সহজে প্রতারিত করার মতো অন্য একটি কারণ-ও ছিল। বুয়ার যুদ্ধের অন্যতম কারণ রূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করেছিল, ভারতীয়দের প্রতি ট্রান্সভালার বুয়ারদের অমানুষিক অত্যাচার। গান্ধীজি সরল উদার মনে তা বিশ্বাস করেছিলেন। চিরদিনই তাঁর নীতি ছিল, অবিশ্বাস ক'রে ঠকার চেয়ে বিশ্বাস ক'রে ঠকাই ভালো। কিন্তু মানবিকতার নামে, সভ্যতার নামে, আলোকিত করার নামে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চিরদিনই তার লুণ্ঠন শুরু করেছে। যেখানে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূল হয়েছে, সেখানেই সে দলে দলে মিশনারী পাঠিয়েছে। এ নীতি তার নূতন নয়। তাই দেখি, খৃস্টান মিশনারীর ভগীরথ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্লাবনকে দেশে-দেশে ডেকে নিয়ে এসেছে। অথচ এই ঐতিহাসিক সত্য-ও গান্ধীজিকে সতর্ক করলো না।

যাই হোক, গান্ধীজি বুয়ার যুদ্ধের সময় যে সেবাদল গঠন করেছিলেন, তাতে প্রায় এগারো শ' লোক ছিল। এই এগারো শ-র মধ্যে স্বাধীন ভারতীয় ছিল প্রায় তিন শ, বাকী সব গিরমিটিয়া। বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে সাহায্য করায় ভারতের কি উপকার হয়েছিল, সে সম্বন্ধে গান্ধীজি তাঁর স্বাভাবিক আশাবাদিতার সংগেই বলেন ঃ

"আমাদের ক্ষুদ্র কার্য তখন খুবই প্রশংসা লাভ করেছিল এবং ভারতীয়-দের প্রতিষ্ঠা-ও যথেষ্ট বেড়েছিল। 'ভারতীয়রা-ও একই সাম্রাজ্যের সন্তান' এই ব'লে গান পর্যন্ত রচিত হ'য়েছিল।"

আজকের দিনে যে-সব স্বার্থলোভী সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশকে রুশিয়ার সংগে থাকার ফলে রুশ সাম্রাজ্যবাদ ব'লে প্রচার

করতে কুণ্ঠিত হয় না, তারাই সেদিন ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকায় শতমুখে তার প্রশস্তি গেয়েছিল। কেন যে গেয়েছিল তার কারণটা কিন্তু গান্ধীজি বিচার ক'রে দেখেন নি। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্র বা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতি, এদের একত্রে থাকার সংগে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের একত্রে থাকার একটা ঘোরতর পার্থক্য আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে এক-পরিবারভুক্ত বলা চলে। তারা একান্নবর্তী। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্য—যেখানে সবার অন্নে একের পুষ্টি হয়, তাকে একান্নবর্তী বলা চলে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার সুবিধা মতো বিশেষ সময়ে কখনো বা একান্নবর্তিতার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গেয়েছে. আবার কখনো বা স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের নামে সম্মিলিত রাষ্ট্রের মধ্যে আত্মঘাতী সংগ্রাম বাধিয়ে দিতে-ও চেষ্টা করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখনই ভারতবর্ষ, আয়ার্ল্যাণ্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়াকে করতলগত রাখতে চেয়েছে, তখনই তারা কমনওয়েল্থের বা একান্নবর্তিতার গুণকীর্তনে হ'য়ে উঠেছে পঞ্চমুখ। কিন্তু আবার যখন এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দেখেছে, কোনো দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন থেকে আত্মরক্ষা করতে চলেছে, তখনই সেখানে সে 'self-determination' বা স্বাধিকারের নামে গৃহবিরোধ ও বিভেদের জন্যে উশ্‌কানি দিতে ছাড়েনি। তাই ফরাসী গৃহ-যুদ্ধের সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের মধ্যে এবং আমেরিকার গৃহযুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ বাধাবার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একদা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। কেবল তাই নয়, তাদের সুবিধাবাদী চেষ্টার ফলেই ভারত আজ দ্বিধা বিভক্ত হ'য়েছে—হিন্দু ও মুসলমান তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের বিষফল নিয়ে করছে মাতামাতি। তাই বলা চলে, গান্ধীজি যদি সাম্রাজ্যবাদীদের সুচতুর ছলা কলা সম্পর্কে আরো সচেতন

হ'তেন, তবে সে-দিন 'ভারতীয়রা-ও একই সাম্রাজ্যের সন্তান', এই গানের মধ্যে আনন্দিত হবার মতো কিছুই পেতেন না। দেখতে পেতেন, এই মৈত্রীর আসল-রূপ, এবং তার বিষকুম্ভ-পয়োমুখিতা। কেবল বুয়ার যুদ্ধের সময়ে কেন, আরো বহুবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের প্রীতিতে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু প্রতিবারই তার সে-প্রীতির ছদ্মবেশ পড়েছে খুলে', প্রকট হ'য়ে উঠেছে তার দানবীয় বিকট মূর্তি। একটি কথা আছে: মানুষের অভিজ্ঞতা হয়, কিন্তু জ্ঞান হয় না। গান্ধীজির জীবনে-ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চাটুবাক্য, স্বার্থপরতা এবং অবমৃশ্যকারিতা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা জন্মেছিল, কিন্তু তবু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর কোনো কার্যকরী জ্ঞান জন্মে নি। তাই মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শুভেচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে গেছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া বিষপাত্রকে নিঃসংশয়ে করেছেন গ্রহণ।

তাই গান্ধীজি সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনুরক্ত প্রজা হিসাবেই বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশের পক্ষে যোগ দিলেন। সেজন্যে তাঁকে তাঁর প্রতিপক্ষদের সমালোচনার সম্মুখীন যে হতে হোল না, এমনো নয়।

যাই হোক, বুয়ার যুদ্ধ শেষ হবার পরে গান্ধীজি ভারতবর্ষে ফিরতে চাইলেন। "লড়াইএর কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমার মনে হোলো যে আমার কার্যক্ষেত্র এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় নয়,—ভারতবর্ষে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে কিছু কিছু সেবার কাজ যে করা যায় না, এমন নয়। কিন্তু, মনে হোলো, পয়সা রোজগারই যেন এখানে বড়ো কাজ।"

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সহকর্মীরা গান্ধীকে সহজে ছুটি দিতে চাইলেন না। শর্ত হোলো: যদি এক বৎসরের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সংগ্রামের জন্যে ডাক পড়ে, তবে তাঁকে ফিরে আসতে হবে। ভারতবর্ষে ফেরার পথে

গান্ধীজি মরিসাস দ্বীপে নামেন এবং সেখানে কিছুদিন থেকে মরিসাসবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে সন্ধান নেন। গান্ধীজি আগেই একথা বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষে গিয়ে যদি রাজনীতিতে যোগ দিতে হয়, বা জনসেবা করতে হয়, তবে ভারতবর্ষকে কেবল মানচিত্রের মারফৎ নয়,—চাক্ষুষভাবেও দেখা দরকার। গান্ধীজি তাই ভারতবর্ষে নেমেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের জন্যে বার হোলেন।

ঐ সময় ১৯০১ সাল। নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল কলিকাতায়। সভাপতি ছিলেন দীনশা এডুলজি ওয়াচা। গান্ধীজি স্থির করলেন, কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁর যাওয়া দরকার। কংগ্রেসে তাঁর এই প্রথম পদার্পণ।

বোম্বাই থেকে যে-গাড়ীতে সার ফিরোজশা মেটা রওনা হয়েছিলেন, গান্ধীজিও সেই গাড়ীতেই চ'ড়ে বসলেন। সার ফিরোজশার জীবনযাপনের পদ্ধতিটা ছিল নিতান্তই রাজসিক। একটি পৃথক সেলুনে তিনি যাচ্ছিলেন। পথে এক স্টেশনে নেমে গান্ধীজি সার ফিরোজশার কামরায় এসে উঠলেন, দেখলেন, সেখানে দীনশা ওয়াচা এবং চিমনলাল শীতলবাদ-ও উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে রাজনীতিক আলোচনা চলছে।

সার ফিরোজশা গান্ধীজিকে নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন। তবু গান্ধীজি যখন তাঁকে ভারতীয় কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি বড়ো একটা উৎসাহ দেখালেন না। বললেন, 'প্রস্তাব না হয় একটা পাশ ক'রে দিলাম। কিন্তু আমাদের দেশেই বা কোন্ ন্যায্য পাওনা আমাদের মেলে? আমার বিশ্বাস, আমাদের নিজেদের দেশে আমাদের অবস্থা যতোদিন না বদলাবে, ততোদিন উপনিবেশে আমাদের অবস্থা বদলাতে পারে না।'

গান্ধীজির উৎসাহ অনেকখানি ক'মে গেলো। কিন্তু তবু প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নেওয়া তিনি প্রয়োজন ভাবলেন।

কলিকতায় নেমে গান্ধীজি কংগ্রেস ডেলিগেটদের বাসস্থানে এসে উঠলেন। সেখানে লোকমান্যের সংগে-ও তাঁর ফের সাক্ষাৎ হোলো। গান্ধীজি কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকের সংগেই আলাপ ক'রে নিলেন। এবং অবিলম্বে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর সেবার কাজ শীঘ্রই সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিলো। তিনি মেথরের কাজগুলি পর্যন্ত নিয়মিত নির্বিকারভাবে করতে লাগলেন।

কংগ্রেস বসতে তখনো দু'দিন বাকী। গান্ধীজি কংগ্রেসের আরো কিছু কাজ করতে চাইলেন। তাঁকে একটি সাধারণ কেরাণীর কাজ দেওয়া হোলো। সেদিন কে জানতো যে, এই উৎসাহী, সৌম্য, শান্ত যুবকটিই একদিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হ'য়ে উঠবেন! সেদিন তিনি কংগ্রেসের অন্যতম সম্পাদক মিঃ ঘোষালের জামায় বোতাম পরিয়ে দিচ্ছেন, আর মিঃ ঘোষাল বড়াই ক'রে শোনাচ্ছেন, 'জামায় বোতাম লাগাবার মতো ফুরসৎ কি কংগ্রেস-সম্পাদকের আছে? তাঁর কতো কাজ!'

আজ এই দৃশ্যটি ভাবলে বড়ো হাসি পায়। সেদিন যদি মিঃ ঘোষাল কল্পনাও করতেন যে, এই মানুষটিই মাত্র পনেরো-বিশ বৎসর বাদে 'মহাত্মা গান্ধী' হ'য়ে উঠবেন, তাঁর লজ্জা-সংকোচের কী অবধি থাকতো! পূর্ব পুরুষদের বড়ো সৌভাগ্য যে, উত্তর পুরুষদের খবর তাঁরা রাখেন না। মৃত্যু তাঁদের বহু লজ্জা থেকেই নিষ্কৃতি দেয়।

অতঃপর যথাসময়ে কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হোলো।

নানা আলোচনা ও প্রস্তাব-পাঠে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হবার সংগে সংগেই কংগ্রেসে প্রস্তাবগুলির উত্থাপন এবং পাশ-ও ক্রমেই দ্রুততর

হ'তে লাগলো। স্পষ্টই বোঝা গেলো, সমাগত কংগ্রেস সভ্যদের প্রস্তাবের চেয়ে প্রস্থানের দিকেই লক্ষ্য বেশী। গান্ধীজি উস্‌খুশ করছিলেন, সাহস ক'রে কিছু বলতে পারছিলেন না। উপস্থিত সকলেই বয়োবৃদ্ধ, রথী, মহারথী। কিন্তু আর বিলম্ব করা-ও তো চলে না। চুপি চুপি গান্ধীজি গোখলের কাছে গিয়ে বললেন, 'কই, আমার একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যবস্থা হোলো। মঞ্জুর হোলো মাত্র পাঁচ মিনিট। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে গান্ধীজি প্রস্তাবটি কোনো রকমে পাঠ করলেন। কিন্তু প্রস্তাব শোনার দিকে কারো আগ্রহ দেখা গেলো না। প্রস্তাবটি গোখলে আগে পড়েছেন শুনে' সবাই ধ'রে নিয়েছিলেন, ঠিক আছে। ফলে প্রস্তাব পাশ হ'য়ে গেলো। কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ হওয়া সম্পর্কে আর কোনো মোহ গান্ধীজির রইলো না। তবু তিনি বুঝলেন, প্রস্তাবটি পাশ হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁদের আন্দোলনের প্রচুর উপকারই হ'বে। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের আন্দোলনের পেছনে যে ভারতের অখণ্ড জনমত রয়েছে, এ তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কংগ্রেস শেষ হবার পর গান্ধীজি কলিকাতায় আরো মাস খানেকের জন্যে র'য়ে গেলেন। চেম্বার অব কমার্স এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের লোকজনের সংগে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা ছিল। তখনকার দিনে ইণ্ডিয়া ক্লাবেই ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আস্তানা হোতো। তাঁদের সকলের সংগে আলাপের সুযোগ হবে এই আশায় গান্ধীজিও সেখানেই উঠলেন। গোখলে ওখানে না থাকলেও প্রায়ই ওখানে বিলিয়ার্ড খেলতে আসতেন। তিনি তরুণ গান্ধীকে ক্লাব থেকে নিজের বাসাতেই নিয়ে গেলেন। গান্ধীজি তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন, গোখলের গৃহে তাঁর সংগে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরই পরিচয় হয়েছিল। তবে

যে-ব্যক্তিটিকে বহু বৎসর বাদেও তাঁর সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

গোখলের বাসার কাছেই থাকতেন প্রফুল্লচন্দ্র। তাই তিনি গোখলের বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। প্রফুল্লচন্দ্রের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় গোখলে বলেছিলেন :

"ইনিই অধ্যাপক রায়। মাসে আট শ' টাকা মাইনে পান। নিজের জন্যে মাত্র চল্লিশ টাকা রাখেন। বাকীটা খয়রাতে যায়।"

কিন্তু গান্ধীজির সংগে প্রফুল্লচন্দ্রের এই পরিচয় গান্ধীজির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেটুকু বোঝা যায়, তাঁর জীবনব্যাপী যন্ত্র-বিরোধিতা থেকে। বাস্তবিক পক্ষে বলা চলে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তখনকার ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজির অনেকখানি বিরুদ্ধ শক্তি। গান্ধীজি তাঁর সহজ, সরল গ্রাম্যজীবনের মোহে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে এমন একটি জায়গায় টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, যাকে বলে পশ্চাদ্‌গতি। সেই অবস্থায় প'ড়ে থেকে ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা বহু শতাব্দী কাল ধ'রে স্থবির ও পংগু হ'য়েই ছিল। অন্য পক্ষে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের শ্রমশিল্পকে ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় কায়দায় গ'ড়ে তুলতে— শ্রমশিল্পের সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই তাকে বিশ্বের দরবারে এগিয়ে দিতে। তাই অর্থনীতির দিক থেকে গান্ধীজি ছিলেন অনেকখানি প্রতিক্রিয়াশীল, আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রগতিশীল। ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শের দিকেই ভারতবর্ষ আজ এগিয়ে চলেছে, তার কলকারখানা উঠেছে বেড়ে'। অন্যপক্ষে গান্ধীবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা আজ সখের আদর্শমাত্রে পরিণত হয়েছে। বিড়লা, ডালমিয়ার মতো তাঁর প্রিয় শিষ্যরাই তার প্রমাণ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অর্থনীতিক আদর্শ গান্ধীজিকে প্রভাবান্বিত না করলেও গোখলের দেশপ্রীতি যে প্রচুর পরিমাণে করেছিল, তা নিঃসন্দেহ। তখন ছিল গান্ধীজির রাজনৈতিক শিক্ষানবীশীর যুগ। আর গোখলেই ছিলেন তখনকার দিনের আদর্শ দেশ-নেতা। মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাও তাঁর প্রথম জীবনে গোখলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, 'মুসলিম গোখলে' হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উচ্চাশা। গান্ধীজি বলেন ঃ

"গোখলের কর্মপদ্ধতি দেখে আমার যেমন আনন্দ হোতো, তেমনি হোতো শিক্ষালাভ। একটি মুহূর্ত-ও তিনি নষ্ট হ'তে দিতেন না। দেখতাম, তাঁর সকল কাজই ছিল দেশের কাজ, তাঁর সকল কথাই ছিল দেশের কথা।"

ঐ সময় গান্ধীজি কলিকাতায় কালী-মন্দির দর্শন করেন এবং ছাগ-বলি দেখে আতংকে শিউরে ওঠেন। তাঁর মনে পড়ে বুদ্ধের বাণী, চৈতন্যের ধর্ম। চৈতন্যের বাংলায় হিংসার এই বীভৎস মূর্তি দেখে গান্ধীজি স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য বাংলা দেশে শাক্ত ধর্মের বর্তমান প্রতাপ দেখে তিনি কৌতূহলী-ও হ'য়ে উঠেন। ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কেও তাঁর কৌতূহল জন্মে। তরুণ গান্ধী ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দের সংগে সাক্ষাতের লোভে বেলুড় পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীজি তখন কলিকাতায় অসুস্থ। তাই গান্ধীজির সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। সাক্ষাৎ হ'লে সেদিন হয়তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতো—মন্ত্রস্নানের প্রচারক জনের সংগে যিশুর সাক্ষাতের মতো! তবে বিবেকানন্দের সংগে গান্ধীজির ধর্মের কয়েকটি অতি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিবেকানন্দের ধর্ম পৌরাণিক এবং 'ভারতীয়'। আর 'ভারতীয়' ব'লেই তা উগ্র জাতীয়তাবাদী। গান্ধীজির ধর্ম

'অভৌগলিক', তাই তায় জাতীয়তাবাদের অমন ঝাঁঝ নেই—তা 'বৈদিক খৃস্টান ধর্ম'—ব্রাহ্ম ধর্মের অনেকখানি অনুরূপ, তার জন্ম সাম্রাজ্যবাদে। বিবেকানন্দ শাক্ত বাংলার মানুষ, তাই তাঁর সেবা ও অহিংসা ছিল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব অহিংসা নিয়ে তা আদৌ ব্যস্ত হয় না। নব জাগ্রত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের বিদ্রোহী শক্তি গোখলে ও তিলকের মধ্যে যেমন অনেকখানি ভিন্নতরো রূপে প্রকাশলাভ করছিল, তেমনি তার ধর্মের রূপ-ও ভিন্নতরো ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিল বিবেকানন্দ ও গান্ধীর মধ্যে। এ পার্থক্যটা তাই জাতের নয়, কেবল গোত্রের।

গান্ধীজি ঐ সময়ে ভগিনী নিবেদিতার সংগে-ও সাক্ষাৎ করেন। তবে তাঁর সংগে আলাপ-পরিচয়ে খুব বেশী সন্তুষ্ট হন নি। বিবেকানন্দের সংগে আলাপে-ও যে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হ'তেন, এ-কথা আমার মনে হয় না। তাঁরা দু'জনে ছিলেন একই বৃক্ষের দু'টি ফুল, তবে তাঁদের মধ্যে রঙের ভিন্নতা এতো প্রচুর ছিল যে, তাঁরা দু'জনে পরস্পরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে পরস্পরকে স্বজাতীয় ব'লে চিনতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

ঐ সময়কার দৈনন্দিন কর্মসূচী সম্পর্কে গান্ধীজি বলেন ঃ

"আমি প্রতি দিনের কাজ এইভাবে ভাগ ক'রে নিয়েছিলাম ঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের জন্যে কলিকাতায় নেতাদের সংগে সাক্ষাৎকার, কলিকাতার ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন, এবং জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সন্ধান এবং সেগুলির সংগে পরিচয়।"

অর্থাৎ সংক্ষেপে, ধর্ম ও রাজনীতি।

গান্ধীজির এই কর্মসূচী তাঁর জীবনের সাময়িক কোনো ঘটনা নয়। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী একটি অনুষ্ঠান—তাঁর চরিত্রের দু'টি মূল দিক।

বস্তুতপক্ষে, গান্ধীজির জীবনে রাজনীতির চেয়ে-ও ধর্মের প্রাধান্যই বেশী।

তাঁর পরবর্তী জীবনে, আমরা লক্ষ্য করবো, এই ধর্মপরায়ণতার জন্যে ভারতীয় রাজনীতির বিপুল আয়োজনকে-ও বিনা দ্বিধায় তিনি পরিত্যাগ ক'রেছেন। সুতরাং আর অগ্রসর হবার আগে, গান্ধীজির ধর্মনীতি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। তাছাড়া, তাঁর ধর্মের স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ ক'রে না দেখলে এবার তাঁর রাজনীতিক কার্যকলাপ-ও নিতান্তই দুর্বোধ্য লাগবে। তাই পরবর্তী পরিচ্ছেদে গান্ধীজির ধর্মসূত্রই আমাদের আলোচ্য বস্তু। তাঁর নীতি-ধর্ম।

আট

একথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, গান্ধীজি সুদীর্ঘকাল ধ'রে যে-ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন, তা আসলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, মুসলমান বা পারশিক কোনো ধর্ম-ই ছিল না। তা ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত, স্বরচিত একটি ধর্ম—বিভিন্ন ধর্ম থেকে সংকলিত, নিজের ইচ্ছামতো নির্বাচিত কয়েকটি নীতির সমষ্টিমাত্র। তাঁর এই ধর্মকে তিনি নাম দিয়েছিলেন, 'নীতি-ধর্ম' বা Ethical Religion.

আমি পূর্বে যখন বলেছি, গান্ধীজি ধর্মকে অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রয়োগ ক'রেছিলেন এবং ধর্ম দিয়ে ইতিহাসের গতি রুদ্ধ ক'রতে চেয়েছিলেন, তখন আমি তাঁর এই স্বরচিত 'ভৌগলিক-সীমা-বর্জিত' নীতি-ধর্মের কথাই বলেছি।* সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন eclectic বা চয়নপন্থী। ধর্মে-ও তাঁর চয়ন-রীতি পরিপূর্ণরূপেই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ও মুসলমান—সকল ধর্ম থেকেই তাঁর তথাকথিত সনাতন, সত্যকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং নিজের জীবনে ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন নি যে, যাকে তিনি সনাতন সত্য ব'লে গ্রহণ করছেন, তা নিতান্তই কালোপযোগী—কালের খরস্রোত সেই সত্যের মৃত্তিকা সঞ্চিত করেছে, হয়তো তাতে মূল্যবান ফসল উঠবে, হয়তো তাতে আগাছা জন্মাবে···আবার আসবে কালস্রোত, ক্ষয়ে খসে' ধ্বসে ধুয়ে মুছে যাবে পুরাতন সত্যের মৃত্তিকা, আসবে ভাঙন, প্লাবন,

* "My religion has no geographical limits"—Ethical Religion by Gandhi.

আবার নূতন সত্যের মৃত্তিকা দেখা দেবে, উঠবে নূতনতরো ফসল, হয়তো নূতনতরো বিফলতা। গান্ধীজি লক্ষ্য করেন নি যে, ধর্মের কোনো স্বতন্ত্র ইতিহাস নেই। সে ইতিহাস উৎপাদন-ব্যবস্থার সংগে সম্পূর্ণ অংগাংগীভাবে জড়িত।* ভারতবর্ষে যখন নয়া বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠলো, তখন তার ধর্ম প্রধানত আত্মপ্রকাশ করলো ভিক্টোরিয়ান বুর্জোয়া খৃস্টান ধর্মের এক ভারতীয় সংস্করণ—ব্রাহ্ম ধর্মরূপে। বেদ উপনিষদের মধ্যেই খৃস্ট ধর্মের সূত্রের সন্ধান করলেন ভারতীয়রা—এবং সে সন্ধান তাঁরা পেলেন-ও।

রজনী পাম দত্ত তাঁর India To-day গ্রন্থে বলেছেন: বৃটিশ-বুর্জোয়া সমাজের সাম্রাজ্যবাদী সংস্পর্শে ভারতবর্ষ না এলে-ও ভারতে স্বত-ই একটি বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠতো এবং সেই উদীয়মান বুর্জোয়ারা প্রাচীন ভারতের বেদ, উপনিষদ ও গীতা থেকেই তাঁদের নৈতিক আদর্শের সূত্র খুঁজে বার করতেন। কথাটি একান্ত সত্য।† বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতে এলো, তখন তাদের প্রচারক হিসাবে খৃস্টান মিশনারী এবং পাদ্রিরা-ও এলো দলে দলে। বৃটিশ বুর্জোয়াদের সংস্পর্শে এসে ভারতে

* "Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence. They have no history, no development ; but men developing their material production and their material intercourse alter, along with this their real existence, their thinking and the products of their thinking. Life is not determined by consciousness, but consciousness by life."

Karl Marx and Frederick Engels—The German Ideology.

† ভারতবর্ষ যদি কখনো সাম্রাজ্যবাদী হ'য়ে ওঠে, তখনো সে তার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সমর্থন গীতার মধ্যেই পাবে:

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥" (দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৭)

যেমন একটি হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল, তেমনি বৃটিশ বুর্জোয়া-বাহিত খৃস্টান ধর্মের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় বুর্জোয়া ধর্ম-ও গ'ড়ে উঠলো—প্রধানত ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য দিয়ে এবং ভারতবর্ষে বুর্জোয়া খৃস্টান ধর্ম বৈদিক আকার ধারণ করলো। স্থানীয় বুর্জোয়াদের জন্মের সংগে সংগে যেমন অর্থ-নীতি ও রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের হোলো জন্ম, তেমনি ধর্মে-ও দেখা দিলো জাতীয়তাবাদ—যার প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটলো বিবেকানন্দের মধ্যে। বিশ্বের দরবারে বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের আসন দাবী করলেন। নব-জাত হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ বিশ্বের দরবারে যে-স্থান দাবী করছিল, ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ ধর্মের নামে নিজের অজ্ঞাতে তার-ই দাবী জানিয়ে এলেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সংগে একদিকে যেমন স্থানীয় বুর্জোয়াদের হোলো জন্ম, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্য-ও হ'য়ে উঠলো অসহনীয়। জনসাধারণের সেই হাহাকার-ও বিবেকানন্দের ধর্মের মধ্যে রূপ গ্রহণ করলো। জনসেবাই হোলো তাঁর ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংগ। তিনি হোলেন 'সমাজতন্ত্রী বিবেকানন্দ'—'Vivekananda the Socialist.' কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্ম ছিল যেমন বুর্জোয়া ধর্ম, তাঁর সোসালিজম্-ও রইলো তেমনি বুর্জোয়া সোস্যালিজম্।

এমনিভাবেই আমরা লক্ষ্য করি, সকল সময়েই ধর্মের মধ্যে সেই সময়-কার অর্থনীতির প্রতিফলন ঘটে। তাই গান্ধীজি যখন সনাতন ধর্মের সন্ধান করতে লাগলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতে কালোপযোগী কয়েকটি নীতি-সূত্রকেই গ্রহণ করলেন মাত্র। এই ভাবেই রচিত হোলো তাঁর ধর্ম-নীতি।

কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার যতো সত্বর ও সহজে পরিবর্তন ঘটে, কোনো গৃহীত ধর্মনীতির পরিবর্তন ততো সহজে সম্ভব হয় না। ফলে যে ধর্মনীতি একদিন কোনো অর্থনৈতিক শক্তির প্রকাশ বা প্রচাররূপে গৃহীত হয়, তাই অবিলম্বে

তার-ই অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। তাই আমরা দেখি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে দেশের অর্থনীতিক পরিবেশ বা পরিণতির ফলে গান্ধীজি স্বাভাবিক ভাবে যে ধর্মনীতিকে গ্রহণ ক'রেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে তাই নিতান্ত অকার্যকরী হ'য়ে উঠলো এবং নানা অন্তরায়ের সৃষ্টি করলো। কারণ, ইতিমধ্যে দেশের অর্থনীতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল এবং গান্ধীজির ধর্মনীতি সেই পরিবর্তনের সংগে পা মিলিয়ে চললো না। আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, গান্ধীজি যখন ধর্মানুশীলন শুরু করেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। তখন ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়ারা বৃটিশের প্রসাদে আপনাদের পুষ্ট করছে, তখনো তারা সহযোগী—এমন কি তখনো তাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের অপরিণত সংগ্রামী শক্তির-ও জন্ম হয় নি। তাই তারা তখন খৃস্টের বাণীর সংগে বেদ, উপনিষদ ও গীতার বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য লক্ষ্য করছে। ধর্ম-সূত্রের মধ্যে ত্যাগের, ক্ষমার, তিতিক্ষার ও সহিষ্ণুতার বাণীকেই গ্রহণ করছে শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ব'লে। কারণ, বৃটিশ শোষকরা তখন প্রায় শতাব্দীকাল ধ'রে একদিকে ভারতবাসীকে বৃটিশ শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করার জন্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যেমন ত্যাগ, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছিল, তেমনি অন্যদিকে নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়ারা আত্মপুষ্টির জন্যে বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণকে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যেও সেই সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার আদর্শকে-ই শ্রেষ্ঠ ও সনাতন ব'লে সহজে সানন্দে গ্রহণ করছিল। তাই রাজনীতিতে-ও আমরা এই সময়ে গোখলে প্রভৃতির মতো 'মডারেট' নেতাদের দেখি; তাঁরা ত্যাগ, ক্ষমা ও মীমাংসার মধ্য দিয়েই ভারতের জনসাধারণের উন্নতির জন্যে বৃটিশের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা দাবী করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামী শক্তি যখন পরে অপেক্ষা-

কৃত প্রবল হয়েছে, তখন তারা বুদ্ধের বাণী অপেক্ষা কালীর খড়্গের মধ্যেই তাদের ধর্মকে লক্ষ্য করেছে, গীতার শ্রেষ্ঠ বাণীর সন্ধান পেয়েছে মাত্র কয়েকটি কথার মধ্যে—'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। তাই দুষ্কৃতের বিনাশে তাদের গোপন অস্ত্রগুলি মুখর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু উপনিবেশগুলিতে বুর্জোয়া শক্তির উন্নতি মূলত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংগে সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই গ'ড়ে ওঠে। সুতরাং ভারতে ঐ সময়ে ত্যাগ ও তিতিক্ষাই ধর্মের প্রধান কথা হ'য়ে উঠেছিল।

গান্ধীজি যখন ধর্মালোচনা শুরু করেন, তখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগ। তাই তিনি ঐ সময়ে আত্মকল্যাণ ও জনকল্যাণের জন্যে পরিপূর্ণ রূপে উদ্বুদ্ধ হ'য়েই গীতার বিষয়াসক্তি-ত্যাগের ও ফল-নিরপেক্ষ কর্মের বাণীকেই শ্রেষ্ঠতম ব'লে গ্রহণ করেন। যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, তেমনি ভারতীয় বুর্জোয়াদের উপকারার্থে গীতার এই বাণীটিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ, কোটি কোটি জনসাধারণের ফল-নিরাসক্ত কর্মের এবং বিষয়াসক্তি ত্যাগের অর্থাৎ নিরংকুশ দারিদ্র্যের মধ্যেই তো বিদেশী ও স্বদেশী বুর্জোয়াদের স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব! কিন্তু গান্ধীজি একথা বোঝেন নি। তাঁর মতো প্রতিভার পক্ষে-ও তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কারণ, মানুষ যতোই শক্তিশালী হোক, সে নিজের অর্থনীতিক সীমাকে কখনো লংঘন করতে পারে না। প্রতিভা-ও কালের পুতুল মাত্র। সুতরাং গান্ধীজি সেদিন যাকে 'ভৌগলিক সীমা-বিরহিত' ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন, তা যে তদানীন্তন ভারতীয় অর্থনীতিক পরিবেশের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ ছিল, তা বোঝেন নি। তাই তাঁর গীতা পাঠ নিরপেক্ষ হোলো না। কারণ, এই 'চতুরবয়ব' (four-dimensional) পৃথিবীতে * সবই

---

* আমরা সচরাচর বিশ্বকে ত্রি-অবয়ব (three-dimensional) ব'লে থাকি।

আপেক্ষিক। গান্ধীজির ধর্মালোচনা-ও তাই নিতান্ত আপেক্ষিক হ'য়ে রইলো—যদিও তাকে তিনি শাশ্বত সনাতন ব'লেই গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য সবাইকে-ও সেই ভাবেই গ্রহণ করাতে চাইলেন। অবশ্য এ বিষয়ে পাঠকের সতর্ক হ'তে হবে যে, এর মধ্যে গান্ধীজির কোনোরূপ অসাধুতা বা স্বার্থপরতা ছিল না। তিনি ছিলেন কালের পুতুল মাত্র। না, কালের মুকুর বলা-ও চলে। তাই যখন তিনি নিজের আত্মাকে বা নিজের ধর্মকে সত্য ও সনাতন ব'লে ধরে নিয়েছেন, তখন তিনি সেই ভুল করছেন, মানুষ আয়নার মধ্যে কোনো বস্তুর প্রতিকৃতিকে লক্ষ্য ক'রে যখন তাকেই প্রকৃত বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে বা প্রচার করে। আয়নার মধ্যে কোনো বস্তুর প্রতিচ্ছবি যেমন নিরপেক্ষ নয়, তা প্রতিভাত বস্তুর পরিবর্তনের সংগে সংগে পরিবর্তিত হয়, তেমনি কোনো প্রতিভা-ও নিরপেক্ষ নন, তাঁর মধ্যে বিশেষ স্থান ও কালের প্রতিফলন ঘটে মাত্র। এবং কেবল সেই মানুষকেই সেই যুগে শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ব'লে গ্রহণ করা হয়, যে মানুষের মধ্যে সেই যুগের সর্বাপেক্ষা পূর্ণতর রূপ আত্মপ্রকাশ করে। তাই সেদিন গান্ধীজি গীতাকে এমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করেছিলেন, যা বর্তমানের সংগ্রামী জনসাধারণের কাছে বিকৃত ও সুবিধাবাদী হ'য়ে উঠেছে। গীতাকে তিনি অহিংস রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গীতার নিস্পৃহ ও নিষ্কাম ধর্ম হিংসাত্মক যুদ্ধেরই প্রচার-পত্র হিসাবে একদা আত্মপ্রকাশ করেছিল! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল হিংসাত্মক।

এই অবয়বগুলি হোলো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা। বিশ্বকে যাঁরা স্থির ও সনাতন ব'লে ভাবেন, তাঁরাই এই তিন অবয়বের প্রচারক। আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, পৃথিবী চতুরবয়ব। এই চারিটি অবয়ব হোলো: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গভীরতা ও গতি (flux)। আর এই গতিই সমস্ত বিশ্বকে আপেক্ষিক ক'রে তুলেছে, তার সনাতনত্ব গেছে ঘুচে।

'ভগবান' শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন ব'লেছিলেন, তাঁর পক্ষে এই হনন কার্য অসম্ভব। ফলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সান্ত্বনা এবং উৎসাহ দিলেন: 'এরা সকলে পূর্ব থেকেই আমার দ্বারা নিহত হ'য়ে আছে। তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।'' অর্থাৎ পৃথিবীতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে তুমি নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভাবে হনন কার্য সম্পন্ন করো। তুমি ঘৃণা ক'রে হত্যা কোরো না, বা ভালোবেসে হত্যা থেকে বিরত হোয়ো না—এই নির্লিপ্তি বা non-attachment-ই গীতার মর্ম-বাণী। কেবল তাই নয়, 'ভগবান' শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেন যে, ধর্মসংস্থাপন এবং দুষ্কৃতের বিনাশের জন্যে তিনি যুগে যুগে জন্মলাভ করেন। 'বিনাশ' কথাটিকে গান্ধীজি তাঁর অহিংসার খাতিরে (সম্ভবত অজ্ঞাতসারেই) যেমন ভাবেই এড়িয়ে যান বা বিকৃত ব্যাখ্যা করুন না কেন, তা যে বিনাশ, সে-বিষয়ে কোনো গীতাধ্যায়ীর বিন্দুমাত্র-ও সন্দেহ নেই। সুতরাং গান্ধীজির গীতা-অনুশীলনের মধ্যে-ও সেই একই কালোপযোগী eclecticism বা চয়ন-পন্থিতাই আমরা লক্ষ্য করি।

গান্ধীজির গীতা-পাঠ বা গীতার অনুশীলন যেমন চয়নপন্থী ছিল, তেমনি বুদ্ধদেবের বাণীকে-ও তিনি পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নি। ইংরেজী ভাষার মারফৎ তিনি প্রথম গীতা পাঠ করেছিলেন। গীতার ইংরেজী অনুবাদ-গুলির মধ্যে তিনি সার এডুইন আর্নল্ডের অনুবাদ 'Songs Celestial'-কেই শ্রেষ্ঠ ব'লে উল্লেখ করেন। বুদ্ধের বাণীর প্রথম পাঠ-ও তিনি ইংরেজি কাব্যের মারফৎই পেয়েছিলেন। এবং সে-বিষয়েও সার এডুইনের কাছেই তিনি ঋণী। সার এডুইনের The Light of Asia কাব্যখানিই তাঁকে এ-বিষয়ে প্রভাবিত করে। কিন্তু The Light of Asia গ্রন্থখানি একটি বৃহৎ দোষে দুষ্ট। হিন্দুর দেবদেবী এবং হিন্দু উপকথার মধ্য দিয়ে সার এডুইন বুদ্ধদেবকে চিত্রিত করছেন। তাই সার এডুইনের বুদ্ধ একটি হিন্দু বুদ্ধ বা

ভেজাল বুদ্ধে পরিণত হয়েছেন। * কিন্তু সার এডুইন আর্নল্ড বুদ্ধের যে আসল রূপটিকে তাঁর কাব্যে বজায় রাখতে পেরেছিলেন, গান্ধীজি তাকে-ও সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। বুদ্ধদেবের সেই পরমতম প্রশ্ন :

"I would not let one cry
Whom I could save ! How can it be that Brahma
Would make a world and keep it miserable,
Since, if, all-powerful, he leaves it so,
He is not good, and if not powerful,
He is not God ?"

বুদ্ধদেব প্রশ্ন করেছিলেন :

আমার সাধ্য থাকতে আমি তো একটি মাত্র প্রাণীকেও কাঁদতে দেবো না। অথচ এ কেমন ক'রে সম্ভব যে, ব্রহ্ম এই বিশ্বের সৃষ্টি ক'রে তাকে দুঃখ বেদনায় পূর্ণ ক'রে রেখেছেন ? কারণ, তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন, আর বিশ্বের এই দুঃখ-বেদনার প্রতিকার না করেন, তবে তিনি মংগলময় নন। আর যদি তিনি সর্বশক্তিমান না হন, তবে তিনি কেমন ভগবান ?...

ব্রহ্ম সম্পর্কে এই প্রশ্ন বুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর তথাগত বুদ্ধও যেমন দিতে পারেন নি, আধুনিকতম কোনো ধর্মপ্রচারকও তেমনি দেন না। বিশ্বের বেদনাকে তাঁরা বলেন ভগবানের লীলা, এবং

* বাংলা সাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধ-চরিত' নাটক দ্রষ্টব্য। এই নাটকখানি 'লাইট অব এশিয়ার' প্রভাবে রচিত। তাই সেখানে-ও আমরা বুদ্ধদেবকে হিন্দু ধর্মের অবতার রূপেই দেখি। গিরিশচন্দ্রের 'শংকরাচার্য' নাটকখানিও লক্ষণীয়। যে শংকরাচার্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী, এমন কি দ্বৈতবাদে-ও (Dualism) ঘোরতর অবিশ্বাসী, তাঁকে গিরিশচন্দ্র বহুদৈবিক (Polytheistic) এক হিন্দু ধর্মের মহাদেবের অবতাররূপে চিত্রিত করতে-ও কুণ্ঠিত হন নি।

এমনিভাবেই মানুষের হাতে গড়া দুঃখকে ও দারিদ্র্যকে তাঁরা চিরন্তন লোক-রহস্যের অতীত ব'লেই ঘোষণা করেন এবং শোষণকে, পীড়নকে একটি বিবেকসংগত ন্যায্যতা লাভের সুযোগ দেন। কিন্তু কেবল মানুষের বেদনায় নয়, সমস্ত প্রাণজগতের বেদনাতেই বুদ্ধের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল। তিনি পৃথিবী থেকে বেদনাকে বিদূরিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভগবানের লীলায় বিশ্বাস করেন নি, উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ

ব্রহ্মের বা ব্রহ্মের মধ্যে সৃজনারম্ভের সন্ধান কোরো না। ব্রহ্মকে-ও পাবে না, কোনো জ্ঞান-ও লাভ করবে না।

"Look not for Brahma and the Beginning there !
Nor him, nor any light."

কারণ, বুদ্ধ বলেন, যতোই পর্দার পর পর্দা তুলবে, ততোই দেখবে পর্দার পর আরো পর্দা রয়েছে।

"Veil after veil will lift—but there must be
Veil upon veil behind."

তাই বুদ্ধদেব সৃষ্টির আদি সম্পর্কে ব্যস্ত হন না ; অনাদি ব্রহ্মের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্যও বড়ো একটা চিন্তিত নন। তাঁর চিন্তা বর্তমানকে নিয়ে, ভবিষ্যৎকে নিয়ে। তিনি বলেন ঃ যখন জীবন-মৃত্যু রয়েছে, রয়েছে আনন্দ-বেদনা, কার্য-কারণ, কাল-স্রোত—তখন সেগুলিই কি যথেষ্ট নয় ? কী প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানে, সৃজনারম্ভের তথ্যে ?

"This is enough
That life and death and joy and woe betide,
And cause and sequence, and the course of time."

তাই বুদ্ধদেব ভগবান সম্পর্কে নীরব থাকেন। কিন্তু গান্ধিজী হিন্দু

ধর্মের প্রভাব-মুক্ত হ'তে পারেন নি। তিনি ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁর সমস্ত কাজেই তিনি ভগবানের নির্দেশ চান, ভগবানের কাছে করেন অবিরত প্রার্থনা। প্রার্থনা তাঁর কাছে ভিক্ষামাত্র নয়, আত্মশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান—অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প।* কিন্তু বুদ্ধদেব বলেন:

প্রার্থনা কোরো না! অন্ধকার আলোকিত করে না। যা নীরব, তাকে প্রশ্ন কোরো না। নৈঃশব্দ্য বাক্‌শক্তিহীন।

"Pray not ! the Darkness will not brighten ! Ask
Nought from silence, for it cannot speak !"

জীবন সম্পর্কে বুদ্ধদেব অত্যন্ত নিরাশাবাদী। তাঁর কথা আধুনিক শোপেনহাউএরকে অনেকক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দেয়। জীবন ও মৃত্যু তাঁর কাছে এক সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন বেদনার ইতিহাস মাত্র। এখানে সকল আনন্দই অলীক, সকল দুঃখই সত্য। আনন্দের পরিণতি যন্ত্রণায়, যৌবনের বার্ধক্যে, প্রেমের বিরহে, প্রাণের—নিষ্প্রাণ মৃত্যুতে। কেবল তাই নয়, মৃত্যুতেই এ জীবনের শেষ হয় না। মৃত্যুর পর মৃত্যুর পথ বয়ে আসে অসংখ্য জীবন। আর এইভাবেই জীবনের চক্র অসত্য আনন্দ এবং সত্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নিরবধি ঘূর্ণিত হ'তে থাকে।† তাই বুদ্ধদেব পৃথিবীর

* "But my faith is increasing in the efficacy of silent prayer. It is by itself an art—perhaps the highest art requiring the most refined diligence."—Gandhi.

মহম্মদ-ও বলেন, পৃথিবীতে তিনটি বস্তু তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়: শিশু, নারী এবং প্রার্থনা। শিশু-ও গান্ধীজির অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তবে, নারী সম্পর্কে কথাটা অবশ্য আলাদা।

† "...Pleasures end in pain, and youth in age,
And love in loss, and life in hateful death.

বিপুল বেদনায় কাতর হ'য়ে ওঠেন, অনুভব করেন পার্থিব আনন্দের অসারতা, উচ্চ-নীচ সকল প্রাণীর অসহ্য আর্ততা।

"...I see, I feel
The vastness of the agony of earth,
The vainness of its joys, the mockery
Of all its best, the anguish of its worst,..."

পৌরাণিক হিন্দু বা খৃস্টান ধর্মীর জীবনে ভবিষ্যতের স্বর্গ আছে। মুসলমানের জীবনেও তাই। কিন্তু বৌদ্ধের জীবনে স্বর্গ নেই—আছে নির্বাণ। সেখানে দীপ-শিখা নির্বাপিত হয়। সেখানে কোনো সুন্দরতর লোকে জীবনাগ্নি সুন্দরতর হ'য়ে উদ্দীপিত হয় না। সেখানে জীবনের শেষে মহাজীবনের সম্ভাবনা নেই—আছে জীবনের মহানির্বাপণ।

বৌদ্ধদের মতে, জীবন দুঃখময়, বেদনাময়। কিন্তু, তাঁদের কাছে জীবনের-ও মূল্য আছে। কারণ, এই জীবনের পথেই নির্বাণের লক্ষ্যে জীবকে অগ্রসর হ'তে হবে। বুদ্ধদেব বলেন, সকল জীবই সেই এক নির্বাণ পথের যাত্রী। তাই বুদ্ধদেব উপদেশ দেন, জীব হত্যা কোরো না। কেন না, জীবহত্যার দ্বারা জীবকে তার নির্বাণের যাত্রাপথ থেকে বিচ্যুত করা হয়। উদ্‌বর্তনবাদীরাও বলেন, এক পরম লক্ষ্যের পানে সমগ্র জীবলোক অহরহ আবর্তিত হচ্ছে।* কিন্তু প্রাচীন বুদ্ধদেবের মতের সংগে আধুনিক উদ্‌বর্তনবাদীদের মতের মূল পার্থক্য তিনটি ঃ

And death in unknown lives which will but yoke
Men to their wheel again to wheel the round
Of false delights and woes that are not false."

* তাই বার্ণার্ড শ-ও জীব হত্যার বিরোধী, নিরামিষাশী।

প্রথমত, তাঁদের কাছে জীবন কেবল দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ নয়; আনন্দ-উল্লাস-ও আছে—যা দুঃখ-বেদনার মতোই সম্পূর্ণ সত্য। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মতে জীবের উদ্‌বর্তন অবিরাম উর্ধ্বতর লোকেই ঘটছে। অন্য পক্ষে, বুদ্ধদেবের মতে, নির্বাণ-লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবন নিরন্তর নিচ থেকে উচ্চে এবং উচ্চ থেকে নিচে আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি জীবের যাত্রা নির্বাণের উদ্দেশ্যে। এই যাত্রা-পথে জীব আপন কর্ম-ফলে পরজন্মে কখনো নিম্নতর জীবনে প্রত্যাবর্তন করে, কখনো বা উচ্চতর জীবনে উন্নতী হয়। এবং এই ভাবেই "The wheel of birth and death turns low and high." তৃতীয়ত, উদ্‌বর্তনবাদীরাও জীবের পরজন্মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে-পরজন্ম লাভ ব্যক্তিগতভাবে ঘটে না, ঘটে সমাজগতভাবে। মানব-সমাজ উদ্‌বর্তনের ফলে মানবোত্তর সমাজে উদ্‌বর্তিত হবে, কিন্তু ব্যক্তিগত মানব কর্মের অধিকারী হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যৎ সমাজে উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। কারণ, মৃত্যুতেই ব্যক্তির শেষ।

গান্ধীজি উদ্‌বর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বুদ্ধের জীবন-চক্রে বিশ্বাসী,* আবার বুদ্ধদেবের জীবনচক্রেও তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী নন। পৌরানিক হিন্দু, খৃস্টান বা মুসলমানের মতোই তিনি ছিলেন বৈকুণ্ঠে বিশ্বাসী। যাই হোক, ব্যক্তিগত পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি সমাজের অপেক্ষা ব্যক্তির উপরেই অনেক বেশি নির্ভরশীল। যে অর্থনীতি সমাজ-বিরোধী ব্যষ্টিবাদকে সমাজের পক্ষে চূড়ান্ত শ্রেয় ব'লে বর্ণনা করে, সেই

---

* "আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাহি না। কিন্তু পুনরায় যদি জন্মগ্রহণ করি, তবে যেন অস্পৃশ্যদের মধ্যেই জন্মি। তাহাতে আমি তাহাদের অসুবিধার অংশ গ্রহণ করিতে পারিব। তাহাদের মুক্তির জন্য পরিশ্রম করিবার সুযোগ পাইব।"

—গান্ধী, (১৭ই এপ্রিল, ১৯২১)

অর্থনীতির আশ্রয়ে থেকে ধর্মচর্চার ফলে ব্যক্তিগত পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়াও নিতান্ত অবান্তর নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত পরজন্মে বা উদ্‌বর্তনে বিশ্বাসী হ'লে এবং সেই বিশ্বাসকে কার্যত প্রয়োগের চেষ্টা করলে চাই পূর্ণতম জীবন—যে জীবনে শ্রেয় কর্ম সাধনের অবাধ সুযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে সকলের। সুতরাং ব্যষ্টিতে পরম বিশ্বাসী বুদ্ধ, খৃস্ট এবং গান্ধীকে সমাজেই ফিরে আসতে হয় অবশেষে। বুদ্ধ প্রচার করেন করুণার বাণী, দেন সংঘ-জীবন পালনের উপদেশ; নাজারেথের ছুতোর মিস্ত্রী যিশু হয়ে ওঠেন সমাজতন্ত্রী; গান্ধী বলেন, তিনি-ও কম্যিউনিস্ট। কিন্তু এঁদের কাছে ব্যক্তি মুখ্য, সমাজ গৌণ। আবার, পরজন্মে ও পরলোকে তাঁরা বিশ্বাসী। তাই পার্থিব বা বর্তমান জীবনে তাঁদের অবিশ্বাস; পার্থিব তাঁদের কাছে অপার্থিবের সোপান মাত্র, বর্তমান অবর্তমানের। তাই বুদ্ধ, খৃস্ট ও গান্ধী করুণার বাণী প্রচার করেন, কারণ, জীবের হননে জীবের ব্যক্তিগত কর্মের সুযোগ দূরীভূত হয়। প্রতিটি জীবকে সুযোগ দিতে হ'লে চাই হত্যায় বিরতি—চাই অহিংসা, করুণা। এখানেও আমরা লক্ষ্য করি, এই করুণা এবং অহিংসা উপায় মাত্র। কিন্তু গান্ধীজির বেলায় যেমন তাঁর উপায় তাঁর ধর্মে পরিণত হয়েছিল, ঠিক তেমনি হয়েছিল বুদ্ধ এবং খৃস্টের জীবনেও, গান্ধীজির মতোই করুণা এবং অহিংসা বুদ্ধ ও খৃস্টের ধর্ম হয়ে উঠেছিল। খৃস্ট বলেছিলেন: all they that take the sword should perish with sword" (Matt. xxvi, 52)

অস্ত্রেই অস্ত্রধারীর মৃত্যু ঘটে।* করুণাশীলই লাভ করেন করুণা:

---

* অবশ্য গান্ধিজী অস্ত্রধারণ না করলেও অস্ত্রাঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। যিশু খৃস্টেরও অপঘাত ঘটেছিল। অস্ত্রধারণ সম্পর্কে গান্ধীজি শ্রমিকদের যে উপদেশ দেন,

"Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy" (Matt. v, 7) এডুইন আর্ণল্ডের বুদ্ধ-ও* বলেন ওই একই কথা: "mercy cometh to the merciful." (The Light of Asia, Book v)

কেবল অহিংসা এবং করুণার দিক থেকেই নয়,—আরো বহুদিক থেকেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব গান্ধীজির উপর অত্যন্ত বেশি ছিল। অবশ্য

তা যে যিশু খৃস্টেরই মুখামৃত, তা অতি সহজেই বলা চলে। গান্ধীজি শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ ত্যাগ করতে বলেন:

"To use violence for securing rights may seem an easy path, but it proves to be thorny in the long run. Those who live by sword die also by sword. The swimmer often dies by drowning" (Young India, p. 728)

অস্ত্র-বিদ্বেষী গান্ধীজির আগ্নেয়াস্ত্রে মৃত্যু হয়েছে এ যেমন সত্য, এই সমুদ্র-মেখলা পৃথিবীতে সাঁতার না জানা মানুষরাই যে মরে বেশী, একথাও তেমনি সত্য। আপনি সাঁতার শিখবেন না, সুতরাং জলের পাশে যাবেন না, কিন্তু জল আপনার কাছে আসবে। আপনার সাঁতার না শেখার যাদুমন্ত্র আপনাকে জলোচ্ছ্বাস প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আপনি অস্ত্র ধারণ করবেন না, কিন্তু সিংহ ব্যাঘ্র নিরস্ত্র থাকবে না। এণ্ড্রোক্লিসের উপকথায় গান্ধীজি বিশ্বাস করতে পারেন—তিনি সাপ পোষার ব্যবস্থাও করেছিলেন তাঁর আশ্রমে, কিন্তু মানুষ-বাঘের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি। সশস্ত্ররা অস্ত্রে মরে, সন্তরণবীরেরা প্লাবনে ভেসে যায়, এ কথা সত্য; কিন্তু নিরস্ত্ররা যে অস্ত্রাঘাতে মরে, সন্তরণ-বিরোধীরা যে স্নান করতে গিয়ে মারা পড়ে, এই সত্যকে লক্ষ্য না করার মধ্যেই আছে গান্ধীজির একদর্শিতা। বলতে পারেন প্রতিভা!

* অবশ্য আর্ণল্ড মূলত অশ্ব ঘোষের বুদ্ধ চরিত অবলম্বনেই তাঁর Light of Asia রচনা করেছিলেন।

ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধের মতামত গান্ধীজিকে আদৌ চিন্তিত করে নি। ভগবানের কথা বাদ দিলেও তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের আরো বহু আদেশ পালন ক'রে চলতেন। এখানে সেগুলির প্রধান দু'টি উল্লেখ করা চলে।

সার এডুইনের বুদ্ধ বলেন :

"Govern thy lips
As they were palace-doors, the king within.
Tranquil and fair and courteous be all words"...

গান্ধীজির মৌন এবং বাকসংযম জগৎবিখ্যাত। ভাষণ এবং আলাপনের মধ্যে-ও তাঁর প্রশান্ত ভাবটি চিরকালই অতুলনীয় ছিল।

মাদকদ্রব্য সম্পর্কে গান্ধীজির এবং টলস্টয়ের মতামত আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বুদ্ধের নিম্নলিখিত উপদেশটি গান্ধীজির উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা-ও বলা যায় :

"Shun drugs and drinks which work the wits abuse,
Clear minds, clean bodies need no Soma Juice."*

বৌদ্ধ ধর্মের সংগে খৃস্টান ধর্মের তুলনা ক'রে গান্ধীজি বৌদ্ধধর্মের অহিংসাকে ব্যাপকতর মনে করেন। গান্ধীজি বলেন, বুদ্ধদেবের প্রেম ও অহিংসা সকল প্রাণীতেই ছিল প্রসারিত।† কিন্তু খৃস্টের প্রেম ও অহিংসা

---

* এই কথাগুলি সহজেই বার্ণার্ড শ-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি তাঁর পান-বিরোধিতা সম্পর্কে মিসেস চার্চিলকে (উইনস্টন চার্চিলের মাকে) যা বলেছিলেন, সে যেন এ কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি। মিঃ চার্চিলের রচিত 'Great Contemporaries' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই জীবে দয়ার ধর্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এই ধর্মের **প্রথম** প্রচারক ছিলেন জৈন ধর্মের আদিগুরু ঋষভ দেব। তাঁকে আদিনাথ-ও

সীমাবদ্ধ ছিল কেবল মনুষ্য জাতির মধ্যে। খৃস্ট মৎস্যাহার বা মাংসাহারের বিরোধী ছিলেন না। নিউটেস্টামেণ্টে বর্ণিত তাঁর জীবন কাহিনীগুলিতে বহু স্থলেই তাঁর সশিষ্য আমিষ-ভোজনের উল্লেখ আছে।*

কেবল খাদ্য সম্পর্কেই যে খৃস্ট সহিংস ছিলেন, তা নয়। তাঁর ভগবান সম্পর্কিত ধারণাটিকে-ও যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তাঁর ভগবান কারুণিক পরম পুরুষ নন। নিউ টেস্টামেণ্টে কথিত খৃস্টের বাণী এবং কাহিনীগুলিতে যে-ভগবানের বর্ণনা আছে, তা দণ্ডদাতা, কঠোর, প্রতিহিংসাপরায়ণ ভগবান এবং অনেক ক্ষেত্রে জেহোভার সংগে তাঁর বড়ো একটা পার্থক্য নেই। তিনি সকলকে করুণা দেখান না। তিনি পাপীকে দেন শাস্তি, সাধুকে দেন পুরস্কার। তিনি বিচারক ভগবান, প্রলয়কালে তিনি সাধুকে রক্ষা করেন, দুষ্কৃতকে দণ্ড দেন।

"Then shall two be in the field ; the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left." (Matt. xxiv, 40, 4I)

বলা হয়। আদিনাথ ঋষভদেবের অধস্তন ২৩শ তীর্থংকর মহাবীর ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। গান্ধীজির জন্মস্থান গুজরাটে এই জৈন ধর্মের প্রভাব আজো প্রচুর রয়েছে।

* এই বইয়ের ২৪ পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নিরামিষ ভোজনের সমর্থনে গান্ধীজি হাউয়ার্ড উইলিয়াম্‌সের লেখা 'আহার-নীতি' বা Ethics of Diet নামক বইখানি পড়েন। এই বইখানিতে যিশু যে নিরামিশাষী ছিলেন, তা প্রমাণ করার চেষ্টাও ছিল ব'লে গান্ধীজি বলেছেন। দুঃখের বিষয়, ওই বইখানি আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। সুতরাং মিঃ উইলিয়াম্‌স্ কি তথ্য ও যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, তা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। যাই হোক, গান্ধীজি হাউয়ার্ড উইলিয়াম্‌সের যুক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন, এমন আমি মনে করি না। মানুষের মধ্যেই যিশুর অহিংসা এবং করুণা সীমাবদ্ধ ছিল, গান্ধীজির এই সমালোচনা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

"দুই জন লোক ক্ষেতে কাজ করবে। একজনকে তিনি (ভগবান) গ্রহণ করবেন, অপর জনকে করবেন পরিত্যাগ। দুই জন মেয়ে জাঁতায় কাজ করবে, তাদের একজনকে তিনি গ্রহণ করবেন, অপর জনকে করবেন পরিত্যাগ।"

"I tell you, in that night there shall be two men in one bed ; the one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together ; the one shall be taken, and the other shall be left. Two men shall be in the field ; the one shall be taken, and the other left." (Luke xvii, 34, 35, 36)

"আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রিতে দুই ব্যক্তি একই শয্যায় শায়িত থাকবে ; তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপর জন হবে পরিত্যক্ত। দুজন মেয়ে একই জাঁতায় কাজ করবে, তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপর জন হবে পরিত্যক্ত। দুই জন পুরুষ মাঠে কাজ করবে ; তাদের একজন হবে গৃহীত এবং অপর জন হবে পরিত্যক্ত।"

খৃস্ট তাঁর রূপক কাহিনীগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে ভগবানের সংগে মনিবের এবং মানুষের সংগে অলস বা অবিশ্বস্ত ভৃত্যের তুলনা করেন। এই মণিবটিকে আমরা প্রায়ই কঠোর এবং সূক্ষ্মবিচারপরায়ণরূপেই দেখি। তাছাড়া, নিউ টেস্টামেণ্টে একটি সতর্কবাণী প্রায়ই দেখা যায়ঃ "there shall be weeping and gnashing of teeth." খৃস্টের যিনি ভগবান, তাঁর রাজ্যে সকলের স্থান নেই। কেবল সাধু এবং সজ্জনই সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। তাই তাঁর আদেশ, উপদেশঃ

সাধু হও, সজ্জন হও, নিঃসম্বল হও, আপনাকে বিনত করো, ত্যাগ করো।

কিন্তু খৃস্ট যখন মানুষের কল্যাণের জন্যে (এই কল্যাণ মূলত পারলৌকিক) ভগবানের কঠোর বিচারের ভয় দেখাতেন, তখন বুদ্ধ আশ্রয় নিতেন পরজন্মের। কারণ, ভগবান সম্পর্কে বুদ্ধ ছিলেন নীরব; সর্বশক্তিমান হ'য়েও ভগবান পৃথিবীকে দুঃখে, গ্লানিতে, বেদনায় পূর্ণ রেখেছেন, এ যেমন তিনি ভাবতে পারতেন না, তেমনি একথাও তাঁর কল্পনাতীত ছিল যে ভগবান সর্বজ্ঞ হয়ে, জীবের সর্বকর্মের অধিনায়ক হ'য়ে, কৃতকর্মের জন্যে জীবকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন। তাই এই দুর্জ্ঞেয়কে তিনি জানতে চান নি। তাই জীবন-চক্রের উত্থান-পতনই তাঁর কাছে স্বর্গ ও নরক হয়ে উঠেছে—পারলৌকিক জীবন তাঁর কাম্য নয়, জীবনের চির-নির্বাপণই ছিল তাঁর চির লক্ষ্য। তাই বুদ্ধ যখন মানুষকে পরজন্মের ধমক দিচ্ছেন, তখন খৃস্ট দিচ্ছেন নরকাগ্নির,—দণ্ডদাতা বিধাতার কঠোর দণ্ডের। জন্মান্তরের বিষয়ে খৃস্টের কোনো উদ্বেগও ছিল না। কারণ, তাঁর কাছে কেয়ামতের বিচারের মুহূর্ত ছিল আসন্ন। তাঁর সম-সাময়িকদের জীবিতকালেই যে পৃথিবীতে 'রামরাজ্য' (Kingdom of God) প্রতিষ্ঠিত হবে, এবিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না। কারণ, তাঁর পূর্ববর্তী ঋষিদের তাই ছিল ভবিষ্যৎ-বাণী। সুতরাং জন্মান্তর সম্পর্কে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন ছিল না খৃস্টের। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেন:

"But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God." (Luke ix, 27.)

"আমি তোমাদের একটি সত্য জানিয়ে রাখি, এখানে এমন অনেকে

আছে, যাদের মৃত্যু আসার আগেই পৃথিবীতে বিধাতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।"

"Verily I say unto you, This generation shall not pass away, till all be fulfilled" (Luke xxi, 32)

"আমি সত্যই তোমাদের বলছি, বর্তমান পুরুষ বিগত হবার পূর্বেই সমস্ত কিছু পূর্ণ হবে। (অর্থাৎ, বিধাতার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।)

কিন্তু গান্ধীজি হিন্দু ধর্মের আওতায় মানুষ, যে হিন্দু ধর্ম অদ্বৈত থেকে বহুদৈবিক, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন থেকে শৈব, শাক্ত—সকল প্রকার স্বতঃবিরুদ্ধ মতবাদকে নির্বিকারভাবে আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং বুদ্ধের জীবনচক্রে এবং খৃস্টের কেয়ামতে একই সংগে বিশ্বাসী হয়ে ওঠা গান্ধীজির পক্ষে বিন্দুমাত্রও অসম্ভব ছিল না। খৃস্টের মতোই* গান্ধীজিকে একটি বিচারপরায়ণ কঠোর সূক্ষ্মদর্শী ভগবানে বিশ্বাসী ব'লে মনে হয়। এই প্রসংগে একটি কৌতুককর ঘটনা আমাদের সহজে মনে পড়ে। বিহার ভূমিকম্পের সময় যখন বহু নরনারী এবং শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হোলো, তখন গান্ধীজি ঘোষণা করলেন: পাপ। মানুষের পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। রবীন্দ্রনাথ তখন গান্ধীজির এই উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন, 'কিন্তু কি পাপ করলো শিশুরা?' † এই যুক্তিই গান্ধীজির উক্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট ছিল।

* আবার কখনো যিশু তাঁর ভগবানকে বিচারবিহীন অবারিত করুণার মহত্ত্বেও ভূষিত করেছেন:

"... he (God) maketh his sun to rise on the evil and on the good and senteth rain on the just and on the unjust."

(Matt. v, 45)

গান্ধীজির মধ্যেও তাঁর ভগবান সম্পর্কে এই স্বতবিরুদ্ধ উক্তি প্রায়ই দেখা যায়।

† এই প্রসংগে খৃস্টের নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ করুন। সেগুলি যেন খৃস্টান গান্ধীর কথাগুলিরই তীব্র প্রতিবাদ করে:

গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের বিতর্কের মতোই একটি ঘটনা ঘটেছিল, প্রায় দু শতাব্দী আগে। ইউরোপে ১৭৫৫ খৃস্টাব্দে লিসবনে যখন ভূমিকম্প হোলো, তখন খৃস্টান যুক্তিবাদী ভলতের পৃথিবীতে ভগবানের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ ক'রে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি প'ড়ে ফরাসী দার্শনিক রুশো ভলতেরকে বিদ্রূপ ক'রে বলেন: "Voltaire in seeming always to believe in God, never really believes in anybody but the devil."

খৃস্টের ভগবানের মতোই গান্ধীজির ভগবানও যেমন বিচারপরায়ণ, কঠোর, দণ্ডদাতা আবার তেমনি ক্ষমাশীল, পরম কারুণিক-ও। তিনি যেমন অতি সহজে অপরাধ নেন, রাগ করেন, শাস্তি দেন, তেমনি অতি সহজেই আবার খুশী-ও হয়ে ওঠেন। ভারতীয় মেয়েরা যদি ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরী ফিনফিনে শাড়ির বদলে মোটা ধবধবে খদ্দরের শাড়ি পরেন, তাতে গান্ধীজির ভগবানের আনন্দের আর সীমা থাকে না!

গান্ধীজি মেয়েদের উপদেশ দিয়ে বলেন:

"Certainly God will be pleased with those who wear the spotless Khadi Sari, as symbol of the inner purity than with those who are gaudily dressed." *

"Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell and slew them, think ye that they are sinners above all men that dwelt in Jerusalem?" (Luke XIII. 4)

"কিম্বা সিলোমের মিনার ভেঙে পড়ায় যে আঠারো জনের মৃত্যু ঘটলো, তুমি কি ভাবো, জেরুসালেমে যতো পাপী ছিলো, তাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী পাপী ছিলো তারাই?"

* টলস্টয়ের উক্তি সহজেই মনে পড়ে। তিনি বলেন: Dirt is God's worship. অপরিচ্ছন্নতাই ভগবানকে খুসী করে। কারণ, কৃষক ও শ্রমিকরা

এই কথাগুলির মধ্যে আমরা এ-ও লক্ষ্য করি যে, গান্ধীজির এই ভগবান সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী। অনেকখানি ইস্রায়েল বংশীয়দের কল্পিত ভগবানের মতোই। *

তাই গান্ধীজির ভগবানকে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে, আমার কিম্বা আপনার দাদামশায়ের মতো। বৃদ্ধ মানুষ; স্নেহশীল; তবে মেজাজটি বড় রুক্ষ। বার্ধক্যের দোষ। নাতনী শাদাসিদে পোশাক পরলে তিনি খুশী হন; আবার যদি নাতনী যদি তাঁর বন্ধুর পানে মৃদু হেসে আড় চোখে একটু তাকান, তবেই আর রক্ষা থাকে না।

ভগবান সম্পর্কে এই ধরণের ধারণা জন্মাবার জন্যে আমাদের শৈশবই দায়ী। ভগবান সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণাটি-ও শৈশবেই গ'ড়ে উঠেছিল। আর সেই ধারণাকে তাঁর অন্যান্য বহু ধারণার মতোই পরবর্তী জীবনে তিনি কেবল পুষ্ট করেছিলেন, বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন নি।

সর্বদাই অপরিচ্ছন্ন থাকে। পরিশ্রম করা এবং পরিচ্ছন্ন থাকা একই সংগে মানুষের কপালে ঘটে না। অথচ পরিশ্রমই ভগবানের পূজা; সুতরাং অপরিচ্ছন্নতাও ভগবানের পূজা। গান্ধীজির কথাগুলির মধ্যে Spotless কথাটি লক্ষণীয়।

* গান্ধীজির জাতীয়তাবাদের সংগে তাঁর আন্তর্জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব ও আপোষ যেমন লক্ষণীয়, তাঁর ধর্ম ও ভগবান সম্পর্কে ধারণার মধ্যেও তেমনি। জুডিয়া তখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকার ফলে খৃস্টের ধর্ম ইস্রায়েল বংশীয়দের মতো গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিল না। তা বহুল পরিমাণে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছিল। খৃস্ট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি ইস্রায়েল বংশীয় পাপীদের উদ্ধারের জন্যেই আসিনি।" "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." (Matt, XV, 24), গান্ধীজির কালে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় তাঁর ভগবানও আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছেন। গড্, আল্লাহ্, মেজ্দা, কৃষ্ণ, রাম—সব একত্রে। কিন্তু সেই সংগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরও তিনি অধিনায়ক। তাঁর ধর্মেও সেই জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর ভগবান তাই ম্যানচেস্টারে তৈরী কাপড়ের চেয়ে চরকায় কাটা সূতোয় তৈরী কাপড়ে বেশী খুশী।

গান্ধীজি বহুবার স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব-বিস্তার করেছিল। সেকথা অত্যন্ত সত্য। নিউ টেস্টামেণ্ট তাঁর জীবনের নিত্য সহচর-ও ছিল। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থকে তিনি এইভাবে অনুসরণ করেন নি।* গান্ধীজি বলেন: "জীবনে আমার এমন অনেক সময় এসেছে, যখন বুঝতে পারি নি, কি আমার কর্তব্য। তখনই আমি বাইবেলের আশ্রয় নিয়েছি। বিশেষত, নিউ টেস্টামেণ্টের। এবং বাইবেলের বাণী থেকেই আমি সংগ্রহ করেছি শক্তি।" †

সুতরাং গান্ধীজির জীবনে খৃস্ট ধর্মের প্রভাব সত্যি কতোখানি তার সন্ধান ও বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। সর্বপ্রথমে একথা উল্লেখযোগ্য যে, গান্ধীজি খৃস্টান ধর্ম থেকে যে বাণী বা নীতিসূত্রগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি গীতা বা বৌদ্ধধর্ম থেকে তাঁর সংগৃহীত বাণী ও নীতিসূত্রের মতোই ছিল আংশিক এবং চয়নপন্থী। খৃস্টের জীবনেতিহাস এবং বিভিন্ন বাণী তাঁর চারজন মূল জীবনীকারের লেখা চারটি জীবনীতে 'সংরক্ষিত' আছে। এই জীবনীকারদের নাম সেণ্ট ম্যাটিউ, সেণ্ট মার্ক, সেণ্ট লিউক এবং সেণ্ট জন। কিন্তু চারিজন জীবনীকার কথিত খৃস্টের চারিটি জীবনী বহুক্ষেত্রে এমন ভিন্নতর যে, সেগুলিকে নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য বা সত্যের

* রেভারেণ্ড হোম্‌স্ বলেন: "But when I think of Gandhi, I think of Jesus Christ. He lives his life, he speaks his words, he suffers, strives, and will some day nobly die, for his kingdom upon earth."

† There have been many times when I did not know which way to turn. But I have gone to the Bible, and particularly the New Testament, and have drawn strength from its message." —'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিত এস, ডব্লিউ, ক্লেমসের প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

মর্যাদা দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠাবোধ হয়। ইতিহাসের চেয়ে সংকলিত জনশ্রুতি ব'লেই সহজে মনে হয় সেগুলিকে। তাই বুঝি সেগুলিতে অধিকাংশ ঘটনার স্থান, কাল এবং বিবরণ ভিন্নরূপ দেখা যায়। কেবল তাই নয়, এই জীবনীগুলিতে অলৌকিক ঘটনার বিবরণী এতো বেশি যে, সেগুলির মধ্যে সত্যিকারের মানুষ যিশু অতি সহজেই হারিয়ে যান। বাস্তবিক পক্ষে, মানুষ যিশুকে গোপন ক'রে তাঁকে অলৌকিক ক'রে তোলার একটি গভীর বাসনা-ও এই জীবনীগুলির পশ্চাতে কেবলই সারাক্ষণ উঁকি দিতে থাকে। সেণ্ট জন তাঁর খৃস্টের জীবনীতে এই উদ্দেশ্যকে গোপন করার কোনো চেষ্টা-ও করেন না; তিনি স্পষ্ট বলেছেন:

"But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God..." (St. John XX, 31)

তাই খৃস্টের এই চারিটি জীবনীই পরিণত হয়েছে অলৌকিকতার অরণ্যে। সেখানে লৌকিক খৃস্টকে সন্ধান করা পরম দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। তাই পাশ্চাত্য দেশের মানুষরা যখন যুক্তিবাদী হ'য়ে উঠলেন, তখন তাঁরা এই জীবনীগুলিকে ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সহকারে 'ঐতিহাসিক' এবং 'যুক্তিসম্মত' ক'রে তুলতে চাইলেন। তাঁরা যে কেবল অলৌকিকের চেয়ে লৌকিককে এবং অপার্থিবের চেয়ে পার্থিবকে প্রাধান্য দিলেন তাই নয়, তাঁরা খৃস্টের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার ও বাণীর উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে সেগুলিকে স্ব স্ব কালের উপযোগী এবং স্ব স্ব যুক্তির সমর্থক হিসাবেই প্রচার করলেন। এঁদের মধ্যে রেণাঁ, ভল্‌তের, টমাস পেইন, টলস্টয় এবং বার্ণার্ড শ'র কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। এঁরা সবাই খৃস্টকে 'ঐতিহাসিক' করার নামে নিজেদের কালের ইতিহাসকে গ'ড়ে তোলার

চেষ্টা করেছেন মত্র। খৃস্টের মূল জীবনী চারটিতেই খৃস্টের এমন সমস্ত বাণী 'সংরক্ষিত' আছে, যেগুলি স্বতঃবিরোধী। তাই আধুনিক যুক্তিবাদী লেখকরা খৃস্টের জীবনী লিখতে গিয়ে এই স্বতবিরোধী বাণীগুলির কতকগুলিকে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছেন, এবং বাকীগুলিকে সন্দেহের সংগে পরিত্যাগ ক'রে খৃস্টকে স্বতবিরুদ্ধতার হাত থেকে 'নিষ্কৃতি' দিয়েছেন। তাঁরা এই ভাবে খৃস্টের জীবনের মধ্যে 'লজিক' খুঁজতে চেষ্টা ক'রে সৃষ্টি করেছেন এক একটি 'লজিক্যাল' খৃস্ট। সুতরাং তাঁদের সৃষ্ট খৃস্ট তাঁদের কালের উপযোগী হ'লে-ও যে সম্পূর্ণ বা সত্যিকারের খৃস্ট হন নি, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কিন্তু বস্তুত, খৃস্টের জীবন ও বাণীতে যে স্বতবিরুদ্ধতা দেখা যায়, সেই স্বতবিরুদ্ধতা তাঁর এককালীন অস্তিত্বের নির্ভুল প্রমাণ মাত্র। দ্বন্দ্বময় শ্রেণীময় সমাজে থেকে তিনি যে-জীবন যাপন ক'রেছিলেন, যে-দর্শন প্রচার করেছিলেন, তা স্বতবিরুদ্ধ না হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। গান্ধীজি যদি সেই যুগের মানুষ হতেন, যখন রচনা-শিল্পের বা তথ্যের দিক থেকে ইতিহাস এমন উন্নত হয়নি, তবে গান্ধীজির জীবন ও বাণী এই তথাকথিত যুক্তিবাদীদের বিভ্রান্ত ক'রে দিতে যথেষ্ট ছিল। গান্ধীজিকে আমরা যখন তাঁর দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করি, তখন তাঁর কার্যে ও বাণীতে অনেক সময় এমন স্বতবিরুদ্ধতা দেখি যে, হাজারো বছর বাদে মানুষ তাঁকে 'অনৈতিহাসিক' বলে ভাবতে পারেন। তখন তাঁরাও হয়তো গান্ধীজির স্বতবিরুদ্ধ কাজ ও কথাগুলিকে ঝেড়ে মুছে একটি 'ঐতিহাসিক এবং যুক্তিসংগত গান্ধী' খাড়া ক'রে তোলার চেষ্টা করবেন। কিন্তু, বস্তুত, খৃস্ট বা গান্ধীকে তাঁদের সত্যিকারের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় প্রত্যক্ষ করতে হ'লে, তাঁদের এই স্বতবিরুদ্ধতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই করতে হবে। কারণ, খৃস্ট এবং গান্ধী দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করলে-ও

প্রকৃত পক্ষে দ্বন্দ্বশীল সমাজেরই মানুষ, এবং এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তাঁরা সচেতন না থাকায় দ্বন্দ্বের বিরুদ্ধ তরংগাঘাতকে তাঁরা এড়াতে পারেন নি। তাই তাঁদের জীবনে, তাঁদের দর্শনে দ্বন্দ্ব এবং স্বতবিরুদ্ধতা তাঁদের অজ্ঞাতেই পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, সত্যিকারের যুক্তিসম্মত ঐতিহাসিক খৃস্ট বা গান্ধী হলেন স্বত-বিরুদ্ধ। এবং এই স্বতবিরুদ্ধতা তাঁদের কাপট্য নয়—তাঁদের আন্ত-রিকতারই প্রমাণ!

জুডিয়ার রাজা হেরডের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আর্কেলস জুডিয়া থেকে বিতাড়িত হন এবং জুডিয়া সরাসরি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্বে রাজা হেরডের অধীনে জুডিয়া যখন রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখনই সেখানে রোমান সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত অসংকীর্ণ সংস্কৃতির বন্যা এসেছিল। হেরডের পর সেই সাংস্কৃতিক প্রবাহ একদিকে যেমন ব্যাপকতর এবং গভীরতর হোলো, অন্য দিকে তেমনি রাজকরের গুরু-ভার বহনের ফলে ইহুদিদের মধ্যে দেখা দিলো প্রবলতর দারিদ্র্য, সংকীর্ণতর জাতীয়তাবোধ এবং হিংসাত্মক জাতীয় চিন্তা।* এমনি একটি বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই খৃস্টের জীবন ও বাণীগুলি পরিণতি লাভ করেছিল। তাই খৃস্টের বাণীর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি, একই সংগে হিংসাত্মক ও অহিংসাত্মক বাণীর প্রচার, একই সংগে দারিদ্র্যের স্তুতি ও দীনতায় সান্ত্বনা,—বিচারক ভগবানের নির্মম অমোঘ দণ্ড, বিচারবিহীন ক্ষমা। গান্ধীজির মধ্যে-ও এই স্বতবিরুদ্ধতা আমরা সহজেই লক্ষ্য করি। কারণ, তিনি একদিকে যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিশ্বমানবিকতা এবং

---

* ৬০-৭০ খৃস্টাব্দে ইহুদিরা রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিদ্রোহ করেন।

শান্তির বাণীতে হয়েছিলেন উদ্বুদ্ধ* অন্যদিকে তেমনি ছিলেন জাতীয় সংগ্রামের অধিনায়ক। তাই শান্তি ও সংগ্রাম একই সংগে তাঁর মধ্যে মূর্তি লাভ করেছে। তিনি শোষক ও শোষিত, উভয়ের ভিন্নমুখী সংগ্রামের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই তিনি এক দিকে যেমন ছিলেন রাষ্ট্র-বিরোধী, তেমনি অন্য পক্ষে আবার ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠক। তাই তাঁর ধর্ম একদিকে যেমন পৃথিবীর সকল ধর্মকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে-ও আবার হিন্দু ধর্মকে গোঁড়া হিন্দুর মতোই

* সাম্রাজ্যবাদ যখন বিশ্ব শোষণে বহির্গত হোলো, তখন তার সংগে গেল বিশ্ব-মানবিকতা, শান্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী। এমনিভাবেই আন্তর্জাতিক পুঁজিতন্ত্র একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির জন্ম দিলো। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে-ও যেমন অন্ধকার জগৎ তীব্রভাবে আলোকিত হ'য়ে ওঠে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অগ্নিকাণ্ডের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ লাভ করলো তার রবীন্দ্রনাথকে। ভারতবর্ষে জন্ম নিলো এক বিশ্ব-সাহিত্য, এক বিশ্ব-সংস্কৃতি। তাই রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর কাছে আমরা বিশ্ব-মানবিকতা, ত্যাগ, করুণা ও তিতিক্ষার যে তীব্র আলোক পেলাম, তা জাতীয় জীবনের উৎসবের আলোক-সমারোহ থেকে নয়,—তা আমরা পেলাম সমগ্র জাতির জীবনে যে আগুন জ্বলেছিল, তারই প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত থেকে। তাই সে আলোর স্তুতি আমরা যতোই করলাম, জাতির অগ্নিকাণ্ড ততোই বিপুলতরো হয়ে উঠলো। তবে এ-কথা-ও স্বীকার্য যে, দুর্গম সূচিভেদ্য তমিস্রার চেয়ে অগ্নিকাণ্ডের আলো-ও শ্রেয়। সেই আলোতেই মানুষ অগ্নিনির্বাপক বারির সন্ধান পাবে। তাই রবীন্দ্রনাথের গান ও গান্ধীর দান আমাদের এতো আদরের!

এই প্রসংগে মার্ক্‌স্‌ এবং এংগেল্‌স্‌-এর কথাগুলি স্মরণীয়:

"The bourgeosie has through its exploitation of the world market given a cosmopolitan character to production and consumption in every country...and as in material, so also in intellectual production. The intellectual creations of individual nations become common property. National one-sideness and narrow-mindedness become more and more impossible, and from the numerous national and local literatures there arises a world literature."—**The Communist Manifesto.**

করেছিল জাহির। তিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতীয় জাতীয়তা-বাদী—একই সংগে!

পৃথিবীর সকল ধর্ম শাস্ত্রেই আমরা দেখি, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অংশকে প্রক্ষিপ্ত ব'লে ঘোষণা করা হয় এবং সেগুলির সত্যতা বা সাধুতা স্বীকার করা হয় না। খৃস্টের মূল জীবনীগুলির মধ্যে স্বতবিরুদ্ধতা লক্ষ্য করলে সহজেই মনে হ'তে পারে যে সে-গুলির বহু অংশ প্রক্ষিপ্ত। খৃস্টের বাণীর মধ্যে স্বতবিরোধিতার একটি প্রধান কারণ আমি পূর্বেই নির্দেশ করেছি। তাছাড়া প্রক্ষিপ্ত অংশ যদি বা কিছু থাকে, সেগুলিকে অসত্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ নেই। সেগুলি বিভিন্ন কালের চরণচিহ্ন মাত্র।

ইউরোপে খৃস্টের বাণীর বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন কালে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে, আমরা লক্ষ্য করি। নিউ টেস্টামেণ্টে খৃস্টের মুখে অনেক হিংসাত্মক বাণীর-ও সন্ধান মেলে। খৃস্টান ধর্মযুদ্ধ থেকে হিটলারি যুদ্ধ পর্যন্ত সকল হিংসাত্মক সংগ্রামের কালেই প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকে মূল সত্য ব'লে প্রচার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় খৃস্টের কয়েকটি বাণী, যা মঁসিয়ে নাপলেওঁ থেকে হের হিটলার পর্যন্ত যুদ্ধনীতিকরা সকলে সহজে ব্যবহার করতে পারতেন:

খৃস্ট বলেন:

"Think not that I am come to send peace on earth: I come not to send peace, but a sword." (Matt x. 34)

"ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি বিস্তার করতে এসেছি: আমি বিস্তার করতে এসেছি শান্তি নয়—তরবারি।"

"I am come to send fire on earth ;...Suppose ye

that I am come to give peace on earth ? I tell you, Nay, but rather divison." (Luke xii 49,51)

"আমি পৃথিবীতে আগুন ছড়াতে এসেছি। তোমরা কি ভাবো যে আমি এসেছি পৃথিবীকে শান্তি দিতে ? না, আমি তোমাদের বলছি, আমি দিতে এসেছি শান্তি নয়—বিচ্ছেদ।"

"And he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one." (Luke xxii. 36)

"এবং যার তরবারি নাই, সে তার পরিচ্ছদ বিক্রয় ক'রে একখানি তরবারি ক্রয় করুক।"

এই কথাগুলি নিঃসন্দেহে আর্ম্‌স্ ফ্যাক্‌ট্রিগুলির তরফ থেকে স্বচ্ছন্দে ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন হিসাবে প্রচার করা যেতে পারে !

"If thy brother trespass against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him." (Luke xvii. 3)

"যদি তোমার ভাই তোমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাকে তিরস্কার করো ; যদি সে অনুতাপ করে, তাকে ক্ষমা করো।"

["তিরস্কার করো" এবং "যদি অনুতাপ করে" কথাগুলি লক্ষ্য করুন।]

"But I say unto ye, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment." (Matt. v. 21)

"আমি তোমাকে বলছি, বিনা কারণে কেউ যদি তার ভাইএর প্রতি ক্রুদ্ধ হয় তবে বিচারের কালে তার বিপদের কারণ হবে।"

["বিনা কারণে" কথাগুলি লক্ষণীয়।]

খৃস্টের এই ধরণের বহু বাণীই 'নিউ টেস্টামেণ্টে' ছড়িয়ে রয়েছে।

এগুলি যুদ্ধের বা হিংসার সমর্থনে ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট। কেউ যদি খৃস্টের অন্যান্য বাণী সম্পর্কে সচেতন না থেকে কেবলমাত্র উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলি পড়েন, তবে সহজেই তাঁর মনে হবে, যিশু খৃস্ট ছিলেন হিংসার পূজারী, এবং নাপলেঅঁ বা হিটলার তাঁরই বাণী-বাহক। তাই আজকের পৃথিবীতে যখনই যুদ্ধ বাধে এবং খৃস্টান জাতিগুলির নিজ নিজ স্বার্থে আঘাত পড়ে, তখনই উচ্চতম পোপ থেকে ক্ষুদ্রতম পাদ্রী পর্যন্ত সবাই সৈন্যসংগ্রহের বা সমর-সম্ভার উৎপাদনের ব্যাপারে সাহায্যার্থে এই ধরণের বাণীগুলিরই আশ্রয় নেন।

লেনিন ও স্টালিন যদি মার্ক্সবাদী না হয়ে খৃস্টান হতেন, তবে তাঁরাও দেশের মুষ্টিমেয় ধনিক শোষকের বিরুদ্ধে অসংখ্য জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার জন্যে অতি সহজেই খৃস্টের বাণী থেকেই সাহায্য নিতে পারতেন। রুশ বা চীনদেশের গণ-বিপ্লবের রূপটিকে সমগ্র জাতির ব্যবচ্ছেদ-চিকিৎসার সংগে তুলনা করা চলে। রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে আমি এই তুলনা পূর্বে-ও করেছি।

এই সম্পর্কে খৃস্টের নিম্নলিখিত বাণীগুলি লক্ষ্য করুন :

"And if thy right eye offend the, pluck it out, and cast it from thee : for it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell."

"And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee : for it is profitable for thee that one of the members should perish, and not that thy whole body should be cast into hell."

(Matt. v. 29.30 ; Mark ix, 43, 45, 47)

"এবং তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমায় পীড়া দেয়, তাকে উৎপাটিত ক'রে তোমা থেকে দূরে নিক্ষেপ করো ঃ কারণ, তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে তোমার একটি অংশ বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়। এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমায় পীড়া দেয়, তা কর্তন ক'রে তোমা থেকে দূরে নিক্ষেপ করো ঃ কারণ, তোমার সমগ্র দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হবার চেয়ে তোমার একটি অংশ বিনষ্ট হওয়াই শ্রেয়।"

বাইবেলের এই কথাগুলি কি ব্যক্তির, কি জাতির উভয়ের ব্যবচ্ছেদের বিষয়েই সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আধুনিক খৃস্টান সার্জনরা, যাঁরা ব্যবচ্ছেদের ব্যবসায় ক'রে জীবিকা উপার্জন করেন, তাঁরা বিনা দ্বিধায় খৃস্টের এই বাণীগুলিকে দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজেদের ড্রইং রুমে বা অপারেশন থিয়েটারের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারেন। তাতে তাঁদের বিবেক ও ব্যবসায়, দুয়েরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে!

কিন্তু গান্ধিজী খৃস্টান হলেও তাঁর নিজের এবং তাঁর কালের সুবিধা মতো ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে খৃস্টের এই বাণীগুলিকে অকুণ্ঠিত চিত্তেই এড়িয়ে গেছেন। গান্ধীজি জাতির জীবনেও যেমন ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে-ও। বার্ণার্ড শ-ও ব্যবচ্ছেদ চিকিৎসার বিরোধী। অবশ্য, জাতির জীবনে শ নিঃসংকোচে এই ব্যবচ্ছেদের বাণীকে প্রয়োগ করতে না চাইলেও, এ-বিষয়ে তাঁর যে দ্বিধাগ্রস্ত বিশ্বাস ছিল, তা নিঃসন্দেহ। তাই গান্ধীজি যখন বলসেভিজমের ঘোরতর বিরোধী, তখন বার্ণার্ড শ তার উচ্ছ্বসিত প্রচারক। *

* বার্ণার্ড শ ও সিডনি ওয়েবের সেই বিখ্যাত কথাগুলি স্মরণীয় : "Lenin's side is our side"

বিপ্লবীরা কেবল যে উপরোক্ত রূপক থেকেই সহজে তাঁদের কাজের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারতেন এমন নয়। সশস্ত্র বিপ্লবের অনুকূলে আরো এমন বহু বাণীই বাইবেলে পাওয়া যায়।* কারণ, খৃস্টের ভগবান যেমন জেহোভাকে ছেড়ে অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেন নি, তেমনি খৃস্টের বাণীর মধ্যেও নোয়া এবং মোজেজ-এর বাণীর প্রতিধ্বনি প্রায়ই সুস্পষ্টভাবে শ্রুত হ'য়ে থাকে!

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি, খৃস্টের বাণীগুলিকে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। খৃস্টান দেশগুলিতে এরূপ ব্যবহারও সর্বদা হয়েছে, এবং হচ্ছে। দেশে যখনই আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার—অর্থাৎ বাধাহীন শোষণের—ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা দেখা গেছে, তখনই সেই সমাজে শ্রেণী-বিদ্বেষকে বিদূরিত করার জন্যে খৃস্টের অহিংসা, ক্ষমা এবং সহনশীলতার বাণীগুলির উপর অধিক পরিমাণে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একথাও স্মরণীয় যে, ঐ সময়ে ঐ সমাজের যে সমস্ত প্রতিভা ঐ সকল বাণীর প্রচারক হিসাবে দেখা দিয়েছেন, তাঁরা যে কোনো প্রকার স্বার্থ-সিদ্ধির অসদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ওই কাজ করেছেন, তাও নয়। তাঁরা বোঝেন নি যে, একটি অর্থনীতিক বিধানের প্রচার তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে মাত্র। তাই জনসাধারণের কল্যাণকল্পে তাঁদের সমস্ত মাংগলিক আন্তরিকতা এক দিকে যেমন জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রতারিত করেছে তাঁদের নিজেদেরকেও।

বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিণতি হিসাবে শাসক-শোষকরা যখন স্বদেশে ও

* যথা: "And now also the axe is laid unto the root of the trees! Every tree therefore which bringeth not forth **good fruit** is **hewn down**; and **cast** into the fire." **(Luke III, 9)**

সাম্রাজ্যে জনসাধারণকে শান্ত থেকে 'জাতির কল্যাণে' ত্যাগ ও তিতিক্ষা অনুশীলনের উপদেশ দিতে চেয়েছে, তখনই তাদেরই শিক্ষায় ও দীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ধর্মপরায়ণ ও সংস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরাও অনেকক্ষেত্রে নিজেদের অগোচরেই শান্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণীর প্রচারক হ'য়ে উঠেছেন। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁরা যখন শোষক-গোষ্ঠীর হাতে তাদের প্রচার-যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হ'য়েছেন, তখনও তাঁদের নিঃস্বার্থ মানবহিতৈষিতা জন-সাধারণের করুণ বেদনাতে তাঁদের হৃদয় বিগলিত করেছে। ফলে, তাঁরা এক-দিকে যেমন ত্যাগ ও তিতিক্ষার বাণী প্রচার ক'রে পরোক্ষে শোষক-শ্রেণীর সাহায্য ক'রে বসেছেন, তেমনি অন্য দিকে দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত জনসাধারণের সেবায় ও সান্ত্বনায় করেছেন আত্মনিয়োগ—তাদের দিয়েছেন পরকালের স্বর্গের ভরসা, বর্তমানকে অবহেলায় উৎসর্গ করার শিক্ষা ও সাহস। এমনি ভাবেই এই নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা বিনা দ্বিধায় হয়ে উঠেছেন ত্যাগ ও তিতিক্ষার উপাসক : শান্তিবাদী, বুর্জোয়া সমাজতন্ত্রী—লেনিন যাঁদেরকে রূঢ় হলেও যথার্থ-ই বলেছেন : "hired coolies of the pen of imperialism and the petty-bourgeois reactionaries."*

তাই এই সকল তথাকথিত শান্তিবাদী সমাজতন্ত্রীরা খৃস্টের জীবন ও বাণী থেকে এমন সমস্ত ঘটনা ও বাণী সংগ্রহ করেছেন, যা ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং সহনশীলতার প্রচার করে, দারিদ্র্যকে গ্রহণের জন্যে উৎসাহ দেয়, মানুষ ভাই-ভাই এই ভাঁওতায় শ্রেণী-চেতনাকে চাপা দিয়ে শ্রেণীময় সমাজকে চিরস্থায়ী করতে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সাহায্য করে। তাঁরা

* তাই বর্তমান ভারতবর্ষে যখন জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি বুর্জোয়া সমাজ-তন্ত্রীরা মার্কস্ ও লেনিনের সুপরীক্ষিত পথে অগ্রসর না হয়ে গান্ধীর ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথে অগ্রসর হতে চান এবং জনসাধারণকে ধর্ম-অনুশীলনের উপদেশ দেন, তখন বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকে না।

অহিংসা এবং ত্যাগ ও দারিদ্র্যের স্তুতিকেই খৃস্টের শ্রেষ্ঠতম বাণী ব'লে বিজ্ঞাপিত করেন—প্রপীড়িত জনসাধারণকে বোঝান যে, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়েই পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠের উদয় হবে। এই শ্রেণীর বহু প্রচারকের জন্ম হয়েছে পৃথিবীতে। আধুনিককালে তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন টলস্টয় ও গান্ধী। এবং এই দু'টী মানুষের মধ্যে এই প্রচার এমন একটি সৌম্য-সমাহিত গাম্ভীর্যের রূপ নিয়েছে, যা বিস্মিত করেছে কোটী কোটী মানুষকে—স্তম্ভিত করেছে, বিভ্রান্ত করেছে।

বাইবেলের প্রথম পাঠ গান্ধীজি টলস্টয়ের কাছেই পেয়েছিলেন। এই পাঠ গান্ধীজির পক্ষে খুবই উপযোগী হয়েছিল। টলস্টয় খৃস্টের ত্যাগ ও অহিংসার বাণীকেই শ্রেষ্ঠ এবং সত্য ব'লে বেছে নিয়েছিলেন। আর এই দু'টী বাণীই গান্ধীজির যৌবনের শিক্ষিত ভারতবর্ষে অত্যন্ত সহজে গ্রহণীয় ছিল।

পূর্বে আমরা খৃস্টের হিংসাত্মক (!) বাণীরও কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু সেগুলি সম্পর্কে টলস্টয় এবং গান্ধী এমন নির্বিকার যে, সেগুলি যে নিউ টেস্টামেণ্টের পৃষ্ঠার কোথাও আছে, সে কথা যাঁরা নিউ টেষ্টামেণ্ট পড়েন নি, তাঁদের কাছে নিতান্তই সন্দেহের ব্যাপার হয়ে উঠবে।

টলস্টয় ও গান্ধী তাঁদের স্বকীয় কালের ও স্বকীয় শ্রেণীর উপযোগী হিসাবে খৃস্টের যে সমস্ত বাণীকে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেছিলেন, নিম্নে সেগুলির কয়েকটি দেওয়া গেলো :

"But I say unto you, That ye resist no evil : but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also."

"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরো না ; কেউ

যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, অপর গালটি-ও তবে তার কাছে পেতে দাও।"

"But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and prosecute you ;..."

"কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, শত্রুকে তোমরা ভালোবাসো ; যে তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাকে আশীর্বাদ করো ; যে তোমাদের ঘৃণা করে, তার মংগল কামনা করো ; যে তোমাদের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহার করে, অত্যাচার করে, তার জন্যে প্রার্থনা করো।"

এই সকল বাণীর আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আজকের দ্বন্দ্বশীল শ্রেণীময় সমাজে এর প্রচার জনসাধারণের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সহায়ক হয়েছে বেশী। ফলে, এর ব্যবহারিক অর্থ এই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে, শাসক যদি তোমার উপর অত্যাচার করে, তা নীরবে সহ্য করো—আরো অত্যাচারিত হও। শত্রুকে ক্ষমা করো, শোষককে নিঃস্ব হ'য়ে শোষণের সুযোগ দাও। (বুদ্ধের জাতকগুলির মধ্যে-ও এই ধরণের বহু কাহিনীর সন্ধান মিলে। পরবর্তী কালে শোষক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন বৌদ্ধ ধর্মের সকল চিহ্নকে ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করতে চেয়েছিল, এই ধরণের আত্মত্যাগের বৌদ্ধ কাহিনীগুলিকে কিন্তু তারা জীইয়ে রেখেছিল সযত্নে। গীতার প্রচারবাণীর উদ্দেশ্য-ও ছিল এই।) ফলে, পার্থিব থেকে অ-পার্থিবের দিকে জনসাধারণকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে—দেহ থেকে আত্মার দিকে। শোষকের শোষণে তোমার উদরে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই। কিন্তু তাতে কি ? অন্নহীনতায় বস্ত্রহীনতায় আত্মার কোনো অমংগল হয়

না। অনাহারে, অত্যাচারে, অপুষ্টিতে, অস্বাস্থ্যে যদি তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মরে, এমন কি যদি তুমি নিজেও মরো, তবু নীরবে সহ্য ক'রে যাও। কারণ, তোমার বা তোমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার তো মৃত্যু নেই—আত্মা অমর। মানুষ তো মরে না, কেবল দেহত্যাগ করে! তাই শাসক ও শোষকের পক্ষ থেকে জনসাধারণের আত্মার 'উন্নতির' জন্যে কতো সতর্কতা, কি ভয়াবহ প্রচার! খৃস্টের বাণীতে তার সমর্থনও মেলে:

"And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul." (Matt. x, 28)

"যারা আত্মাকে হত্যা করতে পারে না, এবং কেবল দেহকেই হত্যা করে, তাদের ভয় করো না।"—দেহ নয়, আত্মা; অন্ন নয়, মোক্ষ; অর্থ নয়, পরমার্থ!

তাই আজকের পৃথিবীতে যারা দুটি অন্নের ব্যবস্থা করে না, রোগের ঔষধ দেয় না, আত্মিক শক্তি নিয়েই তাদের বড়ো কারবার। যারা দুটি খেতে চায়, পরণের একখানি বস্ত্র চায়, ওদের প্রচারে তারা হয়ে ওঠে এক একটি ভয়াবহ প্রাণী—বস্তুবাদী, **materialist.** আর যারা আত্মার নামে দেহকে অস্বীকার করে, পরকালের নামে মানুষকে ইহকাল থেকে করে বঞ্চিত, পরমার্থের নামে সাধারণের অর্থকে করে আত্মসাৎ, তারা এবং তাদের প্রচারকরাই হয়ে ওঠে—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, এক একটি আদর্শবাদী—**idealist.** এই হোলো আদর্শবাদ ও বস্তুবাদের গোড়ার কথা।

সুতরাং আসে ত্যাগের প্রশ্ন। অসংখ্য জনসাধারণ স্বেচ্ছায় ত্যাগ না করলে, মুষ্টিমেয় শোষক তা আত্মসাৎ করে কেমন ক'রে? সুতরাং ত্যাগের মহিমা বেড়ে যায়—জমিদার টলস্টয় এবং বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার

গান্ধী কৃষক সেজে দরিদ্র-পণা করেন।* তাঁরা বারেকের জন্যে কল্পনাও করেন না যে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ এবং সত্যিকারের ত্যাগী হলে-ও সমাজগতভাবে নিজেদের অজ্ঞাতেই একটি বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থের প্রচারক হয়ে উঠেছেন। তাই তাঁরা সংকোচহীন চিত্তে 'খৃস্টান সাম্য-বাদের' প্রচারে লেগে যান। বাইবেল থেকে খৃস্টের বাণীর কোটেশন চলতে থাকে :

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust dost corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break througth nor steal." (Matt. vi. 19, 20)

"তোমাদের সম্পদ তোমরা পৃথিবীতে সঞ্চয় ক'রো না। কারণ, পৃথিবীতে শ্যাওলা ধরে, মরচে পড়ে, চোর আসে, চুরি যায়। তোমাদের সম্পদ তোমরা সঞ্চিত করো স্বর্গে—যেখানে শ্যাওলাও ধরে না, মরচেও পড়ে না, চোরও আসে না, চুরিও যায় না।"

কথাগুলিতে ধনরত্ন সঞ্চয়ের নিন্দাই করা হয়েছে। আজকের সমাজের সমস্ত অন্যায়, অত্যাচার, দুঃখ ও দৈন্যের জন্যে আমরা মূলত দায়ী করি পুঁজিকে—যে পুঁজির জন্ম হয়েছে সঞ্চয় থেকে, সে সঞ্চয়ের উৎস বঞ্চনা কিম্বা উদ্বৃত্তি যার মধ্যেই থাক। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই বাণীর প্রচার, পুঁজির বিরুদ্ধে প্রচার ব'লেই মনে হবে। কিন্তু কার্যত এই প্রচার থেকে যে ফসল উঠেছে, তার রূপটা সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, এই বাণীতে কোটী

* "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যগ্রহ যুদ্ধের সময় আমার পোষাক পরিচ্ছদ যতোটা গিরমিটিয়াদের মতো করা যায়, করেছিলাম।"—গান্ধীজির 'আত্মকথা'।

কোটী জনসাধারণ, যারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা পায় সান্ত্বনা, তারা শান্ত হয়, এবং সেই সুযোগে মুষ্টিমেয় সঞ্চয়ীরা সমাজে সর্বনাশের আগুন জ্বালাতে থাকে। তাই খৃস্ট যেমন পৃথিবীতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, তেমনি পারেন নি গান্ধীজি। তাঁদের ত্যাগ ও অসঞ্চয়ের বাণীই হয়ে উঠেছে বঞ্চনার অস্ত্র। (তাই খৃস্টান ধনিকরা দেশে দেশে গির্জা গড়িয়ে দেন, করেন বাইবেল বিতরণ। আর গান্ধীবাদী (!) ভারতীয় ধনিকরা প্রচার করেন সস্তায় গান্ধী-সাহিত্য।) প্রতিরোধহীন ত্যাগের বাণী দস্যুকে ত্যাগী করে না। যারা বঞ্চিত, তাদের আত্মতৃপ্তির এবং অপৌরুষের সুযোগ দেয়।

খৃস্ট যখন বলেন বা গান্ধিজী যখন পুনরাবৃত্তি করেন যে, "It is easier for camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God" (Mark. x, 25), তখন স্বর্গ-প্রবেশের জন্যে খৃস্টান ধনীদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা দেখা যায় না, তেমনি দেখা যায় না গান্ধীবাদী পুঁজিপতিদের মধ্যে। কারণ, পৃথিবীতে এমনি ভাবে শোষণ, শাসন আর লুণ্ঠন চালাবার সুযোগ থাকলে স্বর্গে যাবার ইচ্ছা তাঁদের মোটেই থাকে না! পৃথিবীই তাঁদের স্বর্গ। অন্যপক্ষে, যারা সমস্ত জীবন ধ'রে দুঃখ সইলো, দৈন্যের সংগে দ্বন্দ্ব করলো, পৃথিবী তাদের কাছে নরক—স্বর্গের সান্ত্বনা তাদের বঞ্চিত জীবনের একমাত্র আশ্রয়, তাদের পরমতম নিষ্কৃতি। তাই তাদের নিঃস্বতাকে তারা বলে ত্যাগ, বলে বিত্তের চেয়ে বড়ো চিত্ত, উদরের চেয়ে আত্মা। তারা তাদের ক্লীবত্বের তোষণ করে, নিজেদের দেয় সান্ত্বনা, প্রচার করে শান্তি : অর্থলোভী হোয়ো না ; ধনিকরা যখন কৃপাপরবশ হ'য়ে তোমাদের শোষণ করে এবং শোষণের দ্বারা তোমাদের বিত্তের ভার হরণ

করে, তখন ক্রুদ্ধ হোয়ো না, বরং হোয়ো কৃতজ্ঞ। তখন তারা খৃস্টের কথা স্মরণ করে, স্মরণ করে গান্ধিজীর বাণী : কেউ যদি তোমার সম্পত্তি প্রতারণা বা বলপ্রয়োগের দ্বারা গ্রহণ করে, তার প্রতিবাদ কোরো না, প্রতিরোধ কোরো না, কোরো সাহায্য। "... and him that taketh away thy cloak forbid not to take thy coat also ;" "and of him that taketh away thy goods ask them not again." (Luke vi, 29, 30) এমনিভাবে এই বাণীর ফল সমাজে ও অর্থনীতিতে গিয়ে সুদূর বিস্তৃত হয়ে পড়ে : ধনিকের শোষণে সাহায্য করো, সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের দাও সুবিধা !

দেশে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও স্বদেশী ধনিকদের শোষণ যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, দেশে দেশে শ্রমিক-সমস্যা প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় বেকার, তখন কর্মহীন বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্যে চলে খৃস্টের দোহাই। খৃস্ট বলেছেন : "কর্মের কি প্রয়োজন ?"

"Consider the lilies of the field, how they grow ; they toil not, neither spin." (Matt. vi, 28)

"ক্ষেতের শাপলা দেখো, তারা কেমন বাড়ে। তারা পরিশ্রম করে না, সূতো-ও কাটে না।"

সুতরাং বেকার থাকতে তোমাদের অরুচি কেন ?

গান্ধিজী মুক্তকণ্ঠে ঐ বাণী প্রচার করেন। আমরা লক্ষ্য না ক'রে পারি না, শাপলা ফুল সূতো কাটে না সত্য, কিন্তু গান্ধীজিকে-ও সূতো কাটতে হয় ! গিরমিটিয়া চাষী সাজতে হয় ! সুতরাং যখন মানুষের কাজ জোটে না, বা কাজ ক'রেও জোটে না খাবার, জোটে না বস্ত্র, তখনও আবার খৃস্টের শরণাপন্ন হওয়া চলে :

"Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink ; nor yet for your body, what ye shall put up." (Matt. vi, 25) (Luke xii, 22, 23-ও দ্রষ্টব্য)।

"তুমি কি আহার করবে, পান করবে, পরিধান করবে, সেজন্যে— তোমার জীবনের জন্যে চিন্তিত হোয়ো না।"

অর্থাৎ তোমার ক্ষুধা, তোমার তৃষ্ণা, তোমার শীতাতপের প্রয়োজন— এগুলি তোমার রক্ত মাংসের প্রয়োজন ; এগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ো না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন হয়ে থাকো ;* শীতে কুঁকড়ে মরো, স্যাঁৎস্যাতে বস্তিতে থাকো ; বৃষ্টিতে, রৌদ্রে তোমার মাথার উপরে একখানি ছাদের-ও বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই। আত্মার অন্ন লাগে না, বস্ত্র লাগে না, শীতাতপে আবরণের প্রয়োজন হয় না!† আত্মা ব্যাধিতে ভোগে না, না খেয়ে মরলেও আত্মা মরে না! যে সমাজ এবং অর্থনীতিক ব্যবস্থা কোটী কোটী মানুষকে

* প্রায়োবেশন শ্রেণীসমাজের অন্যতম নীতি। বুর্জোয়া সমাজে ঐ নীতি প্রচারের প্রয়োজন আছে। কারণ একদিকে যেমন অতিভোজন, অন্যদিকে তেমনি অল্পভোজন—অনাহার। যারা অতিভোজন করে, মাঝে মাঝে অনাহার তাদের প্রয়োজন। অন্যপক্ষে, যারা অল্পভোজন করে বা অনাহারে থাকে,— তাদের-ও অনশন প্রয়োজন। কারণ অনশন ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর নেই। সুতরাং বুর্জোয়া সমাজে অনশনের নীতিটিকে চল করার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। গান্ধীজি নিজের অজ্ঞাতসারে শ্রেণীসমাজের শোষণমূলক 'নীতির' বহু সূত্রকেই আংগিকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রায়োবেশনের ব্রতটিকেও সেই নীতিসূত্রগুলিরই শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

গান্ধীজির স্বল্পবস্ত্রতা এবং বেশভূষার পারিপাট্যের বিরোধিতাও এই একই বুর্জোয়া নীতিরই প্রকাশ মাত্র।

† গীতার বাণী স্মরণীয় : মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদা।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥
দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৪ শ্লোক।

অন্নহীন, বস্ত্রহীন, গৃহহীন, বিত্তহীন ক'রে রাখতে চায়, সেখানে মানুষের দেহকে অস্বীকার ক'রে গোটা মানুষকে এক একটা আত্মা বানিয়ে ফেলাই যে নিরাপদ, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সুতরাং শ্রেণী-সমাজে মানুষ হয়ে ওঠে আত্মা* এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ—মহাত্মা !

যাই হোক, এমনি ভাবেই টলস্টয় বা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে যখন মানব সমাজের পরম কল্যাণ করতে চাইলেন, তখন তাঁরা সমাজগতভাবে করলেন ঠিক তার বিপরীত। তাঁরা নিমেষের জন্যেও সন্দেহ করলেন না যে, সম-সাময়িক সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রচারযন্ত্র রূপেই তাঁদের স্ব স্ব জীবন আত্মপ্রকাশ করছে। এবং ব্যক্তিগতভাবে সে জীবন নিষ্কলংক নিষ্কলুষ হওয়ায় তা শোষক সমাজের উপযোগী হয়েছে আরো বেশী। ফলে যাদের জন্যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রচার, তারা হয়েছে বিভ্রান্ত। আলোয় অব-গাহন করতে গিয়ে তারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছে—তারা মুহূর্তের জন্যেও বোঝেনি যে এই ত্যাগ ও তিতিক্ষার আলো—মহামানবতার বাণী—জাতীয় জীবনের এক প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখা মাত্র। প্রেম, অহিংসা, ক্ষমা ও বিশ্বমানবতা—এই মহাজ্ঞানের আলোক তারা চায়, নিত্য দিন চাইবে। কিন্তু সেই সংগে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, সে আলো আমরা চাই শ্রেণী-শোষণের প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ড থেকে নয়—চাই শ্রেণীহীন, শোষণহীন জাতীয় জীবনের উৎসব রজনীর দীপমঞ্চ থেকে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেমন টলস্টয় ও গান্ধীকে বোঝেনি, তেমনি টলস্টয় ও গান্ধীও বোঝেন নি

* রাশিয়ায় গোলামদের বলা হতো "আত্মা"। এই আত্মাদের বেচাকেনা চলতো সমাজে। এই সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নিকলাই গগলের সুবিখ্যাত উপন্যাস "Dead souls" বা "মরা গোলাম" প'ড়ে দেখতে পারেন। তাতে মানুষকে "আত্মা" বানাবার মহিমা অনেকখানি বোধগম্য হবে।

নিজেদেরকে। কারণ, তাঁরা ছিলেন একটি বিশেষ সমাজের, একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রকাশের প্রত্যংগ মাত্র। তাই সেই সমাজ ও শ্রেণীর প্রচার তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের কণ্ঠে ভাষা পেয়েছিল। ফলে, ব্যক্তিগতভাবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার ভিত্তিতে যে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা তাঁরা করতে চেয়েছিলেন, তা কেবল কল্পনাতেই পর্যবসিত হয় নি, তা পরিণত হয়েছিল তাঁদের স্ব স্ব শ্রেণীর উপযোগী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াতে।

লিও টলস্টয়ের মারফৎই গান্ধীজি তাঁর কালের ও শ্রেণীর উপযোগী যে খৃস্টান ধর্মকে গ্রহণ করেছিলেন, তার সংগে তিনি গীতার 'ধ্যায়তো-বিষয়ান পুংসঃ' ইত্যাদি শ্লোকের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করলেন :

"For where your treasure is, there will your heart be also." (Matt. vi, 21) (Luke xii, 34)

"তোমার বিষয় যেখানে থাকবে, তোমার হৃদয়ও থাকবে সেখানে।"

আবার, "No man can serve two masters : ye cannot serve God and mammon." (Matt vi. 24).

"মানুষ দু'জন মনিবের সেবা করতে পারে না : ভগবান এবং কুবেরের সেবা একসংগে অসম্ভব।"

বাস্তবিক পক্ষে, গান্ধীজি তাঁর সমগ্র জীবন পদে পদে খৃস্টকে অনুসরণ, এমন কি, অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। অলৌকিকতার কথা বাদ দিলে খৃস্টের জীবনে দেখা যায়, তিনি মানুষের দুঃখে, বেদনায়, পীড়ায় ব্যথিত একটি মানুষ, করুণায় কাতর, সেবায় ব্যস্ত—a great nurse, গান্ধীজিও খৃস্টের মতোই ছিলেন বিরাট এক শুশ্রূষাকারী। খৃস্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাকে লৌকিক হিসাবে দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি কুষ্ঠ রোগীরও সেবা করেছিলেন। গান্ধীজিও কুষ্ঠ রোগীর সেবা করতেন। খৃস্ট বলেছিলেন :

"And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all." (Mark x. 44).

"তোমাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ হবেন, তিনিই সবার সেবা করবেন।"

খৃস্টের এই বাণীটি গান্ধীজির কাছে বুঝি অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই, কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সমাজ জীবনে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে সর্বত্রই তিনি সেবার বাণী প্রচার ক'রে গেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী বলে ম'নে হয়।*

খৃস্টের জীবনী পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দ্রষ্টাদের বাণীগুলি দিয়ে নিজেকে একদা অত্যন্ত পুষ্ট করেছিলেন এবং পরে যখন তাঁর ধারণা হোলো যে, তিনিই তাঁর পূর্ববর্তী দ্রষ্টাদের বাণীতে বর্ণিত সেই ত্রাণ-কর্তা, পূর্ববর্তী দ্রষ্টারা ত্রাণকর্তার যেমন যেমন বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন,তিনি সেগুলিকে নিজের জীবনেও তেমনিভাবে অনুকরণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। শাস্ত্রে লেখা ছিল, ইস্রায়েলদের ত্রাণকর্তা গাধার পিঠে চ'ড়ে একদা আসবেন। সুতরাং একদা খৃস্টকে নিতান্ত অকারণে এবং অযৌক্তিক

* হিন্দু বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের ফসল হিসাবে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল, বিবেকানন্দের জীবনে তারি প্রতিফলন ঘটেছিল, তা আমরা আগেই বলেছি। গান্ধীজি ছিলেন সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ ফসল। তাই বিবেকানন্দের ধর্মে যে জাতীয়তাবাদ, যে-সেবা আমরা লক্ষ্য করি, তা আরো ব্যাপকতর ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে গান্ধীজির মধ্যে। বিবেকানন্দ ছিলেন শক্তির উপাসক। ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়াদের একাংশ যখন শক্তি-সংগ্রহের উত্তেজনায় চঞ্চল হয়েছে, তখনকার মানুষ তিনি। তাই বিবেকানন্দের অহিংসা সংকীর্ণ, খৃস্টের অহিংসার মতো ; গান্ধী বা বুদ্ধের মতো নয়।

ভাবেই একটা বাচ্চা গাধার পিঠে চড়ে বসতে হোলো।* গান্ধীজিকে-ও আমরা দেখি, খৃস্টের জীবন ও বাণীকে তিনি এমন মূল্যবান ব'লে ভাবতেন যে, নিজের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তিনি খৃস্টকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন।

খৃস্টের জীবন ও বাণীর পাঠ গান্ধীজি প্রধানত পেয়েছিলেন রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিক লিও টলস্টয়ের কাছে। কিন্তু টলস্টয় খৃস্টকে যেভাবে বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই ব্যাখ্যাকেও গান্ধীজি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। সেখানেও তাঁর চয়নপদ্ধতি পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। কারণ, টলস্টয় এবং গান্ধীজি উভয়েই বুর্জোয়া অর্থনীতির ফসল হলেও, তাঁদের উভয়ের মধ্যে স্তর ভেদ ছিল প্রচুর পরিমাণে। কারণ, টলস্টয়ের কালের রাশিয়া এবং গান্ধীর কালের ভারতের বুর্জোয়া অর্থনীতির পরিণতি একরূপ ছিল না। টলস্টয় এবং গান্ধীর মতের মূল পার্থক্য দেখা গিয়েছিল প্রধানত তাঁদের উভয়ের রাষ্ট্র সংক্রান্ত মতামতের মধ্যে।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে শোষক-গোষ্ঠী এবং তাদের শাসন-ব্যবস্থা যখনই অসহনীয় হয়ে উঠেছে এবং দেশময় বিদ্রোহ বা অনানুগত্যের সূচনা বা সম্ভাবনা দেখা গেছে, তখনই রাষ্ট্রীয় উৎপীড়করা জনসাধারণের কাছ থেকে আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণ আদায়ের জন্যে খৃস্টের সাহায্য গ্রহণ করেছেন ঃ

"Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's and unto God the things which are God's". (Matt. xii. 21) (Mark xii. 17) (Luke xx. 25)

* "And Jesus, when he had found a young ass sat thereon; as it is written, Fear not daughter of Sion; behold thy King cometh sitting on an ass's colt" (John xii. 14, 15)

"যা সীজারের, তা সীজারকে এবং যা ভগবানের তা ভগবানকে দাও।"

খৃস্টের এই বাণী প্রচলিত হয়েছিল বিশেষভাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, যখন রাজতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্র তাদের বিবিধ উৎপীড়ন ব্যবস্থা দিয়ে জনসাধারণকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলেছিল। অবশ্য সীজারের অর্থাৎ সামন্তরাজদের প্রাপ্য কি, বা কতোখানি এবং ভগবানের অর্থাৎ ধর্মরাষ্ট্রের প্রাপ্য কি বা কতোখানি, এ নিয়ে রাজতন্ত্র এবং ধর্মতন্ত্রের মধ্যে বিবাদ প্রায়ই লেগে থাকতো। এই ভাবে খৃস্টের উপরোক্ত বাণীটির জোরেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকটি মানুষের স্কন্ধে দ্বিবিধ দাসত্বের ভার চাপিয়ে দেওয়া হ'য়েছিল। এবং প্রত্যেকটী মানুষকে রাজতন্ত্রের এবং ধর্মতন্ত্রের দু'টী খুঁটিতে আটক রাখা হ'য়েছিল বংশানুক্রমে।

মানুষ ছিল রাজতন্ত্র বা ধর্মতন্ত্রের গোলাম। তারপর যখন বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করলো,তখন বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্র তথা ধর্মতন্ত্রের জোয়াল থেকে জনসাধারণকে 'মুক্তি' দিয়ে তাদের জুড়ে দিতে চাইলো নিজেদের কারখানার ঘানিতে। রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে শুরু হোলো সংগ্রাম। প্রচার হতে লাগলো ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণী—স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্র্য। রাজনীতিতে দেখা দিলো বুর্জোয়া ডেমোক্রাসি এবং ধর্মে প্রোটেস্টান্টিজম্। বুর্জোয়া অর্থনীতি নিজের উন্নতির পূর্ণ প্রকাশের জন্যে একদা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রচার করেছিল, সেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা চূড়ান্তপন্থিতার মধ্যে রূপ নিলো, এলো এনার্কিজম্। ব্যক্তির চেয়ে কোনো প্রতিষ্ঠানকে তারা বড়ো ব'লে মানতে চাইলো না এবং ব্যক্তির নামে তারা সমাজকে অস্বীকার ক'রে বসলো। সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাকে তারা করলো অস্বীকার, ধর্মকে করলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার—মানুষের বিবেকই হোলো ভগবানের

একমাত্র পূজাবেদী ; নরনারীর যৌন-মিলনের জন্যেও সমাজের বা গির্জার অনুমোদন নেওয়ার রীতিকে তারা অযৌক্তিক ব'লে বাতিল ক'রে দিলো।

লিও টলস্টয়েরও এনার্কিস্ট ব'লে খ্যাতি ঘটেছিল। তাঁর মধ্যে বুর্জোয়া ব্যক্তিত্ববাদ গ্রহণ করেছিল একটি চূড়ান্ত রূপ। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী। ব্যক্তিই তাঁর কাছে ছিলো প্রথম ও পরম। তিনি ধর্মতন্ত্রেরও বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ, রাষ্ট্র বা ধর্মতন্ত্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ব্যাহত এবং বিপন্ন করে। ইংলণ্ডে শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতির সাহিত্যে এবং ললার্ডি বা কোয়েকারদের ধর্মে এই একই উগ্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। রুশ দেশেও লিও টলস্টয়ের কিছু পূর্বে তা আত্মপ্রকাশ করেছিল নাইহিলিস্ট এবং ডুখবরদের* মধ্যে। এই ডুখবরদের সংগে একদা টলস্টয়ের কার্যকলাপ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

টলস্টয় তাঁর 'রেসারেক্‌সন' বা 'নবজীবন' উপন্যাস থেকে উপার্জিত

---

* ডুখভৎসি সম্প্রদায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৪০-এর কাছাকাছি সময়ে) খারকভ অঞ্চলে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকের নাম ঠিক জানা যায় না। এঁদের মতে মানুষের অন্তরে ভগবান আছেন। সুতরাং মানুষ যা করে, তা কখনো অন্যায় বা অশুভ হ'তে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রের বা শাসকশ্রেণীর কোনো প্রয়োজন নেই। এই গেলো রাজনীতির দিক। ধর্মেও তাঁরা পোপ বা পাদ্‌রিতে অবিশ্বাসী। কারণ, ভগবানের চোখে পোপ, পাদ্‌রি এবং সাধারণ মানুষ সকলেই সমান, এবং ভগবানের পূজায় সকলের সমান অধিকার। সুতরাং বিবাহ-অনুষ্ঠানে-ও তাঁদের অবিশ্বাস। নর-নারীর পরস্পরের যৌন মিলনের ইচ্ছাই তাঁদের মিলনকে শুভ এবং সুন্দর ক'রে তুলতে পারে। বিবাহের বন্ধন অযৌক্তিক ; তা উৎপীড়ন এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়। তাঁরা হনন কার্যের বিরোধী ; সুতরাং সামরিক বৃত্তির-ও। এই হনন-বিরোধিতা তাঁরা পরে মানবেতর জীবের প্রতিও প্রসারিত করেন। ফলে তাঁরা পশু-হত্যা,

সমস্ত অর্থ এই সম্প্রদায়কে দান করেন। আগেই বলেছি, বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা আসার সংগে সংগে এলো তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং তারই প্রতিফলন রূপে ধর্মে এলো প্রোটেস্টান্টিজম। প্রোটেস্টান্টিজম্ ঘোষণা করলো, ভগবৎ উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তি-সাপেক্ষ। (পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মতোই।) রাজনীতিতে এলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র, ক্রমওয়েল আর নাপলেঅঁ। এমনিভাবেই বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থা ধর্মে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে যে উগ্র সমাজবিরোধী 'ব্যক্তি-স্বাধীনতার' জন্মদান করলো, তারই অন্যতম চূড়ান্ত প্রকাশরূপে আবির্ভূত হলেন লিও টলস্টয়। এনার্কিক পুঁজিবাদের প্রতিফলন রূপে তিনি রাজ-নীতিতে এবং ধর্মে হয়ে উঠলেন এনার্কিস্ট—মানুষের নিজের বিবেক এবং বুদ্ধি ছাড়া আর সকল কিছুর প্রতিই আনুগত্যকে করলেন অস্বীকার। একমাত্র যে রাষ্ট্রের ও ধর্মের প্রতি মানুষের অবারিত আনুগত্য থাকবে, তা মানুষের হৃদয়, তার বিবেক—"behold, the Kingdom of God is within You." তাঁর Kindom of God গ্রন্থে টলস্টয় বলেন:

"He only lives a true life who has transfered his life into the sphere in which freedom lies — in the domain of first causes—that is to say by the recognition and practice of the truth revealed to him."

[দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।]

সুতরাং যদি কেবল ব্যক্তির কাছেই সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে, তবে

পশু-নির্যাতন এবং পশুজ খাদ্যের বিরোধী হ'য়ে ওঠেন। (গান্ধীজির সংগে তুলনা করুন।) এঁরা রাশিয়া থেকে নির্বাসিত হয়ে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

রাষ্ট্রের শাসন ও ধর্মরাষ্ট্রের অনুশাসন মেনে চলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ বিষয়ে-ও তিনি খৃস্টান ধর্মের দোহাই দেন: "The profession of Christianity not only forbids the recognition of State, but strikes at the very foundations." [The Kingdom of God, দশম পরিচ্ছেদ] অন্যত্র: "Christianity is subversive of every Government." [The Kingdom of God, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

গুরু টলস্টয়ের কাছ থেকে গান্ধীজি খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে এই উক্তিগুলিকে সহজেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি জরাগ্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মানুষ হয়েছিলেন, এবং এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর সংগ্রাম। সুতরাং টলস্টয়ের এই রাষ্ট্রবিরোধী কথাগুলি আয়ত্ত করতে গান্ধীজির মোটেই দ্বিধা বা বিলম্ব হয় নি। তাই গান্ধীজিও টলস্টয়ের সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁর 'নীতি-ধর্ম' বা 'Ethical Religion' গ্রন্থে ঘোষণা করেন:

"রাষ্ট্রীয় বিধির সংগে নৈতিক বিধির বড়ো পার্থক্য এই যে, নৈতিক বিধি প্রত্যেক মানুষের আত্মার মধ্যেই জন্মলাভ করে।"

"The great difference between the law of the state aud the moral law is that the latter has its seat in the soul of every man. Truth is within ourselves."

সুতরাং রাষ্ট্রীয় অনুশাসন যখন মানবের অন্তর্নিহিত সেই সত্যের সম্মুখীন হয় এবং বাধার সৃষ্টি করে, তখন রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে অবহেলা ও অস্বীকার করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য হ'য়ে ওঠে।

"Indeed, disobedience to the law of the State

becomes a peremtory duty, when it comes in conflict with the law of God."

কিন্তু এ-বিষয়ে লিও টলস্টয়ের সংগে গান্ধীজির একটি বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। টলস্টয় এবং ডুখবররা খৃস্টের অহিংসার বাণীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সত্য ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের মতে সত্যের উদ্ঘাটন যেমন ব্যক্তিগত হৃদয়েই মাত্র সম্ভব, তার অনুশীলনের পূর্ণতম অধিকারও তেমনি ব্যক্তিরই থাকা উচিত। রাষ্ট্র যখন সামরিক বিভাগে নিয়োগের দ্বারা মানুষকে তার ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও বিবেক থেকে বঞ্চিত করে, তখন সত্যের যে অবমাননা ঘটে, তার তুলনা হয় না। সুতরাং টলস্টয় এবং ডুখবররা যেমন রাষ্ট্রের বিরোধী, তেমনি বিরোধী জনসাধারণকে সামরিক বিভাগে নিয়োগের ও হনন-যজ্ঞে ব্যক্তির বাধ্যতামূলক অংশ গ্রহণের। এইরূপ হত্যাকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্যে রাষ্ট্রীয় আদেশকে বিনা দ্বিধায় লংঘন করার উপদেশ দিয়েছেন তাঁরা। ইংল্যাণ্ডের কোয়েকার বা ফ্রেণ্ড্স্ সম্প্রদায় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার 'Concientious Objector'দের নামও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। হনন কার্য থেকে বিরত থাকার ব্যক্তিগত অধিকারের জন্যে তাঁরা সকলেই প্রাণপণ প্রচার করেছেন। রাষ্ট্রীয় আদেশের অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিবেকের নির্দেশই তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু গান্ধীজি 'অহিংসার পূজারী' হ'য়েও রাষ্ট্রের অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিবেককে কার্যত শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে করেন না। তিনি রাষ্ট্রকে যে পরিপূর্ণভাবে মানেন, তার প্রমাণ, তিনি লেজিটিমিস্ট (legitimist) বা আইনপন্থী। আর আইনপন্থী ব'লেই তাঁর সব চেয়ে বড়ো বিদ্রোহ বা বিপ্লব হলো আইন ভংগ করা—সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স।* কেবল তাই নয়, আমরা লক্ষ্য

* অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে-ও এই একই কথাই বলা চলে। উপ-নিবেশে বুর্জোয়া অভ্যুত্থান মূলত সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সহযোগিতার ভিত্তিতেই

করি, গান্ধীজি যখন অহিংসার বাণী প্রচার করেন, সামরিক প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করেন, তখনও তিনি হনন কার্যের বিপুল উপকরণ—সরকারী পুলিশ ও সামরিক কর্মচারীদের প্রতি রাষ্ট্রের অনুশাসন মেনে চলার উপদেশ দেন—এমন কি ঘৃণ্যতম, নিষ্ঠুরতম হনন কার্যের বেলাতে-ও! এর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা চলে :

১৯৩০ সালের স্বদেশী আন্দোলন। গান্ধীজির অহিংসা সংগ্রামের আহ্বান কেবল মাত্র তাঁর আশ্রমবাসী শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না। তা ভারত সরকারের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীতে-ও প্রসার লাভ করলো। ঐ সময়ে স্থানীয় নেতাদের গ্রেফ্‌তারের ফলে পেশোয়ারে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ তীব্র হ'য়ে উঠলো। এই ক্ষুব্ধ জনতার অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। সুতরাং ভারত সরকার তাঁদের অভিজ্ঞ কূটনীতি অনুসারেই সেই জনতাকে দমন করার জন্যে সেখানে দুই প্লাটুন হিন্দু সৈন্য প্রেরণ করলেন। এই সৈন্যরা ছিল অষ্টাদশ রয়েল গাড়োয়ালী রাইফেলের দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের অন্তর্গত। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে হিন্দু সৈন্যরা পেশোয়ারের মুসলিম জনসাধারণের বিক্ষোভকে নিজেদের দাবীর অংশ ব'লেই ঘোষণা করলো। হিন্দু সৈন্যদল ও মুসলমান জনতা গান্ধীজির অহিংসা এবং মৈত্রীকে স্মরণ ক'রে-ই হয়তো সেদিন হাত মিলিয়ে দাঁড়ালো। সৈন্যরা জনতার ওপর গুলী চালনার সরকারী আদেশকে করলো অমান্য। সাম্রাজ্যবাদী

গ'ড়ে ওঠে। সুতরাং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে দেশীয় বুর্জোয়াদের বিদ্রোহ অসহযোগ রূপেই আত্মপ্রকাশ করে। তাই আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর হাংগেরিতে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে বা বিংশ শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ডে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অসহযোগকেই বিদ্রোহের প্রধানতম অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হ'তে দেখি।

ভারত সরকার ভয় পেয়ে গেলো। অবিলম্বে পেশোয়ার থেকে ভারতীয় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হোলো। ২৫শে এপ্রিল থেকে ৪ঠা মে পর্যন্ত পেশোয়ার স্থানীয় জনগণের আয়ত্তে ছিল। (পরে বৃটিশ সৈন্য এসে ঐ শহর পুনরধিকার করে।) আদেশ-অমান্যকারী সৈন্যদের সামরিক বিধি অনুসারে হোলো কঠোরতম শাস্তি—পনের বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অতঃপর এলো গান্ধী-আরউইন চুক্তি। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, তাতে মুক্তির দাবী ক'রে যে সকল রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির উল্লেখ করা হোলো, তা থেকে অতি সতর্কতার সংগেই গান্ধীজির অহিংস নীতির শ্রেষ্ঠ অনুশীলক, সামরিক বিধি অনুসারে দণ্ডিত, গাড়োয়ালী সৈন্যদের বাদ দেওয়া হোলো। গান্ধীজি গোল টেবিল বৈঠকের জন্যে লণ্ডনে গেলে ফরাসী সাংবাদিক শার্ল পেত্রাশ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই অহিংস সৈন্যদের প্রতি তিনি কোনো সহানুভূতি দেখালেন না কেন। গান্ধীজি এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন, তা শুনলে লিও টলস্টয় এবং দুখবর সম্প্রদায়ের লোকেরা যে লজ্জা পেতেন, আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।* হয়তো গান্ধীজিকে তাঁদের অত্যন্ত দুর্বোধ্য লাগতো। গান্ধীজি বলেছিলেন:

"কোন সৈন্য যখন গুলী চালনার আদেশ অমান্য করে, তখন সে তার

* টলস্টয়ের কথাগুলির সংগে গান্ধীজির কৈফিয়তের তুলনা করুন। টলস্টয় বলেন: "One can never justify an act of violence against one's fellow-men by claiming to have done it in defence of another who was enduring some wrong, because in committing an act of violence, it is impossible to compare the one wrong with the other, and to say which is the greater, that which one is about to commit or the wrong done against one's neighbor."—Kingdom of God, Chap. II.

গৃহীত শপথ ভংগ করে এবং এইরূপে সে নিন্দনীয় ভাবে আদেশ অমান্যের অপরাধে অপরাধী হয়। আমি সামরিক কর্মচারী বা সৈন্যকে আদেশ অমান্য করতে বলতে পারি না। কারণ আমি যখন ক্ষমতার অধিকারী হবো, তখন অনুরূপভাবে আমি-ও ঐ সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যদের ব্যবহার করবো। আজ আমি যদি তাদেরকে আদেশ অমান্য করতে শিক্ষা দিই, তবে আমার মনে হয়, তারা আমার শাসনকালেও আমার আদেশ মানবে না।"

"A soldier who disobeys an order to fire breaks the oath which he has taken and renders himself guilty of criminal disobey ; for when I am in power, I shall in all likelihood make use of those same officials and those same soldiers. If I taught them to disobey I should be afraid that they might do the same when I am in power."

গান্ধীজির উপরের কথাগুলি কিন্তু একান্ত সত্য। টলস্টয় এবং ডুখবরদের সংগে গান্ধীজির যে সামাজিক আর্থনীতিক পরিবেশের সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিল, কেবল তাই তাঁর এই স্বতবিরুদ্ধ নীতি ও রীতির ব্যাখ্যা দিতে পারে। টলস্টয় এবং তাঁর সহধর্মী ডুখবররা যে অর্থনীতিক ব্যবস্থায় মানুষ হ'য়েছিলেন, তা একটি সামন্ততান্ত্রিক, আধা বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী সমাজ—জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, ক্ষীয়মান, ধ্বংসমান। তাই টলস্টয়ের রাষ্ট্রবিরোধী রচনাগুলিতে বা ডুখবরদের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে আমরা একটি গলিত মুমূর্ষু রাষ্ট্রের রূপকেই প্রত্যক্ষ করি—পরবর্তী কালে সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে সে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটবে এবং তারই ভস্ম থেকে জন্মলাভ করবে

সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলি। ঐ সময়কার সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ বুর্জোয়া সমাজে-ও কতক পরিমাণে অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিতে পুষ্ট গান্ধীজি সহজে টলস্টয়ের বাণীগুলিকে গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যপক্ষে আবার তিনি ছিলেন নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের মুখপাত্র—নব ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগঠক। সুতরাং তিনি যখন গলিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্কৃতির আওতায় মানুষ হওয়ার ফলে টলস্টয়ের অহিংসা ও রাষ্ট্রবিরোধিতাকে গ্রহণ করলেন, তখনই তিনি ভারতীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংগঠক হওয়ায় তাঁর পক্ষে টলস্টয় বা দুখবরদের মতো রাষ্ট্রবিরোধী হওয়াও সম্ভব হোলো না। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থান, এই দ্বিবিধ বিরোধী অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি একদিকে যেমন হলেন শান্তিবাদী, অন্যদিকে তেমনি সংগ্রামশীল; একদিকে যেমন রাষ্ট্রবিদ্বেষী,অন্যদিকে তেমনি নবরাষ্ট্র সংগঠনে ব্যাপৃত কর্মী; একদিকে যেমন অহিংসার প্রচারক, অন্যদিকে তেমনি হিংসার সমর্থক। এই প্রসংগে আমাদের একথা-ও মনে রাখা দরকার যে, এই স্বতবিরুদ্ধতা কেবল গান্ধীজির চরিত্রের ব্যক্তিগত ইতিহাস নয়। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং দেশীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের সমগ্র ইতিহাসই এই: শান্তির পথে সংগ্রাম, অহিংসার পথে হিংসা, আইনের পথে আইন-অমান্য,সহযোগের পথে অসহ-যোগ,—রাষ্ট্রবিরোধিতার পথে নব রাষ্ট্রের সংগঠন। এ ক্ষেত্রে-ও আমরা আবার লক্ষ্য করি,বুর্জোয়া এথিক্‌স্ বা নীতিপ্রবচনগুলিকে গান্ধীজি সেগুলির প্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় পোষণ না ক'রেই গ্রহণ করেছিলেন। অংগীকার পালন তাদের অন্যতম। আধা-গোলামরা মাত্র মুষ্টিমেয় সামন্ত প্রভুদের ব্যক্তি-গত সম্পত্তি হ'য়েই ছিল। সুতরাং শ্রমশিল্পের উন্নতির সংগে সংগে যখন শ্রমশিল্প ও কলকারখানার প্রসার হোলো, তখন শ্রমিকের চাহিদা ক্রমেই

চললো বেড়ে। কিন্তু শ্রমিকরা প্রধানত ক্রীতদাস বা আধা ক্রীতদাস রূপে সমাজে তাদের সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই হ'য়েছিল গণ্ডীবদ্ধ। সুতরাং সামন্ততান্ত্রিক শ্রমব্যবস্থা নবজাত বুর্জোয়া শ্রম-ব্যবস্থার উন্নতির অন্তরায় হ'য়ে উঠলো। ফলে দেশে দেশে বুর্জোয়ারা চাইলো শ্রমিকদের মুক্তি—ক্রীতদাস বা আধা-ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ। ধূয়া উঠলো ব্যক্তিস্বাধীনতার—অর্থাৎ নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতার বাজারে বুর্জোয়াদের কাছে শ্রমিকদের আপনার শ্রম বিক্রয়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার। দেশে দেশে এলো বুর্জোয়া 'গণ-বিপ্লব', যার প্রকৃষ্ট প্রকাশ হ'য়েছিল ফরাসী বিপ্লবে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে যাদের ঠিক মানুষ ব'লে না ভাবলেও প্রাণী বিশেষ ব'লে ভাবা হতো, এবার তারা হ'য়ে উঠলো বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য মাত্র। শ্রমিক হোলো শ্রমশক্তি—বাষ্প ও বৈদ্যুতিক শক্তির সগোত্র। শ্রমিকরা কেবল পণ্যের সৃষ্টি করতে লাগলো না, তারাও হ'য়ে রইলো পণ্য, ক্রীতদাসদের মতো। তাদের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ, বর্ণভেদ বা গোত্রভেদ রইলো, তা রইলো আসলে একঘোড়ার ইঞ্জিনের সংগে পাঁচ ঘোড়ার ইঞ্জিনের যে প্রভেদ। হাজার টাকার ইঞ্জিনিয়ার এবং হাজার পয়সার মিস্ত্রী, বাজারে এদের ট্রেডমার্ক হোলো এক। ফলে বুর্জোয়া সমাজের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা যেমন জন্ম দিলো অ্যাডাম স্মিথের, রিকার্ডোর, তেমনি পথ প্রশস্ত ক'রে দিলো কার্ল মার্ক্সের আগমনের—ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে যে বুর্জোয়া বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তা পরিণত হোলো সত্যিকারের শ্রমিক বিপ্লবে। ফরাসী বিপ্লবের জলন্ত প্রতিশ্রুতিকে আদায় করলো সোভিয়েট বিপ্লবের শ্রমিকরা। শ্রমিক ও শ্রম-শক্তি সমন্বিত হোলো। বুর্জোয়া বিপ্লবে শ্রমিকের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছিল শ্রম-শক্তি এণ্টিথেসিস রূপে,—শ্রমিক বিপ্লবে তাদের সিন্‌থেসিস ঘটলো। যাই হোক, ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে

নিজেদের স্বার্থের জন্যে বুর্জোয়ারা বানালো নূতন আইন, প্রচার করলো নূতন নীতি, বিস্তার করলো নূতন ধর্ম। আর এজন্যে তারা প্রধানত ফিরে চাইলো পেছনের দিকে,—যে পেছন তাদের আর বাঁধতে পারবে না, অথচ শ্রমিকদের বাঁধতে খুবই কার্যকরী হবে। বুর্জোয়ারা যে-ছুটি নীতিকে সব চেয়ে বেশী প্রচার করলো, সেগুলি হোলো আইন-আদালতের এবং প্রতিশ্রুতি পালনের পবিত্রতা। পূর্বেই বলেছি, গান্ধীজি আইন-আদালতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ব'লেই আইন-অমান্যকে তিনি বিপ্লবী পন্থারূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি পালনের পবিত্রতা সম্পর্কে ও এই একই কথা বলা চলে। এই নীতিগুলি অত্যন্ত ভালো জিনিষ সন্দেহ নাই। সমাজে হিংসা হোক, মিথ্যাচার চলুক, প্রতিশ্রুতি-ভংগ ঘটুক, এ কেউ চায় না—এবং কোন আদর্শ সমাজে সেগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। কিন্তু শ্রেণী সমাজে এই নীতিগুলির উপর মূলত জোর দেওয়া হয়, মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই শোষক ও শাসকরা যখন নিজেরা প্রতিমুহূর্তে প্রতিপদে হিংসাত্মক কার্য করে, কোটী কোটি মানুষকে অনাহারে অব্যবস্থায় রেখে পলে পলে তিলে তিলে হত্যা করে, তখনই তারা বা তাদেরই অর্থভোগী প্রচারকরা (অনেক সময় তাঁদের একান্ত অজ্ঞাতেই!) শোষিত শাসিত জনসাধারণকে অহিংস্রক হ'তে শিক্ষা দেয়! ধনিকরা বা তাদের আশ্রিত শাসকরা যখন প্রতিপদে প্রতিশ্রুতি ভংগ করে, প্রতিপদে—সংবাদপত্রে, সাহিত্যে, বেতারে, বক্তৃতায়, ইস্তাহারে—মিথ্যার করে অনুশীলন, ঠিক তখনই তারাই জনসাধারণকে বলে, 'প্রতিশ্রুতি-ভংগ করো না,—না খেতে পেয়ে পেটের দায়ে একদিন যে মাইনের চাকরি নিয়েছিলে, চিরদিন সেই মাইনেতে চাকরি ক'রে যাও, কড়া সুদে যে-টাকা ধার নিয়েছিলে, তা নিয়মিতভাবে

শোধ ক'রে যাও, সমস্ত অত্যাচার, অবিচার অন্যায় নীরবে সহ্য করো, কারণ, তোমরা অংগীকারবদ্ধ, সত্যবদ্ধ আর অংগীকার মেনে না চলা মহাপাপ, সত্যের অবমাননা—ক্ষমার অতীত।' গান্ধীজি শৈশবে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিশ্রুতি-পালনের কাহিনীটি পাঠ করেছিলেন, অভিনয় দেখেছিলেন। কুশীদজীবী ভারতীয় হিন্দু সমাজে এই উপাখ্যানের বহুল প্রচার হওয়া ছিল খুবই সম্ভব। এবং নূতন বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের সংগে সংগে দেশে সত্য-পালনের অনুরূপ কাহিনীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল স্বাভাবিক। দেশে অভাব, অনটন, শোষণ যতোই তীব্রতর হচ্ছিল, ততো নিঃস্ব হবার মহত্ত্বকে প্রচার করার চেষ্টা চলছিল দেশে। যার ফলে হরিশ্চন্দ্রের হাসিমুখে দারিদ্র্য-বরণের কাহিনী বা গীতার বিষয়-বৈরাগ্যের বাণীকে সমাজে সচল করা হয়েছিল। গান্ধীজি শৈশবে হরিশ্চন্দ্রের সত্য-পালনের কাহিনী প'ড়ে বিগলিত হ'য়ে নিজের অজ্ঞাতে শ্রেণী-সমাজের এক বিরাট প্রচার যন্ত্রের কবলিত হ'য়েছিলেন মাত্র। তাই সেই বুর্জোয়া প্রচারে দীক্ষিত নীতি অনুসারেই গান্ধীজি একদিন হননবিমুখ গাড়োয়ালী সৈন্যদেরও তিরস্কৃত করলেন এবং তারা প্রতিশ্রুতি ভংগের অপরাধে অপরাধী একথা ঘোষণা করতে বিন্দুমাত্র-ও কুণ্ঠিত হলেন না। *

---

* শ্রেণী সমাজের বহু নীতিকেই গান্ধীজি অবলীলায় বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে অনশন ব্রতের কথাটির উল্লেখ করেছি। দাতব্যও আর একটি। দান করা আমাদের সমাজে ধর্মে পরিণত হয়েছে। দান করাকে যে সমাজে ধর্ম ব'লে স্বীকার করা হয়, সে সমাজে দান-গ্রহণের উপযুক্ত দরিদ্রের অস্তিত্বকেও ধর্মের অংগ হিসাবেই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। দান দারিদ্র্যকে সহনীয় করে, শোষককে করে মহিমান্বিত। এই ভাবে শোষণকে শোভন এবং দীর্ঘস্থায়ী করার সুবিধা দেয়।

তাই আমরা দেখি, শান্তি, অহিংসা, ক্ষমা, সৌভ্রাত্র্য, স্বাধীনতা, সত্য-পালন প্রভৃতি মানবতার বাণীগুলিকে বুর্জোয়ারা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে! এবং গান্ধীজি সেই বাণীগুলির সর্বাপেক্ষা শক্তিমান বাহক রূপে আভির্ভূত হয়ে বুর্জোয়া স্বার্থের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন। কারণ, শ্রেণীময়, শোষণময় সমাজে এই পবিত্র বাণীগুলি যখন প্রচারিত হয়, তখন তা কার্যকরী না হ'য়ে কেবল শোষক শ্রেণীরই সাহায্য করে। তাই গান্ধীজির মতো মহাজনের মুখে-ও এই বাণীগুলি তাঁর অজ্ঞাতে অনিচ্ছাতে শোষক গোষ্ঠীর প্রচারের সহযোগিতা করলো, তাতে গণমানবের কোন কল্যাণ হলো না। এই শ্রেণী-সমাজে তাঁর অহিংসা হিংসার, ত্যাগ লালসার, এবং সত্যপালন শোষণের সহায়ক রূপেই আত্মপ্রকাশ করলো।

কেবল রাষ্ট্র-বিরোধিতা বা অহিংসার ব্যাপারেই নয়, অন্যান্য বহু ব্যাপারেও আপাত-দৃষ্টিতে টলস্টয়ের সংগে গান্ধীজির সাদৃশ্য দেখা গেলেও, আসলে পার্থক্য ছিল গভীরতর। এই পার্থক্যের মূল কারণ, আমরা পূর্বেই নির্দেশ করেছি, তদানীন্তন সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ভারতের মধ্যে অর্থনীতিক, রাজনীতিক তথা সামাজিক অবস্থার প্রভেদ।

টলস্টয়ের রাষ্ট্রবিরোধিতা এবং অহিংসার মতোই তাঁর অপর একটি উল্লেখযোগ্য জীবন-দর্শন হোলো নারী এবং নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মতামত। টলস্টয়ের এই মতামতগুলি তাঁর সকল নাটক, উপন্যাস, ও কথা-কাহিনীতে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। নারী এবং নরনারীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে টলস্টয়ের নির্ভীক নিঃসংকোচ মতামত সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত রয়েছে তাঁর ক্রুয়েৎসার সোনাটা এবং আন্না কারেনিন উপন্যাসের মধ্যে। টলস্টয় নারীকে কখনো কোন কল্পিত মহিমায় ভূষিত করেন নি।

পুরুষের মতোই তাদের-ও ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রলোভিত করে, ক্ষুদ্রতর হিংসা-দ্বেষ করে প্ররোচিত—পুরুষের মতোই তারা যে হিংসাপরায়ণ, মিথ্যাপরায়ণ, প্রতারণাপরায়ণ, একথা জানতে বা জানাতে টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নি। তাঁর কিটি থেকে নাটাশা রস্টভ পর্যন্ত সমস্ত চরিত্র-ই দোষগুণে ভরা—তারা জীবন্ত এক একটি প্রাণী। আর তারা জীবন্ত প্রাণী ব'লেই বুঝি সমাজে পবিত্র বন্ধনের নামে তাদের উপর রাত্রিদিন যে-অবিচার ও অত্যাচার চলে, তা দেখে টলস্টয় আতংকিত হ'য়ে ওঠেন।* বিবাহ নামক পুরুষের সৃষ্ট নারী-নিষ্পেষণ যন্ত্রের কবল থেকে নারীদের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যে তিনি দাবী করেন—নারীদের মুক্তি, তাদের আত্মগঠনের পরিপূর্ণ অধিকার। এ বিষয়ে তিনি ইবসেন, বিয়র্নসন বা বার্ণার্ড শ-র সগোত্র। বুর্জোয়া অর্থনীতি একদা যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার দাবী করেছিল, তা আসলে ভোয়া হ'লে-ও, তার-ই সুদূরপ্রসারী উপসংহার রূপে সমাজের সকল স্তরের নর-নারীই দাবী করলো স্বাধীনতা। বিবাহের কারাগার থেকে মেয়েরা চাইলো মুক্তি। পবিত্র বন্ধন ব'লে যে-বিবাহিত জীবনকে একদা প্রচারিত করা হোতো, তা যে বহু ক্ষেত্রে কেবল ঘৃণ্য দুঃসহ যৌন-জীবন মাত্র, তা ঘোষণা করলেন ইবসেন, টলস্টয়, শ। স্বামীরা-ও যে অনেক ক্ষেত্রে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে,

---

* গান্ধীজি নারীকে কখনো রক্তমাংসের জীবন্ত প্রাণী হিসাবে দেখেন নি। নারী তাঁর কাছে একটা idea মাত্র। তাই বিভিন্ন কাল্পনিক মহত্ত্বে তিনি নারীদের ভূষিত করেন এতো সহজে। তাই বিবাহিত জীবন গান্ধীজির কাছে আদর্শ অবস্থা। স্বামীর সংসারে স্ত্রীর নিঃস্ব নিরুপায় নিপীড়িত অবস্থাই, গান্ধীজির মতে, ত্যাগ, নিঃস্বার্থতাপরতা, সহিষ্ণুতা। দরিদ্র ব্যক্তি এবং তার দারিদ্র্যকেও গান্ধীজি এমনি একটি মন-গড়া মহত্ত্বে ভূষিত করেন।

একথা, প্রকারান্তরে হ'লেও, তাঁরাই ঘোষণা করেন চূড়ান্তভাবে। বিবাহিত জীবন স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়কেই সংকুচিত করে, সংকীর্ণ করে—করে কুৎসিত, স্বার্থপর। আবার এ বিষয়ে টলস্টয় এবং শ * দুজনেই খৃস্টের দোহাই দেন। দুখবর সম্প্রদায়ও বিবাহিত জীবনকে স্ত্রী এবং পুরুষের পক্ষে ব্যক্তিগত বিবেকের অনুসরণ করার অনুকূল নয় ব'লেই ঘোষণা করেন, এবং তাঁদের মতে বিবাহের চেয়ে যৌন-প্রেরণাই শ্রেষ্ঠতর। দুখবরেরা রাষ্ট্রবিরোধিতাকে তাঁদের অন্যতম নীতি ও রীতি ব'লেই গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু টলস্টয়ের এই প্রভাব গান্ধীজির উপর বিন্দুমাত্র ক্রিয়া করে নি। গান্ধীজি যেমন সামাজিক, অর্থনীতিক কারণে টলস্টয়ের মতো রাষ্ট্রবিরোধী

---

* যিশু খৃষ্টের বিবাহ সংক্রান্ত মতামত সম্পর্কে শ বলেন:

"When we come to marriage and the family, we find Jesus making the same objection to that individual appropriation of human beings which is the essence of matrimony as to the individual appopriation of wealth."

টলস্টয়, শ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তাঁদের সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারেই (এঁদের কালে বুর্জোয়া অর্থনীতিতে ভাঙন পূরোদমে শুরু হয়েছিল, তাই এঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী) খৃস্টের বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন।

বৈবাহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে গান্ধীজি (ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরম বিশ্বাসী তরুণ এক আধা-বুর্জোয়া আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে) যে মত প্রকাশ করেন, তার সমর্থনও খৃস্টের বাণীর মধ্যে পাওয়া যায়:

"And they twain (husband and wife) shall be one flesh, so then they are no more twain but one flesh. What therefore God has joined together let not man put asunder." (Mark x, 8. 9)

হ'তে পারেন নি, তেমনি হ'তে পারেন নি বিবাহ-বিরোধী। টলস্টয় ছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী, স্বতরাং বিবাহের নামে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার-ও বিরোধী তিনি। টলস্টয় প্রভৃতির মতবাদের সংস্পর্শে আসায় বাক্যত গান্ধীজি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী হ'লেও তিনি কার্যত কখনো বিরোধিতা করেন নি—কারণ, তিনি একটি আধা সামন্ততান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিমাত্র ছিলেন। আর বুর্জোয়া শ্রেণী আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরম বিশ্বাসী। গান্ধীজির কাছে রাষ্ট্র যেমন একটি 'আইডিয়াল' 'অ্যাবস্ট্রাক্ট্' পদার্থ, নারী এবং বিবাহও ঠিক তেমনি। মেয়েদের সম্পর্কে গান্ধীজির ধারণাটি নিতান্ত কাল্পনিক, ভাবগত—তা বিন্দুমাত্র-ও বাস্তবিক বা তথ্যগত নয়। তিনি বলেন, "Woman, I hold, is the personification of self-sacrifice,..." দারিদ্র্যের সম্পর্কে গান্ধীজির যে রোমান্টিক আইডিয়ালিজম দেখা যায়, মেয়েদের সামাজিক অসহায় দুরবস্থা সম্পর্কেও তাঁর তেমনি একটি রোমান্টিক অবাস্তব মনোভাব আমরা লক্ষ্য করি। দারিদ্র্যের নিঃস্ব নিপীড়নকে গান্ধীজি যেমন ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কাল্পনিক সৌন্দর্যে ভূষিত ক'রেছিলেন, তেমনি মেয়েদের সামাজিক রিক্ততা এবং নিরুপায় দুঃখ-সহনকে-ও তিনি একটি কাল্পনিক মহত্ত্বে ভূষিত করার চেষ্টা করেন। ফলে, সমাজের অত্যাচারিতা লাঞ্ছিতা নারীদের সম্পর্কে তিনি আত্মত্যাগ, স্বার্থহীনতা, অহিংসা প্রভৃতি মুখরোচক শব্দ সম্ভারের করেন প্রয়োগ। "...Woman is the incarnation of Ahimsa. Ahimsa means infinite love, which again means infinite capacity for suffering."

আর এই কারণেই বুঝি গান্ধীজি বলেন, অহিংসা যুদ্ধই হোলো নারী চরিত্রের পক্ষে একান্ত উপযোগী যুদ্ধ। "The beauty of non-vio-

lent war is that women can play the part in it as men. In a violent war, the women have no such privilege."* কিন্তু গান্ধীজি যদি ফরাসী বিপ্লবে বা রুশ বিপ্লবে মেয়েদের ভূমিকাটিকে নিরাসক্তভাবে লক্ষ্য করতেন, তবে এই ধরণের অযৌক্তিক অবান্তর উক্তি কখনো করতেন না ব'লেই আমার বিশ্বাস।

মেয়েরা যে সংসার ও শিশু-পালন ছেড়ে বাইরে আসে, গান্ধীজি তা পছন্দ করতেন না। কিন্তু যখন 'অহিংসা যুদ্ধ' বেধে উঠলো তখন গান্ধীজি তাদের ঠেকিয়ে রাখতে চাইলেন না। মেয়েরা সংসার ও শিশু-পালন ছেড়ে সংগ্রামে এসে যোগ দিলো দলে দলে। গান্ধীজি-ও তখন অধীর আনন্দে ঘোষণা করলেন ঃ

"They (women) saw that the country demanded something more than their looking after their homes. They manufactured contraband salt, they picketed foreign cloth shops, and liquor shops and tried

---

* ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইজিপ্ট যখন বিদ্রোহী হোলো, তখন সেখানে মেয়েরা কি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার একটি আতংকগ্রস্ত বিবরণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র সার ভ্যালেন্টিন চিরলের নিম্নলিখিত কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় ঃ

'The girls are indeed more violent than the boys. ... It would be wrong to make light of the wide-spread bitterness that u derlies this feminine upheaval."

সহিংস সংগ্রামে মেয়েদের মহত্ত্ব মোটেই কমে না। 'পুণ্যবান' হিন্দু পাঠক পুরাণে বর্ণিত ভয়ংকরী রণচণ্ডিকার মূর্তি কল্পনা করুন। সেই দাড়িম্বপুষ্পবর্ণা নৃত্যমানা এলোকেশীকে কি সহজে ভোলা যায় ?

to wean both the seller and the customer from both."

কিন্তু মেয়েদের যখন আবার সহিংস যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, তখন গান্ধীজি সংসার-সেবা, স্বামীসেবা ও শিশু-পালনের অমোঘ মহত্ত্বের প্রচারক হ'য়ে ওঠেন। বলেন :

"In my opinion, it is degrading both for man and woman that woman should be called upon and induced to forsake hearth and shoulder the rifle for the protection of that hearth. It is reversion to brutality and the beginning of the end."

সুতরাং উপরোক্ত দুইটি উদ্ধৃত বাক্য পাশাপাশি রেখে যে-কোনো পাঠকই লক্ষ্য করবেন, গান্ধীজির প্রতিবাদটি আসলে গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ ক'রে বাইরে আসার বিরুদ্ধে নয়--হিংসার বিরুদ্ধে। কিন্তু গান্ধীজি এখানে অন্যান্য বহু স্থলের মতোই শাব্দিক ধূম্রজালের সৃষ্টি করেছেন। ঋজু শানিত যুক্তির পথে অগ্রসর হন নি। কিন্তু, অন্যপক্ষে, বার্ণার্ড শ-কে দেখুন। তিনি-ও মারাত্মক যুদ্ধ-সীমান্তে নারীদের অংশ গ্রহণের বিরোধী। কিন্তু তাঁর যুক্তি দিনের আলোর মতোই প্রখর ও স্পষ্ট। শ বলেন, দেশের জনসংখ্যার সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখেই মেয়েদের মারাত্মক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা দরকার। যুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে প্রাণহানি ঘটে। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত জনবিরল দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ যথেষ্ট রাখার জন্যে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা মেয়ের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। কারণ, বৎসরে একজন পুরুষ যখন অবহেলায় দশটি শিশুর জনক হ'তে পারেন, তখন মেয়েরা হ'তে পারেন মাত্র একটি সন্তানের জননী। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজে

জনসংখ্যার ক্ষতিপূরণ সহজে সম্পন্ন করার দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক হওয়া দরকার। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েরা যদি পুরুষের সংগে সমান অংশ গ্রহণ করে, এবং সমানভাবে নিহত হয়, তবে যুদ্ধের ফলে জনবিরল জাতির জনসংখ্যা সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শ হোলেন অবাধ যৌন মিলনের প্রচারক। বিবাহিত বা অবিবাহিত যে-কোনো যৌন সম্পর্ক সন্তান-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে হ'লেই তাঁর কাছে তা সমর্থনযোগ্য বা শুদ্ধ, পবিত্র। একই পিতার ঔরসে কোনো মাতার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের চেয়ে, পাঁচটি পিতার ঔরসে একই মাতার গর্ভে পাঁচটি সন্তানের জন্মকে তিনি সমাজের পক্ষে অধিক কল্যাণকর ব'লে মনে করেন। কিন্তু বিবাহের বাইরে কোনো যৌন সম্পর্কের সম্বন্ধে গান্ধীজির ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি সতীত্বের মহিমায় বিশ্বাসী। অবশ্য, যদি-ও সন্তান-সৃষ্টি তাঁর কাছে "nearest the divine". গান্ধীজি যখন সন্তানসৃষ্টির খাতিরে-ও বিবাহের বাইরে কোনোরূপ যৌন সম্পর্ককে প্রশ্রয় দেন না, তখন শ সন্তান-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'লে বিবাহকে-ও অস্বীকার করতে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। তাই বিবাহকে শ ব্যংগ-বিদ্রূপ করেন, তিরস্কার করেন, বলেন, "licentious institution." অথচ বিবাহ সম্পর্কে গান্ধীজির মতামত যেন খৃস্টান টলস্টয় এবং শ-কে প্রতিবাদ করে :

"For me the mrried state is as much a state of discipline as any other. Married life is intended to promote mutual good both here and hereafter." *

* কিন্তু এর সংগে খৃস্টান বার্ণার্ড শ-র কথা তুলনা করুন :

"A married man, he (Jesus) said. will try to please his

"কিম্বা, "Marriage is a fence that protects religions. If the fence were to be destroyed, religion would go to pieces, the foundation of religion is restraint, and and marriage is nothing but restraint." *

তাই এখানে আমরা সহজেই লক্ষ্য করি, টলস্টয় এবং শ ফিমিনিস্ট বা নারী-স্বাধীনতার ঘোরতর প্রচারক হ'য়েও † কখনো নারীকে ভাবগত (idealised) রূপে দেখেন নি। তাঁদের কাছে নারী ত্যাগে-সহিষ্ণুতায়

---

wife and a married woman to please her husband instead of doing the work of God."

এ কেবল বার্ণার্ড শ-র কথাই নয়—সেণ্ট পল থেকে শুরু ক'রে কার্লাইল, রাস্কিন ও টলস্টয় পর্যন্ত অন্যান্য খৃস্টানদের-ও কথা। এঁরা কম বেশী সকলেই বিবাহবিরোধী।

* কিন্তু শ বলেন, বিবাহিত জীবন মানুষকে সংযম শেখায় না, মিতাচারী করে না, বরং তাকে অসংযমের সুযোগ দেয়, ক'রে তোলে ব্যভিচারী। কারণ, বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর যৌনাচারের সুযোগ অত্যন্ত বেশি।

গান্ধীজি তাঁর নিজের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে অবহিত হ'লেও শ-র এই উক্তিকে স্বীকার ক'রে নিতেন। তাঁর মতো প্রতিভাকেও কখনো কখনো অমিতাচারী হ'তে হয়েছিল। তবে আর সাধারণ মানুষের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কী কথা?

† অবশ্য গান্ধীজি-ও নিজেকে নারী-স্বাধীনতার সমর্থক ব'লেই প্রচার করেন: "I passionately desire the utmost freedom for our women."

কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনি নারী-স্বাধীনতা সম্পর্কে যা বোঝেন, তা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র। কারণ, তাঁর মতে, স্ত্রীর আত্মোন্নতি করতে হবে স্বামীর সহযোগিনী হয়ে, স্বামীর সংগে অত্যন্ত অসহনীয় ঘৃণ্য অবস্থার মধ্যে-ও—একত্রে থেকে। স্ত্রীর পৃথক সম্পত্তির দাবীকে-ও তিনি বড়ো একটা প্রশ্রয় দেন না।

পরিপূর্ণ নয়। কিন্তু গান্ধীজির 'নারী' কল্পলোকবাসিনী, সে অহিংসা, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি মাত্র। শ ও টলস্টয় উভয়েই দেখেছেন বিবাহের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজে নারী পুরুষের পণ্যে পরিণত হয়েছে—পতিব্রত সতীত্বের পরিণতি ঘটেছে একবণিতার পণ্যবৃত্তিতে। (তাই বিবাহ শ-র কাছে পণ্যবৃত্তি বা prostitution মাত্র।) আর, প্রধানত এই কারণেই টলস্টয় ও শ প্রয়োজন হ'লে নিঃসংকোচে নির্ভয়ে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন ক'রে নিজের বিবেকের ও হৃদয়ের বন্ধনের দিকেই সতর্ক লক্ষ্য দিতে উপদেশ দিয়েছেন মানুষকে। বিবাহ টলস্টয়ের কাছে পবিত্র কিছুই নয়; তা যৌন সম্পর্ক মাত্র।* কিন্তু, অপর পক্ষে, গান্ধীজি বিবাহ বন্ধনকে কঠিন থেকে কঠিনতর ক'রে তোলারই পক্ষপাতী।

মেয়েদের কিভাবে বর্ণনা করতে হবে, সে সম্পর্কে গান্ধীজি উপদেশ দেন ঃ "Before you put your pen to paper think of woman as your own mother". গান্ধীজির উপদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমার মাকে আমি আমার পিতার স্ত্রী হিসাবে দেখতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত

---

* লিও টলস্টয়ের কাছে বিবাহ যৌন মিলনের অতিরিক্ত কিছুই ছিল না, তা যতোই সমারোহের সংগে ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত হোক না কেন। তাই তিনি গান্ধীজির অতি প্রিয় "The Kingdom of God" গ্রন্থে-ও ধর্মানুচরিত, বিবাহ সম্পর্কে বিদ্রূপের সংগেই বলেন ঃ

"Moreover men are told that if a man and a woman desire to have their sexual relation sanctified they must come to church, put crowns of metal upon their heads, swallow some wine, walk three times round a table accompanied by the sound of singing and this will make their sexual relation holy and entirely different from any other."
—P. 26

হই না। কারণ, আমার মার সমস্ত মাতৃত্বের গৌরব বা আমার অস্তিত্বের গোড়ার কথাই হোলো, আমার পিতার সংগে তাঁর যৌন-সম্পর্ক। সুতরাং মার অস্তিত্বের প্রথম কথা তাঁর পত্নীত্ব—রমণীত্ব থেকেই জন্মলাভ করেছে তাঁর জননীত্ব। একথা ভাবতে কুণ্ঠিত হবার কি কারণ থাকতে পারে ? তাই আমরা দেখি, মেয়েদের সম্পর্কে গান্ধীজির উপরোক্ত উপদেশ একদর্শী এবং আংশিক। মেয়েকে ভাবগতভাবে দেখার ফলেই তাঁর এই অনিবার্য ত্রুটি ঘটেছে।

ধর্মানুষ্ঠানের ব্যাপারে-ও টলস্টয় ছিলেন এনার্কিস্ট, চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী। তাই তিনি গির্জাকে প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর মতে ধর্মানুশীলনের পক্ষে ব্যক্তির বিবেকই মুখ্য। তাঁর কাছে রাষ্ট্রের আদেশের মতোই গীর্জার আদেশ-ও অতি তুচ্ছ। গান্ধীজি কিন্তু হিন্দু ধর্মের সামাজিক অনুশাসন-গুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেনে চলেন। তিনি নিজের পরিচয় দেন একজন সনাতনী হিন্দু ব'লে। (ইয়াং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ১৯২১ খৃস্টাব্দের ৬ই অক্টোবরে লিখিত প্রবন্ধটি বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।)

আরো একটি প্রধান বিষয়ে গান্ধীজির সংগে টলস্টয়ের পার্থক্য দেখা যায়। কি হিন্দু ধর্মে, কি খৃস্টান ধর্মে* এমন একদল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির

* মুসলমান ধর্মের প্রচারক মহর্ষি মহম্মদ-ও প্রায়ই অনুরূপ দিব্য দর্শন লাভ করতেন। দিব্য দর্শন প্রথমে তাঁর কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। কিন্তু পরে এই দিব্য দর্শনই তাঁর অন্যতম প্রধান আশ্রয় হ'য়ে ওঠে। এ-বিষয়ে তাঁকে রামকৃষ্ণের সংগে তুলনা করা চলে। মহম্মদের দিব্যদর্শন সম্পর্কে তৎকালীন অনেকে অবিশ্বাসী হলে-ও তাঁর পরিচিতদের অধিকাংশই তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারতেন না। কারণ, ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে মহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও সত্যবাদী। তাই তাঁকে তরুণ বয়স থেকেই পরিচিতরা বলতেন, "এল আমিন" বা The Faithful.

আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন visionary বা দিব্য-দ্রষ্টা। তাঁরা অনেক সময়ে এমন সমস্ত বস্তু দেখতেন, যা যুক্তিবাদী মানুষের কাছে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস্ত নয়। আর এই কারণে-ই, বিশেষত খৃস্টান দেশে দিব্য-দর্শীদের কম নির্য্যাতন-ও হয় নি। 'হেরেটিক' আখ্যা দিয়ে জোয়ান অব আর্ককে-ও তারা জীবন্ত দগ্ধ ক'রেছিল। কারণ, জোয়ান অন্যান্য বহু খৃস্টান সহধর্মীর মতোই inner voice বা ভগবৎ-প্রদত্ত অন্তরতর নির্দেশে বিশ্বাস করতেন। তথাকথিত যুক্তিবাদী টলস্টয় visionary-দের বলেছেন fanatic. * টলস্টয় যদি রামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে সচেতন হতেন, তবে রামকৃষ্ণের চরিত্র-ও তাঁর কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য লাগতো। কিন্তু বস্তুত, এই ধরণের vision ও inner voice-এ অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ নেই। রোমাঁ রোঁলা তাঁর 'রামকৃষ্ণের জীবন' গ্রন্থে রামকৃষ্ণের এই ভাবাবিষ্ট দিব্য দর্শনকে মূলত ব্যাখ্যা করেছেন শিল্পীর কল্পনা হিসাবে। তিনি রামকৃষ্ণের দিব্য দর্শন সম্পর্কে বলেন, তা একপ্রকার শ্রেষ্ঠ plastic art বা মূর্তক শিল্প। যাঁরা গল্প, উপন্যাস বা নাটক রচনা করেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন, একবার কল্পনায় বা শিল্প-সত্তায় তাঁরা তন্ময় হ'লে তাঁদের কাহিনীতে কল্পিত পাত্রপাত্রীরা দৃষ্টির সম্মুখে স্বতই জীবন্ত হ'য়ে ভাসতে থাকে। তাই আমরা দেখি, এই অনুভূতি এবং কল্পনাশক্তিকে যদি তীব্রতম একটী স্তরে পৌছে দেওয়া যায়, তবে মানুষের পক্ষে দিব্যদর্শন কেবল সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। রোমাঁ রোঁলা রামকৃষ্ণের জীবনের 'অতিপ্রাকৃতিক' ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেছেন একপ্রকার plastic art রূপে। তাই

* "Or when some fanatic beheld a vision" ইত্যাদি।
—The Kingdom of God P. 75.

তিনি রামকৃষ্ণের শিল্পী চরিত্রের উপরই জোর দিয়েছেন সর্বাপেক্ষা বেশি। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী। তাই এই ব্যাখ্যাকে আমরা নিঃসংকোচে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু টলস্টয় নিজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হ'য়েও যে অনুভূতি এবং কল্পনার এই রূপগ্রহী শক্তিতে কেন বিশ্বাস করেন নি, তা সহজে বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে, গান্ধীজি inner voice-এ পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, যাকে অনেক আধুনিক যুক্তিবাদীর কাছে ভণ্ডামি ও বুজরুকি ব'লে মনে হয়। তাই এদিক থেকে তাঁকে টলস্টয়ের সঙ্গে তুলনা না ক'রে করা চলে গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস ও কোয়েকার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ ফক্স-এর সংগে। সক্রেতিস ও জর্জ ফক্স, তাঁরা উভয়েই 'অন্তরতর বাণী-'তে বিশ্বাস করতেন। তাই কোনো সমস্যার সমাধানে অক্ষম হ'লে-ই তাঁরা তাঁদের 'অন্তরগুহাবাসী ভগবানের' শরণাপন্ন হতেন। জর্জ ফক্সের পক্ষে এ কাজটী মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। কেননা, ব্যক্তিগত বিবেকই যাঁদের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা, তাঁদের পক্ষে অতীন্দ্রিয়বাদের এই চূড়ান্ত রূপটিকেই স্বাভাবিক লাগে। অবশ্য, সক্রেতিসের পক্ষে এই প্রকার mysticism অনেক পরিমাণে দুর্বোধ্য মনে হয়। কারণ, বুদ্ধদেবের মতোই সক্রেতিস-ও ছিলেন বোধি বা intellect-এর পূজারী। তাই বুদ্ধদেবকে কখনো কোনো দৈবাদেশের প্রতীক্ষা করতে দেখা যায় নি। কিন্তু সক্রেতিসকে কখনো কখনো দেখা যায়। তাই সক্রেতিসের অপেক্ষা বুদ্ধকেই আমরা শ্রেষ্ঠতর বুদ্ধিবাদী রূপে প্রত্যক্ষ করি। বোধিই বুদ্ধের পরম জ্ঞান। বুদ্ধি থেকেই তাঁর হৃদয়ের অহিংসা এবং প্রেমের হয়েছে জন্ম। শরাহত হংস এবং দেবদত্তের কাহিনীই যথেষ্ট নয়। অন্যপক্ষে, সক্রেতিস মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের দ্বারস্থ হ'তে

চেয়েছেন একই সংগে। তাই বুদ্ধের অপেক্ষা আমরা সক্রেতিসের সংগেই গান্ধীজির প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখি অনেক বেশি। সুতরাং এখানে গান্ধীজির উপর সক্রেতিসের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসংগিক হবে না, মনে করি।

বস্তুত, গান্ধীজির উপর সক্রেতিসের প্রভাব রাস্‌কিন বা টলস্টয় অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়। 'সক্রেতিসের বিচার এবং মৃত্যু' গ্রন্থখানি তিনি একদা অনুবাদ করেন এবং এই গ্রন্থ ১৯১৯ খৃস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। সক্রেতিসের মতামতের মধ্যে রাষ্ট্র-বিরোধী কিছুই ছিল না, সুতরাং সরকার কর্তৃক এই গ্রন্থ নিষিদ্ধ হ'য়েছিল, সম্ভবত সক্রেতিসের বাণী হিসাবে নয়, গান্ধীজির অনুবাদ হিসাবে। কারণ, ঐ সময় যে কোনো রচনায় গান্ধীজির করস্পর্শ থাকলেই তা বৃটিশ সরকারের কাছে আতংকের কারণ হ'য়ে উঠতো। সক্রেতিস রাষ্ট্রবিরোধী ছিলেন না। কতোক পরিমাণে হেগেলের মতোই রাষ্ট্র তাঁর কাছে একটি ভাবগত বা ideal রূপ গ্রহণ করেছিল। তাই রাষ্ট্র যখন তার বিচার ব্যবস্থার মারফৎ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং ক্রিটো প্রভৃতি তাঁর শিষ্য-সামন্তরা তাঁকে গোপনে রাষ্ট্র পরিত্যাগ ক'রে বিদেশে যেতে অনুরোধ করছেন, তখন তিনি তার প্রতিবাদে বলেছেন, রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা অন্যায়। অন্যায় দণ্ডাদেশের প্রতিরোধ অন্যায় রাষ্ট্র-বিরোধিতার দ্বারা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর মতে, অন্যায় কখনো অন্যায়ের প্রতিরোধ করে না, অন্যায়কে আরো প্রতিষ্ঠিত করে মাত্র। রাষ্ট্র-বিরোধিতা কেন যে অন্যায়, সে সম্বন্ধে সক্রেতিস বলেন, রাষ্ট্র তাঁকে অন্ন দিয়েছে, বস্ত্র দিয়েছে, শিক্ষা-সংস্কৃতির সুযোগ দিয়েছে, তাঁর রক্ষণা-

বেক্ষণ করেছে। সুতরাং এ-হেন রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা তাঁর মতে সম্পূর্ণ অন্যায়। অবশ্য এই প্রসংগে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, সক্রেটিসের এই বাণী যখন প্রচারিত হয়েছিল, আথেন্স তখন অন্যান্য নগর রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ ক'রে সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধিতে হ'য়ে উঠেছিল পুষ্ট। তাই সক্রেতিস বা প্লেটোর প্রচারিত রাষ্ট্র হ'য়ে উঠেছিল একটি ভাবগত বস্তু। এই ভাবগত রাষ্ট্র-ই কল্পিত বর্ণিত হয়েছে প্লেটোর 'রিপাব্লিক'-এর মধ্যে। সহস্র সহস্র ক্রীতদাসের রক্তে ও ঘর্মে যে গ্রীক সভ্যতা এবং গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলি গ'ড়ে উঠেছিল, তাকেই আদর্শ ক'রে দেশব্যাপী শ্রমিক শোষণের ভিত্তিতে নাৎসী জার্মানীতে ও ফাসিস্ট ইতালিতে যে স্পার্টান সংস্কৃতির ভয়াবহ পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলেছিল, তা-ও আমরা সহজে ভুলি না। সুতরাং আমরা দেখি, সক্রেতিস বা প্লেটোর কাছে, তাঁদের শত মানবিকতা সত্ত্বে-ও, অসংখ্য দাস-শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ছিল আদর্শ রাষ্ট্র। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সংগঠক গান্ধীজির কাছে সক্রেতিসের বাণী যে একান্ত প্রিয় হ'য়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? বাস্তবিক পক্ষে, টলস্টয়ের অপেক্ষা সক্রেতিস-ই ছিলেন গান্ধীজির পক্ষে অধিক উপযোগী। তাই লক্ষ্য করা যায়, টলস্টয়ের অপেক্ষা সক্রেতিসের সংগে গান্ধীজির চরিত্র ও মতবাদের সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত বেশি।

কিন্তু এ-বিষয়ে এ-ও লক্ষণীয় যে, নিজের উপর খৃস্ট, টলস্টয়, রাস্কিন ও রায়চাঁদের প্রভাব সম্পর্কে গান্ধীজি যতো মুখর, সক্রেতিস এমন কি বুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে-ও, তেমন নয়। ভগবান সম্বন্ধে বুদ্ধের তূষ্ণিম্ভাবই বুঝি তাঁর সম্বন্ধে গান্ধীজির আবেগকে অনুচ্ছ্বসিত ক'রে

তুলেছিল। কেবল তাই নয়, বুদ্ধদেব মূলত ছিলেন বুদ্ধিজীবী দার্শনিক ; অন্যপক্ষে খৃস্ট ও গান্ধী, উভয়ের প্রধানতম আশ্রয় হোলো হৃদয়। তাই বুদ্ধের অপেক্ষা খৃস্টকেই গান্ধীজি তাঁর অধিকতর সগোত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এইটিই সক্রেতিস সম্পর্কে গান্ধীজির অপেক্ষাকৃত অনুচ্ছ্বাসের একটি কারণ হ'লে-ও, অপর কারণটি সম্ভবত দার্শনিক হিসাবে সক্রেতিসের দ্বান্দ্বিক পন্থার অনুসরণ। সক্রেতিস ছিলেন প্রাচীন dialectician-দের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তাঁর মতে বিপরীত জন্ম দেয় বিপরীতের। প্লেটো-বর্ণিত সক্রেতিস তাই 'ফীডো'তে বলেন :

"Then it is sufficiently clear to us that all things are generated in this way oppcsites from opposites. Then if life and death are oppsites, they are generated the one from the other : they are two and between them are two generations."

কিন্তু এই দ্বান্দ্বিক দর্শন সম্ভবত গান্ধীজির ভালো লাগে নি। এই কয়েকটি কথার মধ্যে যে একটি বিরাট বিপ্লবী মতবাদ নিহিত আছে, তা সহজেই লক্ষ্য করা যায় এবং গান্ধীজি সে সম্পর্কে হয়তো সচেতন-ও ছিলেন।

যাই হোক, গান্ধীজি যাকে তাঁর নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিমত ব'লে প্রচার করেন,—অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিরোধের 'অসম্ভব-তার বাণী,—তা-ও তিনি সক্রেতিসের কাছে-ই লাভ করেছিলেন :

"Neither if we ought never to do wrong at all, ought we repay wrong with wrong as the world thinks we may ?"

তুলনীয়, 'ক্রিটো'তে উল্লিখিত সক্রেতিসের সেই নঞর্থক প্রশ্ন ঃ

যদি অন্যায় করাই অনুচিত হ'য়ে থাকে, তবে অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের শোধ করা উচিত কেমন ক'রে ? তাই সক্রেতিস বলেন, "Then we ought not to repay wrong with wrong or do harm to anyone, no matter what we may have suffered from him." অনুরূপ একটি আদর্শকেই গান্ধীজি সমস্ত জীবন মেনে চলেছিলেন। যারা তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে, অবিচার করেছে, এমন কি তাঁকে গুরুতররূপে প্রহার করেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে, তাদের-ও তিনি শাস্তি দিতে চান নি, আদালতে অভিযুক্ত করেন নি। কারণ, সক্রেতিস এবং গান্ধী, উভয়ের মতেই দণ্ডদান একপ্রকার পীড়ন মাত্র। আর সকল পীড়নই অন্যায়। তাঁদের উভয়ের কাছেই সত্য এবং ন্যায়ই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কথা। সক্রেতিসের কাছে কোনো কাজ অন্যায় কিনা, তাই ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন। ন্যায়সংগত কোনো কাজের ফলে যদি কোনো বিপদ ঘটে, যদি চরম ক্ষতি হয়, তা হ'লেও ন্যায়ের পথ থেকে বিরত হওয়া উচিত নয়।* গান্ধীজির-ও ওই একই কথা। 'সত্যের প্রয়োগ' করতে গিয়ে যদি ভারতের স্বাধীনতা না আসে, না আসুক। যদি 'অহিংসার সাধনা' করতে গিয়ে ভারতের

---

* এই গ্রন্থে প্লেটো-বর্ণিত সক্রেতিসের কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য, জেনোফন-বর্ণিত সক্রেতিসকে প্লেটো-বর্ণিত সক্রেতিসের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক জ্ঞান-সম্পন্ন মনে হয়। কেন না, জেনোফন-বর্ণিত সক্রেতিসের মতে, তার সুফলের উপরই কোনো কাজের ন্যায্যতা নির্ভর করে।

কোটি কোটি মানুষ দুঃখ-দারিদ্র্যে, অনাহারে, অত্যাচারে মরে, মরুক। কিন্তু কি সক্রেতিস, কি গান্ধী, তাঁরা কেউ ন্যায় ও অন্যায়ের কোনো সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারেন নি। গান্ধীজির স্নেহময় হৃদয়ের বিগলিত বাষ্প যেমন মানুষের কাছে সত্যকে ঝাপসা অস্পষ্ট ক'রে দিয়েছে, সক্রেতিসের যুক্তির তীব্র আলোক-ও তেমনি ধাঁধিয়ে দিয়েছে মানুষের চোখ। মানুষ বোঝে নি যে, পৃথিবীর সত্য বড়ো জটিল; ন্যায় অন্যায় সেখানে পরস্পরের সংগে গলাগলি ক'রে রয়েছে; অহিংসার হস্তে সেখানে হিংসার খড়্গ ঝলসে ওঠে, হিংসার রক্ত সমুদ্রে ফোটে হাজারো অহিংসার শ্বেত শতদল। তাই সক্রেতিসের সংলাপগুলি বহু যুক্তির আলোক-তোরণ পার হ'য়ে মানুষকে যেখানে পৌঁছে দেয়, সেখানে মানুষের যুক্তি বিভ্রান্ত, দিশেহারা হ'য়ে যায়। মনে হয়, সক্রেতিস সমাজে প্রচলিত সকল মেকী সত্যকেই অচল ব'লে ঘোষণা করেছেন সত্য, কিন্তু মানুষে তাঁর দেওয়া খাঁটি মুদ্রাটার সন্ধান পায় নি। বস্তুত, কোনো খাঁটি মুদ্রাই তিনি দেন নি; কারণ, তার নাগাল তিনি নিজে-ও কোনো-দিন পান নি। অচলটাকে তিনি চিনেছিলেন, অথচ সচলটাকে খুঁজে পান নি। সমাজে প্রচলিত সত্যাসত্যের, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডকে তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন, কিন্তু সত্যাসত্য এবং ন্যায় অন্যায়কে পরিমাণ করার জন্যে নূতন কোনো মানদণ্ড তিনি গ'ড়ে তোলেন নি। সক্রেতিস যখন নিজে বলেছেন, বিচার কোরো না, শাস্তি দিও না, তখনই তিনি নিজেকে বিচারকের সম্মুখে বিনা দ্বিধায় হাজির করেছেন, একান্ত হাসিমুখে শাস্তির বিষপাত্রকে মুখে তুলে নিয়েছেন। গান্ধীজিকে-ও আমরা এমনি একটি ভাবেই দেখতে পাই। তিনি যখন অভিযোগ

করার, বিচার করার,* বা শাস্তি দেওয়ার বিরোধী, তখনই তিনি বারে বারে অভিযুক্ত হ'য়ে বিচারকের সম্মুখে শাস্তি গ্রহণের জন্যে হাসিমুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং বিচারকের দেওয়া দণ্ডকে নিতান্ত প্রাপ্য হিসাবেই গ্রহণ করেছেন! সক্রেতিস বা গান্ধী যে কেবল হিংসাত্মক শাস্তির কারণেই বিচারের বিরোধী ছিলেন, তা নয়। তাঁদের মতে, মানুষের অপরাধ ভ্রান্তি মাত্র, তা ইচ্ছাকৃত নয়, অজ্ঞতা-প্রসূত।† সুতরাং সেই অপরাধের জন্যে তাকে দায়ী করা চলে না। 'অ্যাপলজি'তে সক্রেতিস তাঁর অভিযোক্তা মিলেটাসকে বলেন ঃ

"Either I do not corrupt youngmen at all or I corrupt them unintentionally and by reason of ignorance. As soon as I know that I am committing a crime, of course, I shall cease from committing it."

এই প্রসংগে খৃস্টের কথা-ও স্মরণীয়। তিনি তাঁর অত্যাচারী ও বিচারীদের সম্পর্কে নাকি বলেছিলেন ঃ ওরা কী করছে জানে না, ভগবান ওদের ক্ষমা করুন। গান্ধীজি-ও সক্রেতিস এবং খৃস্টের মতোই অপরাধীর উপর ক্রুদ্ধ হন না, তার অজ্ঞতার জন্যে করুণা অনুভব

---

* এই প্রসংগে খৃস্টের বাণী স্মরণীয় ঃ

"Judge not, that we be not judged." (Matt. VII, 1.)

"Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment." (John VII, 24)

"Judge not and we shall not be judged : condemn not, and we shall be forgiven." (Luke VI, 37)

† আধুনিক পাঠক অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের কথা স্মরণ করবেন—যাঁর কাছে সকল ভ্রান্তিই (error) ইচ্ছাকৃত (intentional)।

করেন। তাই তাঁর আততায়ীকেও তিনি ক্ষমা করবেন, একথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। কেবল ঘোষণা করেন নি, তিনি জীবনে বহুবার তাঁর জীবননাশে চেষ্টিত বহু অপরাধীকেই সস্নেহে ক্ষমা ক'রে গেছেন।

মৃত্যু সম্পর্কে গান্ধীজির মনোভাব প্রসংগে ইতিপূর্বেই সক্রেতিসের কথা উল্লেখ করেছি। এখানে তার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা চলে। সক্রেতিস অম্লান বদনে মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করেছিলেন, কেননা, তাঁর কাছে মৃত্যু ছিল এমন একটি বস্তু, যাকে হৃদয়ংগম করার জন্যে তিনি সমস্ত জীবন সযত্নে সাধনা করেছেন। তাঁর মতে, যাঁরা সত্যিকারের দার্শনিক, তাঁরা সমস্ত জীবন ধ'রে কেবল মৃত্যুকেই পর্য্যবেক্ষণ করতে চান। 'ফীডো'তে সক্রেতিস বলেন:

"The world perhaps does not see that those who rightly engage in philosophy study only dying and death."*

* মৃত্যু কি এবং কেমন, তা জানবার জন্যে টলস্টয় এবং রবীন্দ্রনাথের কীই না আকুলি-বিকুলি! রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু কখনো প্রণয়ী, কখনো দেবতা, কখনো ভীষণ-ভয়াল, কখনো বা আবার অভিরাম, শ্যাম-সমান। "ওগো মরণ, হে মোর মরণ" ...ব'লে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর সমগ্র জীবনকে অঞ্জলি ভ'রে মহামৃত্যুর সম্মুখে তুলে ধরেছেন, মৃত্যু এক গণ্ডূষে তা নিঃশেষে পান ক'রে তাঁকে কৃতার্থ ক'রে দেবে। আবার কখনো দেখি, মৃত্যুকে তাঁর কতো ভয়: "মৃত্যু-ও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।" আবার কখনো বা জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোনো পার্থক্য দেখেন না: "স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে, মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।" জীবন-মৃত্যু যেন তাঁর কাছে এক

সুতরাং দার্শনিকের সমস্ত প্রচেষ্টাই যদি কেবল মৃত্যুর স্বরূপকে জানবার জন্যে নিয়োজিত হয়, তবে মৃত্যু যখন আসে, তখন তাকে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বরণ করতে বাধা কি? এই হোলো সক্রেতিসের প্রশ্ন। সক্রেতিস আরো বলেন: আত্মা দেহাতীত; কিন্তু আত্মা যখন দেহের সংগে জড়িত থাকে, তখন দেহের মালিন্য এবং স্থূলত্ব-ও তার সংগে জড়িত হয়। তাই সত্য উপলব্ধির জন্যে দার্শনিকের প্রাণপণ প্রয়াস হোলো দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখার।

"Verily we have learned that if we are to have any pure knowledge at all, we must be freed from the body; the soul by herself must behold things as they are," (সক্রেতিস, 'ফীডো'।)

এই কারণেই একশ্রেণীর দার্শনিক দেহকে পীড়ন করেন, দমন করেন, অবহেলা করেন, অস্বীকার করেন। সক্রেতিসের মতে:

"In every case he (a philosopher) will pursue pure absolute being, with his pure intellect alone. He will be set free as far as possible from the eyes and the ears and in short from the body because inter-

---

বিপুলা জননীর দুইটি স্তন, স্নেহ সুরভির দুটি বৃন্ত! আবার কখনো রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে হেলায় হেসে চলে যান, মৃত্যুঞ্জয় ব'লে ঘোষণা করেন আপনাকে: "আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, এই শেষ কথা ব'লে যাবো আমি চ'লে।" এমনি আরো কতো কল্পনা, কতো অনুভূতি, হাজারো রকমে, হাজারো রং-এ, মৃত্যুকে জানবার, মৃত্যুকে আঁচবার হাজারো প্রয়াস! আর এই কারণেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক,—অন্তত পক্ষে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেতিসের মত অনুসারে।

course with the body troubles the soul and hinders her from gaining the truth and wisdom."

তাই অতীন্দ্রিয় সাধকরা ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করেন, গান্ধীজি উপবাসে, অল্পবাসে দেহকে করেন পীড়ন, বলেন : এ তাঁর 'crucifixion of the flesh.'

মৃত্যুর সংগে পলে পলে পরিচয়ই যখন দার্শনিকদের কার্য, তখন মৃত্যুকে বাধা দিয়ে তাঁরা বীরত্ব প্রদর্শন করবেন না; মৃত্যুকে নির্ভয়ে বরণের মধ্যেই তো তাঁদের পরম বীরত্ব :

"...all men but the philosophers are not free from fear ...yet it is rather a strange thing for a man to be brave out of fear and cowardice." (সক্রেতিস, 'ফীডো')

তাই সক্রেতিস অবলীলায় বিষপাত্র মুখে তুলে নেন : নিরস্ত্র গান্ধী সশস্ত্র আততায়ীর সম্মুখে অবহেলায় উন্নত বক্ষে এসে দাঁড়ান। এঁরা উভয়েই মৃত্যু কি তা জানেন না, তবে কল্পনা করেন, আন্দাজ করেন। সক্রেতিস বলেন :

"For the state of death is one of these two things : either with the death man wholly ceases to be or loses all sensation ; and according to the common belief it is change and migration of the soul into another place, and if death is the absence of sensation and like the sleep of one whose slumbers are unbroken by any dreams, it will be a wonderful gain" (সক্রেতিস 'অ্যাপলজি')

মৃত্যুতে মানুষের হয় অস্তিত্ব থাকে না, নয় সে ঘুমিয়ে পড়ে এমন ঘুমে,

যে ঘুমে স্বপ্নের দৌরাত্ম্য নেই। শোকসন্তপ্ত ডক্টর অমিয় চক্রবর্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে গান্ধীজি একখানি পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি যা লিখেছিলেন, তাকে সক্রেতিসের উপরোক্ত কথাগুলির পুনরাবৃত্তি ব'লেই মনে হয়।

তাই আমরা দেখি, সক্রেতিস এবং গান্ধী, উভয়েই সত্যিকারের দার্শনিকের মতোই ছিলেন মৃত্যুভয়হীন।

"In truth... the true philosopher studies to die, and to him of all men is death least terrible." (সক্রেতিস, 'ফীডো')

তাই গান্ধীজিকে মৃত্যুর আতংকে মৃত্যুর সম্মুখীন হ'তে আমরা দেখিনি, মৃত্যুর আতংক তাঁকে ক'রে তোলে নি দুর্দম দুঃসাহসী। সক্রেতিস-কথিত আদর্শ দার্শনিকের মতোই তিনি দীপ্ত তেজের সংগে নিঃশংক চিত্তে প্রতিবারেই মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছেন, জীবনে বহুবার, মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাই, অন্ততপক্ষে সক্রেতিসের সূত্র অনুসারে, স্বীকার করতেই হবে যে গান্ধীজির দর্শন যতোই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। গান্ধীজি যদি দার্শনিক না হন, তবে তিনি কিছুই না।

সক্রেতিস এবং গান্ধী, এঁদের উভয়ের দৈব-সংকেত বিশ্বাসের কথা পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। তবে গান্ধীজির দৈব-সংকেতের সংগে সক্রেতিসের দৈব সংকেতের একটি গভীর পার্থক্য ছিল। সক্রেতিসের দৈব সংকেত ছিল কেবল নিষেধাত্মক।

"I have had it from childhood: it is a kind of voice which whenever I hear it always turns me

back from some thing which I was going to do, but never urges me to act. (সক্রেতিস, 'অ্যাপলজি')

কিন্তু গান্ধীজি দৈব সংকেতের বা inner voice-এর প্রতীক্ষা করতেন নিষেধ ও নির্দেশের জন্যে, উভয়ত।

সুতরাং গান্ধীজির নৈতিক চিন্তায় ও দর্শনে, কিংবা সেগুলির দৈনন্দিন অনুশীলনে সক্রেতিসের প্রভাবকে বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করা যায় না। বুদ্ধ, খৃস্ট, রাস্কিন, টলস্টয়ের মতোই সক্রেতিস-ও গান্ধীজির মূল চিন্তা-গুরুদের একজন।

গান্ধীজি যেমন তাঁর ভগবৎগীতা এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রথম পাঠ ইংরেজ সাহিত্যের মারফৎ পেয়েছিলেন, তেমনি ইসলাম ধর্মের-ও প্রথম পাঠ তিনি ইংরেজি সাহিত্যের মারফৎ-ই পান। মহম্মদের জীবন ও বাণীর প্রতি তাঁকে শ্রদ্ধান্বিত ক'রে তোলে ওঅশিংটন আর্ভিং, বিশেষত, টমাস কারলাইল রচিত মহম্মদের জীবনী। কারলাইল তাঁর 'হিয়েরো অ্যাজ এ প্রফেট' শীর্ষক বক্তৃতায় * মহম্মদ সম্পর্কে সচরাচর প্রচলিত বিরুদ্ধবাদী ভ্রান্ত ধারণাগুলির নিরসন করেন। তিনি বিশেষ ভাবে প্রামাণ্য যুক্তির সংগে আলোচনা ক'রে দেখান যে, মহম্মদ ছিলেন খৃস্টান ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণীবাহক মাত্র।†

এই বিষয়ে কার্লাইলের পরবর্তী কালের দুইজন শক্তিশালী লেখকের

* ১৮৪০ খৃস্টাব্দের ৮ই মে তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা। এই বক্তৃতা পরে তাঁর 'Hero and Hero-Worship' গ্রন্থে সংকলিত হয়।

† বস্তুত, খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহম্মদের অভ্যুত্থানের সময়ে সিরিয়ায় ও আরবে বাইজেণ্টান খৃস্টান ধর্মের প্রভাব ছিল প্রচুর। ঐ সময়ে মক্কায় খৃস্টানদের সংখ্যা-ও নিতান্ত অল্প ছিল না। তাঁদের জন্যে পৃথক গীর্জা এবং কবরখানা-ও ছিল।

মতামত স্মরণীয়। জর্জ বার্ণার্ড শ এবং এচ. জি. ওএলস্। ওএলস্ মহম্মদকে ধর্মপ্রচারক নামের অযোগ্য ব'লে বর্ণনা করেছেন। কারণ সম্পর্কে বলেছেন, মহম্মদ ছিলেন একাধিক নারীতে আসক্ত, এবং তিনি তরবারি হস্তে ধর্মপ্রচারে দ্বিধা করেন নি। তরবারি হস্তে ধর্মপ্রচারের পক্ষে কারলাইল বলেন, খৃস্টান ধর্ম-ও তরবারি যোগেই স্যাক্সনদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু এই যুক্তি সম্ভবত এচ. জি-র মনঃপূত হয় নি। না হবারই কথা ; এচ. জি. ইতিহাসকে, নীতিকে কখনো তাদের কালগত

তাছাড়া দেশে এবং আশেপাশে নেস্টরিয়ান খৃস্টান সাধুদের মঠ-ও ছিল যথেষ্ট। এমন কি আরব পরিবারে ক্রীতদাসের মধ্যে-ও খৃস্টানদের সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু আরবরা একেশ্বরবাদী খৃস্টান এবং ইহুদিদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসা সত্ত্বে-ও ছিল বহু দেবদেবীর উপাসক। এই দেবদেবীদের মধ্যে হোবাল, মানাত, এলুওজ্জা এবং এল্লাৎ প্রভৃতিই প্রধান। একেশ্বরবাদী খৃস্টান ধর্মে তখন ভাঙন ধরেছে, শাস্ত্রের বিচার ও আচার নিয়ে তারা সাবেলিয়ান, ডসেট, আরিয়ান, ইউটিকিয়ান জ্যাকোবাইট, মনোফিজাইট, নেস্টরিয়ান, মেরিআমাইট, কলিরিডিয়ান, এ্যান্টিডিকো-মেরিয়ামাইট, নাজারাইট, এবিঅনাইট, মার্সিঅনাইট, ভ্যালেন্‌টাইনিআন, বাসেলিডিআন, কার্পোক্রাটিআন, রাকুসিআন প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়েছে। ফলে প্রচলিত খৃস্টান ধর্ম হারিয়েছে তার সজীবতা এবং শক্তি। সুতরাং পৌত্তলিক আরবীয় জাতিকে একেশ্বরবাদী ক'রে তোলার জন্যে প্রয়োজন ছিল এক নবজাত একেশ্বরবাদী ধর্মের। তাই মহম্মদের মধ্যে খৃস্টান ধর্ম পুনর্জন্ম লাভ করলো। মহম্মদ তাঁর কোরানের মধ্যে জোনা, মোজেজ প্রভৃতি বাইবেলে বর্ণিত সকল মহর্ষিকেই স্থান দিলেন। এবং খৃস্টকে, কেবল অন্যতম মহর্ষি হিসাবে নয়, ভগবানের বাণীমূর্তি (Word, Verb) হিসাবে গ্রহণ করলেন। মহম্মদ ঘোষণা করলেন, তিনি নিজে রসুল আল্লা বা ভগবানের বাণীবাহক মাত্র। তাঁর মধ্যে ভ্রান্তি ও ত্রুটি সম্ভব। কিন্তু খৃস্টের মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-ও সম্ভব নয়। কারণ ইশা (যিশু খৃস্ট)

পরিপ্রেক্ষিতে দেখেন নি। তাঁর কাছে ইতিহাস কেবল পুঞ্জীভূত স্তূপীকৃত ঘটনামাত্র—যে ঘটনাস্তূপকে তিনি কথাকথিত সনাতন নীতি ও আদর্শের মাপকাঠিতে পরিমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি বারেকের জন্যও লক্ষ্য করেন নি যে, ধর্ম বা নীতি তরল পদার্থের মতো; তা বিভিন্ন সামাজিক অবয়বে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জুডিয়াতে খৃস্টান ধর্ম প্রথমে আইনানুগতভাবে এবং অহিংসার পথে আত্মপ্রকাশ করলে-ও পরে তাকে-ও একদা অস্ত্রধারণ করতে হ'য়েছিল। মহম্মদের সময়কার আরবে-ও যদি বিভিন্ন উপজাতীয় শাসন ব্যবস্থা না থেকে রোম সাম্রাজ্যের মতো কোনো বিশাল শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা

ভগবানের বাণী বাহক নন, তিনি বাণীমূর্তি—Word, Spirit of God. খৃস্টানদের দ্বারা গৃহীত খৃস্টের মৃত্যুকাহিনীর সংগে মুসলমানদের গৃহীত খৃস্টের মৃত্যুকাহিনীর একটি বিরোধ দেখা যায়। খৃস্টানরা বলেন, যিশু ক্রুশবিদ্ধ হ'য়েছিলেন, এবং মুসলমানরা বলেন, ইশা ক্রুশবিদ্ধ হন নি, ইশার অনুরূপ চেহারার একটি মানুষকে ক্রুশবিদ্ধ করা হ'য়েছিল। এই মতান্তরটি মূলত কোরানের একটি শ্লোকের (ছয়, ১৫৬) উপর প্রতিষ্ঠিত:

"Yet they slew him not, neither crucified him, but he was represented by one in his likeness...they did not really kill him, but God took him up unto himself, and God is mighty and wise."

যাই হোক, কোরানে প্রায়ই বাইবেল ও গল্পেলগুলির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে যে, যদি কোরানের কোনো অংশ সম্পর্কে কারো সন্দেহ থাকে, তবে যাঁরা খৃস্টান ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁদের প্রশ্ন ক'রে দেখা হোক। (কোরান, দশ, ৯৪) অর্থাৎ মহম্মদ প্রচারিত ইসলামের মধ্যে খৃস্টান ধর্ম এক নবজীবন লাভ করেছে। সে দিক থেকে ইসলামকে খৃস্টান ধর্মের একটি শক্তিশালী শাখা বলা চলে। বলা চলে নয়,—বস্তুত, তাই।

থাকতো, তবে মহম্মদ কখনো অস্ত্রধারণের কথা কল্পনা-ও করতেন না। তা ছাড়া, মহম্মদ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম তেরো বৎসর সম্পূর্ণ অহিংস ভাবেই কাটিয়েছিলেন। কিন্তু কোরেশী ধনীদের ষড়যন্ত্রের ফলে যখন মুসলমানদের বেঁচে থাকা-ও অসম্ভব হ'য়ে উঠলো, তখন অস্ত্রধারণ ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। ইসলামকে অনেকে উদ্ধত, হিংসাত্মক ধর্ম ব'লেই বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন, এবং জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বস্তুত, মহম্মদের ধর্ম হোলো ইসলাম অর্থাৎ 'বিনতির ধর্ম।' হিন্দুরা অভিবাদন করেন, 'নমস্কার', অর্থাৎ নত হই। মুসলমানরা অভিবাদন জানান, 'সালাম,'—'শান্তি হোক'।

একাধিক বিবাহের অভিযোগে মহম্মদকে অপরাধী ক'রে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর একপত্নীব্রত ইংরেজ এচ. জি. বুদ্ধির বা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয় দেন নি। হিন্দুদের মধ্যে আমরা বহু আদর্শ ব্যক্তিকেই একাধিক পত্নী গ্রহণ করতে দেখেছি; এমন কি 'ভগবান' শ্রীকৃষ্ণকে-ও বহুবল্লভ ব'লেই পৌরাণিক কাহিনী-কিম্বদন্তীতে প্রচারিত করা হয়েছে। মহাসতী দ্রৌপদীর স্বামী ভাগ্য ছিল অতুলনীয়, সংখ্যার দিক থেকে-ও। কিন্তু সেজন্যে বিংশ শতাব্দীর নব্য হিন্দুরা-ও কখনো কৃষ্ণকে বা দ্রৌপদীকে বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা করেন নি। সমাজে নারীর এবং পুরুষের সংখ্যার মধ্যে অসাম্য থাকলে-ই বহুবিবাহ অনিবার্য। মহম্মদ যে-সমাজের মানুষ সে-সমাজে পুরুষের অপেক্ষা নারীর সংখ্যা সাধারণত বেশি থাকাই ছিল স্বাভাবিক। দাসবিক্রয়ের প্রথা এবং উপজাতীয় সংঘর্ষের ফলে সমাজে পুরুষের সংখ্যা নারীর অপেক্ষা ছিল কম, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং সামাজিক প্রথা অনুসারে মহম্মদ যে একাধিক বিবাহ করবেন, তাতে বিস্ময়ের বা বিরক্তির কি আছে?

কেবল তাই নয়, মহম্মদের বহু বিবাহ ছিল অনেক পরিমাণে কূট নীতির-ও অংগ—পরবর্তীকালের সম্রাট আকবরের হিন্দু রাজকন্যা বিবাহের মতো। কোরেশীদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ আবু বকরের কন্যা আয়েসা এবং ওমরের কন্যা হাফসাকে বিবাহ ক'রে মহম্মদ যে ইসলাম প্রচারের পথকে সহজ ক'রে তুলেছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এচ· জি· ওএল্‌স্‌ যখন মহম্মদকে বিংশ শতাব্দীর নীতির মানদণ্ডে পরিমাপ ক'রে নিন্দায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছেন, তখন শ কিন্তু মহম্মদের জীবন ও বাণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সংগেই ক'রেছেন গ্রহণ। অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। মহম্মদ প্রত্যেক কর্মের বিচার করতেন তার উদ্দেশ্য দিয়ে।

"An action must be judged by its intention."— Mahomet, (Bokhari, 1)

আধুনিক কালের লেনিন বা স্টালিনকে-ও আমরা অনুরূপ মত পোষণ করতে দেখি। উদ্দেশ্যই উপায়কে ন্যায়সংগত ও নীতিগত ক'রে তুলবে। যদি শান্তি স্থাপনের জন্যে হিংসাত্মক বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, যদি শ্রেণীহীন সমাজ গ'ড়ে তোলার জন্যে প্রয়োজন হয় শ্রেণীচেতনাকে তীব্র ক'রে তোলার, তাতে তাঁদের বিন্দুমাত্র বাধা বা দ্বিধা নেই। তাই লেনিন ও স্টালিন যেমন শ-র একান্ত প্রিয়, তেমনি শ-র একান্ত প্রিয় মহর্ষি মহম্মদ-ও। মহম্মদের এই হিংসা ছিল বিপ্লবীর হিংসা। কারণ, বিপ্লব যখন পূর্ণ হোলো, যখন মহম্মদ বিজয়ীরূপে মক্কায় ফিরে এলেন, সেদিন তিনি যে ক্ষমা, করুণা ও মানবিকতা দেখিয়েছিলেন, তা চিরস্মরণীয়। একাধিক বিবাহের সম্পর্কে শর মতামত অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিবাহ কেমনভাবে ভিন্নতর রূপলাভ

করেছে, বহুপত্নীত্ব থেকে একপত্নীত্বে,—বহুপতিত্ব থেকে একপতিত্ব, সে সম্পর্কে সংস্কারের জড়তাবর্জিত আলোচনা তিনি তাঁর Getting Married নাটকের মুখপত্রে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং বহু বিবাহের জন্যে মহম্মদকে নিন্দা না করার মতো ঐতিহাসিক বুদ্ধি শ-র ছিল বা আছে।

কারলাইল-ও মহম্মদকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি। মহর্ষি মহম্মদের বিরুদ্ধে যতো প্রকার অপপ্রচার ঘটেছে, তিনি সেগুলির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন :

"For current hypothesis about Mahomet, that he was a scheming Impostor, a Falsehood Incarnate, that his religion is a mere mass of quackery and fatuity, begins really to be now untenable to any one."

সত্যই, কারলাইলের এই কথাগুলি পড়লে কারলাইলের পৌত্র-প্রতিম এচ. জি.-কে নিতান্তই প্রাচীনপন্থী মনে হয়।

পূর্বেই ব'লেছি, ধর্মপ্রচারে অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে কারলাইল মহম্মদের উপর দোষারোপ করেন নি। খৃস্টান ধর্মের তরবারি গ্রহণ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন :

"We do not find of the Christian religion either that it always disdained the sword when once it had got one. Charlemagne's conversion of the Saxons was not by preaching."

পারিস্পার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে খৃস্টানদের words যে sword-এ পরিণত হয়েছিল তা আমরা লক্ষ্য করি।

কেবল ইসলাম বা খৃস্টান ধর্মই যে ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে তরবারি গ্রহণ করেছিল তাই নয়। ভগবৎ-গীতায় ব্যাখ্যাত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের আদর্শও ছিল তাই।* গীতায় হিংসাত্মক যুদ্ধ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দেহ নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর। দেহের হত্যায় আত্মার কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং দেহের হত্যায় অন্যায় কোথায়? †

খৃস্ট ধর্মের প্রভাব গান্ধীজির উপর আগেই পড়েছিল। সুতরাং খৃস্ট-ধর্মের আরব সংস্করণ ইসলামকে মেনে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোলো না। বিশেষত, মহম্মদের ইয়াথ্রিব (মদিনা) পলায়নের পূর্ব পর্যন্ত মহম্মদের জীবনেতিহাস ত্যাগ, সারল্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীলতার দিক থেকে গান্ধীজির জীবনের কথাই সহজে স্মরণ করিয়ে দেয়। পরে মহম্মদ বিজয়ীর বেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, তখন তিনি যে দয়া, ক্ষমা, ও সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন, তা-ও তাঁকে মহামান্বিত ক'রে তোলে। সত্যের সাধকরূপে মহম্মদের অতি অল্প বয়স থেকেই খ্যাতি জন্মেছিল। তাঁর ধর্ম প্রচারের পূর্বেও

---

* ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম মূলত শোষক শ্রেণীর ধর্ম। সে-ধর্মের বিরুদ্ধে ভারতে জনসাধারণের ধর্ম—কি শৈব ধর্ম, কি বৌদ্ধ ধর্ম—যখনই দেখা দিয়েছে, তখনই সে তার প্রতিরোধ করেছে, নৃশংস হস্তে। তাই গীতায় যেমনই ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রচার, মহাভারতে বা পৌরাণিক কাহিনীতে-ও তেমনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধীদের বিরুদ্ধে হীন প্রচার। ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিদ্বেষী মগধরাজ জরাসন্ধ, পৌণ্ড্রাজ বাসুদেব, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা নরক এবং শৈবধর্মী মহারাজ বাণকে যে ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, তা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

† বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি॥ (গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭)

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০)

তাঁকে সবাই ‘এল্ আমিন’ বা সত্যবাদী, সুবিশ্বস্ত নামেই অভিহিত করতো। মহম্মদকে বহুবার স্বীয় মতবাদের জন্যে প্রথম জীবনে লাঞ্ছিত, প্রহৃত, অত্যাচিত হ’তে হয়েছে। তখনো আমরা দেখি, মহম্মদ নত, নম্রভাবে সমস্ত লাঞ্ছনা অত্যাচার সহ্য ক’রে যাচ্ছেন, এমন কি তাঁর ওপর যখন কঠিন প্রহার চলেছে, তখনো তিনি তার প্রতিবাদ করছেন না, কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। তাছাড়া, মহম্মদ এবং গান্ধী, এঁরা উভয়েই মদ্যপান এবং জুয়াখেলার বিরোধী ছিলেন।* উপাসনা, উপবাস ও ত্যাগ ছিল মহম্মদের ধর্ম। এই দুই চরিত্রের মধ্যে আরো একটি উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। উভয়কেই সত্যপ্রচার এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যে রাজনীতিতে যোগদান করতে হয়েছিল। মহম্মদ হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন, গান্ধীজি অহিংসার। মহম্মদের সময়কার আরব দেশ যদি রোম বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হোতো, তবে মহম্মদের পক্ষে ধর্মের জন্যে অস্ত্র ধারণের নীতি গ্রহণীয় হ’তো কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তেমনি সন্দেহ আছে, ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত না হয়ে যদি কয়েকটি উপজাতির আড্ডা হোতো, তবে গান্ধীজি ধর্মপ্রচারের জন্যে অস্ত্র গ্রহণ করতেন কিনা।

যাই হোক, গান্ধীজি গীতাকে যেমন অংশত গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি অংশত গ্রহণ করেছিলেন ইসলামকে। তাঁর কালের অনুপযুক্ত ব’লেই তিনি হিংসার দিকটিকে আমল দেন নি।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি, গান্ধীজি প্রায় সকল ধর্ম থেকেই কিছু কিছু

* মদিনাতে থাকা-কালেই মহম্মদ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এই পান ও দ্যূতক্রীড়া-বিরোধী নীতির প্রবর্তন করেন। কারণ, মদ্যপান এবং দ্যূতক্রীড়া থেকে মুসলমান-শিবিরে প্রায়ই আত্মঘাতী কলহের উদ্ভব হোতো। ধর্ম-যুদ্ধের পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর।

সূত্রকে তাঁর সমকালীন সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করেছিলেন এক সনাতন ধর্মের নামে। গান্ধীজি তাঁর এই সনাতন ধর্মের নাম দিয়েছিলেন 'নীতি-ধর্ম'।

গান্ধীজির এই নীতিধর্ম কি তা এখন বিচার্য। তিনি *Ethical Religion* গ্রন্থে বলেন: 'The highest moral law is…that we should unremittingly work for the good of mankind." সমগ্র মানবসমাজের মংগলকে লক্ষ্য ক'রেই কাজ করার নাম নীতি-ধর্ম। মানবসমাজের কিসে কল্যাণ হবে, সেই উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করাই নীতি-সংগত কাজ। তাই কেবল উদ্দেশ্যই আমাদের কাজকে নীতি-সংগত বা দুর্নীতি-সংগত ক'রে তোলে। "We see·· that the morality of an action depends ultimately on the nature of the motives that prompt it." কোনো ভালো কাজ ভালো হ'তে পারে না, যদি তার পেছনে শুভ উদ্দেশ্য না থাকে। গান্ধীজি এ-সম্পর্কে একটি উদাহরণও দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে দানশীল হয়ে ওঠে, তবে সেই দান নীতিসংগত হ'তে পারে না। "The very action may be moral or immoral, according to the motive that prompts it." কিন্তু কৌতূহলের বিষয়, গান্ধীজি যখন বলেন যে, উদ্দেশ্যই একমাত্র মানদণ্ড যা ভালো কাজকে নীতি-সংগত করে বা না করে, তখনো তিনি শুভ উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ কোনো 'মন্দ কাজ'কে— যেমন, শ্রেণী-শোষণের উচ্ছেদের জন্যে হিংসাত্মক সংগ্রামকে—নীতি-সংগত ব'লে স্বীকার করেন কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর নীতিধর্ম গ্রন্থে বিন্দুমাত্র আলোচনা করেন নি। কেবল তাই নয়, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো যুক্তিপূর্ণ সুস্পষ্ট মতামত ছিল ব'লেও মনে হয় না। অবশ্য তিনি বলেন: "In

judging the actions of men one should always apply this test—whether it conduces to the welfare of the world or not." এই নীতি অনুসারে অবশ্য গান্ধীবাদের অপেক্ষা মার্কস্‌বাদকেই অধিক নীতি-সংগত বলা চলে। কারণ, গান্ধীজির ত্যাগ ও অহিংসার বাণী মানুষকে ত্যাগী বা হিংসায় বিরত করে নি, কেবল ত্যাগ ও অহিংসার অজুহাতে দারিদ্র্য এবং অন্যায়-সহনকে দীর্ঘস্থায়ী ক'রে তুলেছে। ফলে, সমাজের কোনো কল্যাণ হয় নি, সমাজে হিংসা ও গৃধ্নুতা আরো ভয়াবহভাবে বেড়েছে। অন্যপক্ষে, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব এবং হিংসাত্মক বিপ্লবের পথেই মার্কস্‌বাদ অন্ততপক্ষে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে অন্যায় শোষণ ও শ্রেণী-বিদ্বেষকে করেছে দূরীভূত।

তাই, আমরা দেখি, গান্ধীজি এই উদ্দেশ্যমূলক যুক্তির অবতারণা ক'রেই যেন চমকে উঠেছেন, তিনি দেখেছেন, তাঁর এই কথাগুলি তাঁকে এক ভয়াবহ উপসংহারের গহ্বর-প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। তাই তিনি এক লম্ফে পেছনে হঠে' এসে অকস্মাৎ আর্তনাদ করে উঠেছেন: "The end cannot justify the means". *

কেবল গান্ধীজি নয়, সকল আদর্শবাদীর মধ্যেই যুক্তির এইরূপ স্বত-

---

* যদি সন্দেহ হয়, পাঠক গান্ধীজি-রচিত Ethical Religion গ্রন্থের ৯-১০ পৃষ্ঠা দেখুন। সেখানে নিম্নলিখিত বাক্য দুটি নিতান্ত পাশাপাশি রয়েছে: "Hence no action can be called moral unless it is prompted by a moral intention. The end cannot justify the means." যে কোনো ইংরেজি-জানা সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এ কথা বুঝতে দেরী হয় না যে, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের উপসংহার নয়, আকস্মিক অস্বীকৃতি মাত্র। গান্ধীবাদের আত্ম-বিরোধিতার এটি একটি চরম দৃষ্টান্ত।

বিরোধিতা প্রায়ই দেখা যায়। সুবিখ্যাত আমেরিকান লেখক হেনরি ডেভিড থরোর * রচনা থেকে অনুরূপ একটি অযৌক্তিক যুক্তির উল্লেখ করা চলে। এ বিষয়ে স্মরণীয় যে, হেনরি ডেভিড থরোর প্রভাব গান্ধীজির উপর প্রচুর ব'লে অনেকের বিশ্বাস। থরো একস্থানে বলেছেন: "If he (a man) is in love, he loves, if he is in heaven, he enjoys ; if he

---

* থরো-র (১৮১৭-৬২) প্রভাব গান্ধীজির উপর আংশিক মাত্র ছিল। ১৮৪৫ সালে থরো সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ববাদের একনিষ্ঠ সাধক হিসাবে জীবনযাপনের জন্যে জন-সমাজ পরিত্যাগ ক'রে ওঅল্ডেন অরণ্যে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি রবিনসন ক্রুসোর মতোই নির্জনে নিঃসংগ জীবন যাপন করতে থাকেন, এমন কি নিজের বাসোপযোগী কুটিরখানি পর্যন্ত স্বহস্তে রচনা ক'রে নেন। এই অরণ্য-বাস কালে থরো-র মধ্যে একদিকে যেমন সমাজবিরোধী ব্যষ্টিবাদী চিন্তা পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে, তেমনি তিনি প্রকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ অনাবৃত সংস্পর্শে আসায় তাঁর মধ্যে প্রাকৃতিক নীতি ও রীতি-গুলি-ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুচিন্তিত আকার ধারণ করে। গান্ধীজি থরো-র উগ্র ব্যষ্টিবাদী চিন্তাগুলিকে যখন গ্রহণ করলেন, (কারণ, ভারতীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পক্ষে এই ব্যষ্টিবাদী দর্শনই ছিল অনুকূল), তখনই থরো-র হিংসাত্মক সংগ্রামী উপদেশ-গুলিকে তিনি সতর্কতার সংগে এড়িয়ে গেলেন। (অবশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিই সেজন্য দায়ী)। প্রকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসায় অহিংসার ধর্মকে থরো স্বাভাবিক ব'লে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলেন:

"I love to see that Nature is so rife with life that myriads can be afforded to be sacrificed and suffered to prey on one another." আবার অন্যত্র, "Poison is not poisonous after all, nor are any wounds fatal. Compassion is very untenable ground. It must be expeditious."

তথাকথিত আধুনিক লেখক আল্ডাস্ হাক্স্লি একদা উগ্র গান্ধীবাদী হ'য়ে উঠলে-ও যখন তিনি পর্যটকের জীবন যাপন করতেন এবং প্রকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ

is in hell, he suffers. It is his condition that determines his locality." এখানে মানবিক অবস্থা অর্থেই থরো condition কথাটি প্রয়োগ করেছেন, যদিও সে-প্রয়োগ অত্যন্ত শিথিল হয়েছে। প্রথম বাক্যে থরো বলেছেন, "যে প্রেমে পড়ে, সে ভালোবাসে ; যে স্বর্গে থাকে, সে আনন্দ উপভোগ করে ; যে নরকে থাকে, সে পায় যন্ত্রণা।" অর্থাৎ প্রেমে, স্বর্গে বা নরকে অবস্থানই (locality) মানুষের মানসিক অবস্থা—ভালোবাসা, আনন্দ উপভোগ, যন্ত্রণা পাওয়া প্রভৃতি condition-

---

এসেছিলেন, তখন তিনি প্রকৃতির কেবল উদার সস্নেহ ভাবটিকেই স্বীকার করেন নি। প্রকৃতি তাঁর কাছে কখনো কখনো ভয়ংকর নৃশংস দানবের মূর্তিতে-ও দেখা দিয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে ওআর্ডস্বার্থ বা ওআর্ডস্বার্থের ভক্তদের এককালে তীব্রতম তিরস্কার ও বিদ্রূপ ক'রেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, প্রকৃতির অবারিত কবলে পড়লে রুশোর এমিল আর ওআর্ডস্বার্থের লুসির কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেঁচে থাকাও হয়তো সম্ভব হোতো না। কিন্তু হাক্সলির দৈহিক দৃষ্টির মতোই মানসিক দৃষ্টি-ও কখনো স্বাভাবিক স্বচ্ছ ছিল না। তাই তিনি পরবর্তীকালে কোনো সত্যিকারের নীতিবাদে গিয়ে পৌছতে পারেন নি। অন্যান্য আইডিয়ালিস্টদের মতোই স্বতবিরোধিতার গোলক ধাঁধায় তিনিও জড়িয়ে পড়েন।

যাই হোক, সমগ্র গান্ধীবাদ সম্পর্কে আমরা থরো-র একটি বাণী স্মরণ না ক'রে পারি না :

"The broadest and most prevalent error requires the disinterested virtue to sustain it."

বস্তুত, গান্ধীজির ব্যক্তিগত নিঃস্বার্থপরতা, উদার হৃদয় এবং স্নেহশীল মহত্ত্বই যে গান্ধীবাদের অন্যতম প্রধান উপজীব্য এবং আশ্রয় ছিল, এ কথা-ও নিঃসন্দেহে বলা চলে। হিটলারের ব্যক্তিগত চরিত্র যে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের জন্যে কতক পরিমাণে দায়ী হয়েছিল, এ কথা-ও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না।

কে নির্ধারণ করে। কিন্তু থরো দার্শনিক হিসাবে ছিলেন আইডিয়ালিস্ট বা ভাববাদী। সুতরাং তাঁর মতে মানুষের মনই—অবস্থা বা circumstance নয়—মানুষের মানসিক অবস্থার চূড়ান্ত নির্ধারক অর্থাৎ বিধাতা পুরুষ। তাই থরো তাঁর নিজের প্রদত্ত যুক্তির দিকে লক্ষ্য না রেখেই নিতান্ত অভ্যাসবশে অকস্মাৎ বলে ওঠেন: মানসিক অবস্থাই মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নির্ধারিত করে—"It is his condition that determines his locality."

গান্ধীজিও ঠিক থরোর মতোই নিজের প্রদত্ত যুক্তির দিকে লক্ষ্য না রেখে নিতান্ত অভ্যাস-বশেই অকস্মাৎ ব'লে ওঠেন: "The end cannot justify the means."

আসলে, ভাববাদী দর্শনের স্বরূপই এই!

গান্ধীজি তাঁর *Ethical Religion* গ্রন্থে উদ্দেশ্যের উপরই নীতির সমগ্র জোরটুকু দিয়ে ফেললেও আলডাস্ হাক্সলি প্রভৃতি গান্ধীবাদীরা কিন্তু গান্ধীজির অপেক্ষা অধিক সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা পরম জ্ঞানের আধার ব'লে গ্রহণ এবং ঘোষণা করেছেন: "The hell is paved with good intentions" কথাগুলিকে। * তাঁরা বলেন, শুভ উদ্দেশ্যই যথেষ্ট নয়, উপায়ও যথেষ্ট শুভ হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্য এবং উপায়কে এক হ'তে হবে। অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে পথ ও গন্তব্যস্থান এক ও অভিন্ন না হ'লে পদক্ষেপই অসম্ভব। যে পথিকের গন্তব্য স্থলের দিকে একপাও অগ্রসর হবার ইচ্ছা নেই, কেবল সেই পথিকই পথকে গন্তব্য স্থান ব'লে মেনে নেয় বা পথকে গন্তব্য স্থলের অপেক্ষা পবিত্রতর মনে করে। তাই উদ্দেশ্যের চেয়ে উপায়ের দিকেই মনোযোগ দেন তাঁরা বেশি,—তীর্থ-পথকেই পবিত্রতর

* আল্‌ডাস্ হাক্‌স্‌লির 'Ends and Means' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ব'লে ঘোষণা করেন তীর্থের চেয়ে। তাই তাঁদের উদ্দেশ্য কখনো কাজে পরিণত হয় না, অভীষ্ট তীর্থে গিয়ে তাঁরা কখনো উত্তীর্ণ হ'তে পারেন না। তাঁরা সবাই উপায়কেই উদ্দেশ্য বানিয়ে, তীর্থপথকে তীর্থ ব'লে ঘোষণা ক'রে —তাঁদের সমগ্র জীবন পথে ব'সেই কাটিয়ে দেন। কিন্তু অন্যপক্ষে মহম্মদ,* লেনিন ও স্টালিন উপায়ের চেয়ে উদ্দেশ্যকেই বড়ো করে দেখেছেন, তাই কণ্টকিত পথে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তপদে তাঁদের যাত্রা শুরু হয়েছে।

এইভাবে আমরা দেখি, উদ্দেশ্যের ও উপায়ের দ্বন্দ্বে-কলহে গান্ধীজির নীতিবিজ্ঞান বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। নীতি সম্পর্কে গান্ধীজি আর একস্থানে বলেছেন: "Another feature of moral law is that it is eternal and immutable.…The sun is visible to us when our eyes are open and becomes invisible when they are closed. This does not mean any change in the sun, but only in our vision."

অন্যান্য ভাববাদী দার্শনিকের মতোই এখানেও আবার গান্ধীজির এক-দর্শিতা দেখা যায়। তাঁরা বাইরের জগৎ বা object থেকে ব্যক্তি বা subject-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে গান্ধীজি বলছেন: কেউ যখন চোখ মেলে তাকায়, তখন সে সূর্যকে দেখে, এবং যখন সে চোখ বন্ধ করে, তখন সে আর সূর্যকে দেখতে পায় না। সুতরাং গান্ধীজির মতে, এখানে আমরা সূর্যের মধ্যে (object-এর মধ্যে) কোনো পরিবর্তন দেখি না, পরিবর্তন দেখি আমাদের দৃষ্টির মধ্যে (অর্থাৎ subject-

* মহম্মদ অন্যান্য ধর্ম প্রচারকদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন। তাই তাঁর কল্পিত স্বর্গে খাদ্য, পানীয় ও বিলাসের প্রাচুর্যই অধিক দেখা যায়। কারলাইল-ও এ সম্পর্কে বলেন: "He had an eye for the world, this Mahomet."

এর মধ্যে)। কথাটি সত্য। কিন্তু এর বিপরীতটিও যে অনুরূপ সত্য, গান্ধীজি তা অন্যান্য idealist দার্শনিকের মতো লক্ষ্য করেন নি। এখানেই গান্ধীজির তথা গান্ধীবাদের একদর্শিতা। কেবল দৃষ্টি-শক্তির মধ্যে পরিবর্তন এলেই যে আমরা সূর্যকে দেখবো বা না-দেখবো, তা নয়। দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অক্ষুণ্ণ থাকলেও, যদি সূর্যের অবস্থানের মধ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে, তা হ'লেও আমরা সূর্যকে দেখতে পাবো না। যেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, কি রাত্রিতে। আইডিয়ালিস্টরা কিন্তু এই পারস্পরিকতায় বা relativityতে বিশ্বাস করেন না। সেই তাঁদের চরম ত্রুটি। ব্যক্তি ও বস্তুর (subject ও object এর) পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাসী হ'লে গান্ধীজি কখনো তাঁর নীতি-সূত্রকে সনাতন ও শাশ্বত ব'লে ঘোষণা করতেন না, ভিন্ন স্থানে ও কালে যে নীতিসূত্রের নিরন্তর পার্থক্য ঘটছে তা লক্ষ্য করতেন। আইডিয়ালিস্ট দার্শনিকরা যখন কেবল ব্যক্তির উপর জোর দেন, তখন আবার ফরাসী 'যান্ত্রিক' বস্তুবাদীরা কেবল অবস্থার (circumstances) উপরই জোর দিতেন। এই দুটি বিরোধী মতবাদ যে কেবল বিরোধী নয়, পরিপূরক-ও, তা প্রমাণ ও প্রচার করেন মার্কস্ এবং মার্কসিস্টরা। বস্তু এবং ব্যক্তি তাঁদের কাছে পারস্পরিক সম্পর্কে গ্রথিত। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে, আলবার্ট আইনস্টাইনের পরেও যাঁরা এই পারস্পর্যকে অস্বীকার করেন, অথচ 'বৈজ্ঞানিক চিন্তার' বড়াই করেন, তাঁদেরকে অবশ্য বলার কিছুই নেই।

এই গেল গান্ধীবাদী নীতির স্বরূপ। আবার দেখি, নীতির সংগে ধর্মের কি সম্পর্ক, সে নিয়েও গান্ধীজি কম বিপদে পড়েন নি। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে গান্ধীজির কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তিনি কখনো বলেন: "Religion is to morality what water is to the seed that is

sown in the soil." অর্থাৎ ধর্ম জল এবং নীতি বীজ। কিন্তু আবার তিনি বলেন : "Just as a building falls to the ground when the foundation is shaken, all religions must sink in the dust if their moral basing were to be disturbed." ধর্ম প্রাসাদ, নীতি তার ভিত্তি। ধর্ম নীতির উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ, গান্ধীজি-প্রদত্ত পূর্বের উপামাটি যদি পাঠকের মনে থাকে, তবে তিনি বুঝবেন, গান্ধীজি এখন বলছেন, বীজের ওপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে জল !! কেবল তাই নয়, পরমূহূর্তেই গান্ধীজি আবার বলেন : "It follows from what has been said that the true religion is, in fact, identical with morality." সত্যিকারের ধর্মের সংগে নীতির কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ জল ও সত্যিকারের বীজ একই পদার্থ! "Religion, then, is synonymous with allegiance to moral law." এইরূপে আমরা গান্ধীজির নীতি ধর্মকে কতকগুলি বিভিন্ন অভিমতের, সামঞ্জস্যহীন সংকলন হিসাবেই দেখি।

স্থতরাং গান্ধীজি যখন তাঁর রাজনীতির সংগে ধর্মালোচনা ও ধর্মানুশীলন করতে লাগলেন, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে, তিনি তাঁর সুবিধামতো সময়োপযোগী কয়েকটি নীতি-সূত্রকে গ্রহণ ও অভ্যাস করলেন মাত্র। এবং এই নীতি-সূত্রগুলিযখন আরো পঁচিশ বছর বাদে আর সময়োপযোগী রইলো না, তখন তা-ই ভারতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পথে প্রধানতম অন্তরায় হ'য়ে দেখা দিলো। সকল দেশে সকল কালে ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পের এই একইইতিহাস। ভারতবর্ষের বা গান্ধীজির বেলাতেও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নি।

নয়

ভারত সফর শেষে গান্ধীজি ব্রহ্মদেশ ভ্রমণে-ও যান। এই ভ্রমণ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "বোম্বাই যেমন ভারতবর্ষ নয়, রেংগুন-ও তেমনি ব্রহ্মদেশ নয়।" তাঁর কাছে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের মতোই তার মুষ্টিমেয় সহরের মধ্য দিয়ে নয়, অসংখ্য গ্রামের মধ্য দিয়েই ধরা দিয়েছিল। এই সময়ে আবার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাত্রা ক'রে তাঁর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা হয়। গোখলে এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধীজিকে ট্রেনে তুলে দিতে আসেন। ঐদিন গোখলে তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি ফার্স্ট ক্লাসে গেলে আমি আসতাম না। কিন্তু এখন আর না এসে পারি না।" সাধারণ মানুষের জন্যে এঁদের করুণা ও সহানুভূতি যে আন্তরিক ছিল, তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তবু, ইতিহাসের কঠিন নিয়ম অনুসারে তাঁরা ধনিক এবং জমিদারের লড়াই-ই ক'রে গেছেন। তাঁদের কালের গণ্ডী তার উর্ধ্বে বা বাইরে তাঁদের কখনো যেতে দেয় নি!

গোখলের ইচ্ছা ছিল, গান্ধীজি বোম্বাই-এ ব'সে প্র্যাকৃটিশ করেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে যোগ দেন। গান্ধীজির-ও সেই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু নিজের ব্যারিস্টারি করার ক্ষমতার উপর তাঁর নিজের বিশেষ আস্থা ছিল না। তাই প্রথমে তিনি রাজকোটে ফিরে গেলেন। সেখানে কয়েকটা কঠিন মামলা চালিয়ে তাঁর নিজের ওপর খানিকটা আস্থা যেন হোলো। এবার তিনি বোম্বাই থেকে-ও মামলা চালাবার জন্যে ডাক পেলেন। ফলে তিনি বোম্বাই-এ গিয়ে প্র্যাকৃটিশ সুরু করলেন। কিন্তু

শীঘ্রই আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ডাক এসে গেলো। চেম্বারলেন সাহেব আসছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তাঁর কাছে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষ থেকে একটা ডেপ্যুটেশন্ পাঠাতে হবে। তাই অবিলম্বে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা রওনা হলেন। আরো চার পাঁচজন ভারতীয় যুবকও তাঁর সংগে গেলেন। তাঁদের মধ্যে মগনলাল গান্ধী একজন।

চেম্বারলেন এসেছিলেন বুয়ার যুদ্ধে বৃটিশ সরকারের খরচ বাবদ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা আদায় করতে। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা যেখানেই সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে ব্যয়িত অর্থটা তারা সেখান থেকেই করেছে উদ্ধার। ভারতবর্ষে-ও তারা তাই করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্যে, আফগান যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে, কিম্বা অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার জন্যে ভারতে ব্যয়িত সমস্ত অর্থের ভার বহন করতে হয়েছে ভারতবর্ষকেই। সুতরাং বুয়ার যুদ্ধের ব্যয়ভারও বহন করতে হোলো বুয়ারদেরই। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের ব্যাপারে চেম্বারলেন সাহেব এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে, ভারতীয়দের আবেদন অভিযোগে কর্ণপাত করার মতোন সময় তাঁর ছিল না। আর কর্ণপাত ক'রেই বা করবেন কি? বুয়াররা যে অত্যাচার অবিচার ভারতীয়দের ওপর করেছে, বৃটিশ পুঁজিও তো এবার তাই করবে। কারণ, বৃটিশ পুঁজির সংগে ভারতীয় তথা এশীয় পুঁজির প্রতিযোগিতা তারাও তো চায় না!

যাই হোক, মাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকার কথা ছিল মিঃ চেম্বারলেনের। তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই সারা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে শেষ করবেন, স্থির করেছিলেন। তাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাঁকে ঝড়ের বেগে ছুটতে হোলো। শীঘ্রই তিনি নাতাল ছেড়ে ট্রান্সভাল রওনা হ'য়ে

গেলেন। ভারতীয়দের আবেদন-নিবেদনও প্রিটোরিয়াতে গিয়ে করাই হোলো স্থির। কিন্তু বুয়ার যুদ্ধের পর ট্রান্সভালে প্রবেশ সম্পর্কে কড়া আইন কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল, ছাড়পত্র ছাড়া সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের সময় যাঁরা দোকানপাট এবং ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়েছিলেন, তাঁদের পুনর্বসতির হুকুম দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু সেই সংগে ছাড়েরও হয়েছিল ব্যবস্থা। কিন্তু ছাড় চাইলেই ভারতীয়দের মিলতো না। ট্রান্সভালের ঔপনিবেশিক সরকার এই ভাবে ট্রান্সভাল থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদায় করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মুখপাত্র গান্ধীজির ছাড়পত্র পাওয়া সহজে ঘটে উঠলো না। গান্ধীজি তাঁর পুরাতন বন্ধু ডারবানের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আলেকজাণ্ডারের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর সাহায্যে একটি প্রবেশপত্র কোনোরকমে সংগ্রহ করলেন। কিন্তু তাতেও বিপদের শেষ হোলো না, ভারতীয় প্রতিনিধি দল থেকে গান্ধীজিকে বাদ দেওয়ার জন্যে বৃটিশ মামলারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। প্রথমে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করার কথা ভাবলো, কিন্তু অবশেষে স্থির করলো যে, অন্য অজুহাতে-ও তাঁকে প্রতিনিধি-দল থেকে বাদ দেওয়া যায়। কারণ হিসাবে দেখানো হোলো, যেহেতু নাতালে গান্ধীজির সংগে চেম্বারলেনের সাক্ষাৎ হয়েছে, সেইহেতু বর্তমান প্রতিনিধি দলে তাঁকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমলাদের কাছে গান্ধীজিকে অনেক অপমান-লাঞ্ছনা-ও সইতে হোলো। নেতৃস্থানীয় গান্ধীজির এই অপমানে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রতিনিধি দল পাঠাবেন না স্থির করলেন। কিন্তু গান্ধীজি তাঁদের বোঝালেন যে, এখন ভারতীয়দের শক্তি সঞ্চয়ের সময়, সুতরাং তাঁদের এখন অতো বেশি অনুভূতিপ্রবণ হ'লে চলবে না, ফল হোক আর নেই-হোক, প্রতিনিধি-

দল একটা পাঠাতেই হবে, প্রয়োজন হ'লে তাঁকে নিজেকে বাদ দিয়ে-ও। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়েই প্রতিনিধি দল পাঠানো হোলো।

সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করলেন ভারতীয় ইংরেজ ব্যারিস্টার জর্জ গডফ্রে।

প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে কোনো লাভ হোলো না, হবে ব'লে বড়ো একটা আশা-ও ছিল না। তবু সংগ্রাম সুরু করার আগে গান্ধীজি আপোষ-অলোচনার বিধিসংগত পথগুলো শেষ ক'রে রাখতে চাইলেন। সেদিক থেকে এই প্রতিনিধি-দল প্রেরণকে সংগ্রামের উপক্রমণিকা হিসাবে ধরতে হবে।

যাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী আমলারা প্রথম থেকেই গান্ধীজিকে মনে-প্রাণে ভয় করতো। তাই তারা তাঁকে মিঃ চেম্বারলেনের সংগে কেবল দেখা করতে না দিয়েই বিরত থাকলো না, অবিলম্বে তাঁকে ট্রান্সভাল ত্যাগ করার আদেশ দিলো। কিন্তু এই আদেশ সহজে মেনে নেওয়া-ও গান্ধীজির পক্ষে ছিল অসম্ভব, তিনি ন্যায়সংগত ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে চাইলেন না। তাই গান্ধীজি ট্রান্সভাল তো ত্যাগ করলেন-ই না, বরং ট্রান্সভালে থেকেই ওকালতি করা স্থির করলেন। ফলে, অবিলম্বে তিনি জোহান্স্বার্গে তাঁর ওকালতির আফিস খুলে বসলেন। ওকালতিতে গান্ধীজির পশার বেড়ে চললো দ্রুত। তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা-ও বৃদ্ধি পেলো উত্তরোত্তর। তাঁর স্নেহসজল উদার হৃদয় এবং বিপুল ব্যক্তিতের আকর্ষণ থেকে দূরে থাকা মানুষের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। শ্বেতাংগদের মধ্যে-ও অনেকের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠলো। রীচ সাহেব তো এক ব্যবসায়ী কোম্পানির ম্যানেজা-রের পদ ছেড়ে দিয়ে এসে গান্ধীজির কাছে ক্লার্ক হ'য়ে রইলেন। পশার

হওয়ার সংগে আফিসের কেরাণীর-ও প্রসার হোলো। টাইপিস্ট হ'য়ে এলেন একজন ইংরেজ মহিলা। তবে কেবল অর্থোপার্জন নিয়েই গান্ধীজি মেতে রইলেন না। তখন তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মুক্তিসাধন। সুতরাং জনসংগঠন এবং জনসেবার দিকেও গান্ধীজি অমনোযোগী হলেন না। ধর্মানুশীলনও চলতে লাগলো সমান তালে। অর্থোপার্জনের সংগে সংগে তাঁর ভয় হোলো, 'বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ' পুরুষের অবস্থা-প্রাপ্তি তাঁর না ঘটে। তাই গীতার 'সমভাব', 'অপরিগ্রহ' 'নিষ্কাম কর্ম' প্রভৃতি কথাগুলি কেবলই তাঁর চেতনায় ও চিন্তায় ফিরে ফিরে আসতে লাগলো। এমনি ভাবে কর্মের সংগে ধর্মের মিলন ঘটাবার যে চেষ্টা বহু পূর্বে তাঁর জীবনে শুরু হয়েছিল, তা ক্রমেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো—যে পরিণতি বারে বারে এলো রাজনীতিতে বিপর্যয়রূপে।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকাটি প্রথম বার হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মনসুখ লাল নাজর। কিন্তু পকৃতপক্ষে সম্পাদনার ভার এসে পড়েছিল গান্ধীজির নিজের ওপর। পত্রিকার ব্যয়ভারের অধিকাংশও তাঁকেই বইতে হোতো, প্রতিমাসে সেজন্যে তাঁর লাগতো প্রায় এগারো শ' টাকা। পাছে বিষয়-সম্পত্তিতে এবং ভোগবিলাসে নিমজ্জিত হ'য়ে পড়েন, এই ভয়ে গান্ধীজি ইতিপূর্বেই সাংসারিক ব্যয় অত্যন্ত কমিয়ে ফেলেছিলেন, এবারে তিনি জীবন বীমার প্রিমিয়াম দেওয়া-ও বন্ধ ক'রে দিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি হ'য়ে উঠলেন বীমার বিরোধী। তিনি বলেন, যারা ভীরু, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারাই করে বীমা। এ বিষয়ে বার্ণার্ড শ-র কথাও মনে পড়ে। তিনিও জীবন বীমার বিরোধী। তাঁর মতে, ও এক প্রকার জুয়াখেলা। বস্তুত, বীমা কোম্পানির সংগে মানুষ বাজী

রাখে। বীমা কোম্পানি বলে: 'আপনি এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মরবেন না।' আর মানুষ বলে, 'মরবো নিশ্চয়ই।' সুতরাং বাজী। নির্দিষ্ট সময়ের আগে লোকটি মারা গেলে কোম্পানি বাজিতে হারে এবং নির্দিষ্ট টাকা দিতে বাধ্য হয়। অন্য পক্ষে, লোকটি না মরলে জেতে কোম্পানি, পুরস্কারস্বরূপ সে স্বল্প সুদে দীর্ঘকালের মেয়াদে টাকা ধার পায়। বিনা পরিশ্রমে অর্থোপার্জনের বিরোধী বার্ণার্ড শ। আর জুয়াখেলা হোলো বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন। সুতরাং তিনি জুয়ার তথা জীবন বীমার তীব্র বিরোধী।

শ অংশত মার্ক্সের ছাত্র। তাই তাঁর কাছে ধর্মনীতি প্রশ্রয় পায় নি, পেয়েছে অর্থনীতি। শ-র নৈতিক নিয়মগুলিকে প্রধানত অর্থনীতিই নির্ধারিত নিয়ন্ত্রিত করেছে। অন্যপক্ষে, গান্ধীজি তাঁর জীবনে ও সমাজে ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ায় সামাজিক নীতির নির্দেশগুলিও তাঁর কাছে এসেছে ধর্মের—অর্থাৎ ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে। গান্ধীজির চরিত্রের সংগে শ-র চরিত্রের মূল পার্থক্যই এখানে। শ বুদ্ধিবাদী, যুক্তিতে তাঁর গভীর বিশ্বাস। গান্ধীজি অতিন্দ্রীয়বাদী, হৃদয়ের উপর তাঁর চূড়ান্ত নির্ভর। তাই শ উদ্বর্তনবাদী, গান্ধীজি সনাতনী। শ তাকান সম্মুখে, গান্ধীজি পশ্চাতে। তাই আমরা দেখি, শ এবং গান্ধী, উভয়েই মানবহিতৈষী হওয়া সত্ত্বে-ও, উভয়ের প্রকৃতি বিভিন্নধর্মী, উভয়ের দৃষ্টি বিভিন্ন দিকে।

গান্ধীজির জীবনে ধর্ম এবং রাজনীতি ছিল যেমন দুটি প্রধানতম দিক, তেমনি আর একটি প্রধান দিক ছিল—সেবা। তাঁর কাছে এই সেবা কেবল তাঁর ধর্মানুশীলনের অংগমাত্র ছিল না, ছিল তাঁর রাজনীতির-ও অংগ। সেবার পথেই গান্ধীজির নেতৃত্ব শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। কারণ, তিনি সেবার দ্বারাই একদা দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ কৃষাণ মজুরের হৃদয় হরণ করে-

ছিলেন, যে কৃষাণ মজুরের সাহায্য ও সাহচর্য ভিন্ন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেবল সেবার মধ্য দিয়েই যে তিনি একদা নেতার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবেন, এ পরামর্শ সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন খৃস্টের বাণীর মধ্যেই :

"...but whosoever will be great among you, shall be your minister : And whosoever of you will be the chiefest, shall be servant of all.„ (Mark x 43, 44)

যেভাবেই হোক সেবার পথেই শ্রেষ্ঠত্বকে আয়ত্ত করতে হবে, গান্ধীজি একথা বুঝেছিলেন। তাই রাজনীতি ও ধর্মানুশীলন সংক্রান্ত কার্যকলাপ তাঁর যতোই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, সেবার কাজেও তিনি ততো নিবিড়ভাবে মনোনিবেশ করলেন। ট্রান্সভালে তাঁর সেবাকার্য চললো পূর্ণোদ্যমে, কুলী বস্তি নিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের 'কুলী' বলা হোতো, আর এই কুলীরা দক্ষিণ আফ্রিকার সমাজে ছিল অস্পৃশ্য। একটি সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে তাদের বাস করতে হোতো, এবং এই বাসস্থানেও তাদের জমিজমা কেনার কোনো অধিকার ছিল না। ফলে ভারতীয়দের বাসের জন্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলটা মনুষ্যবাসের উপযোগী না হ'য়ে, হ'য়ে উঠেছিল নোংরা জঘন্য একটা আস্তাবল। জমিতে মালিকি স্বত্ব না থাকায় এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি বা পরিচ্ছন্নতার দিকে ভারতীয় ধনিকরা যেমন লক্ষ্য দিতো না, তেমনি শ্বেতাংগ-শাসিত সরকার বা পৌরবিভাগের লক্ষ্যও সেখানে কখনো পৌছতো না। এমনিভাবেই এই অঞ্চলটি দিনে দিনে ভয়াবহভাবে অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। ভারতীয় পল্লীর এই অস্বাস্থ্য এবং অপরিচ্ছন্নতাটাই আবার শ্বেতাংগ ধনিক-শাসিত সরকার তথা পৌর-বিভাগের কাছে এই অঞ্চল থেকে ভারতীয়দের উচ্ছেদের সুযোগ হিসাবে

দেখা দিলো। পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিতাড়িত অধিবাসীদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থাও হোলো একটা। তবে এই ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্যে রীতিমতো আইন-আদালত করতে হোতো। গরীব ভারতীয়দের পক্ষে তা' করা প্রায় ছিল অসম্ভব। তাই ব্যাপারটি গান্ধীজি নিজের হাতে নিলেন। মামলায় মিউনিসিপ্যালিটি হারলে মামলার ব্যয় মিউনিসিপ্যালিটি-কেই বইতে হোতো। সুতরাং স্থির হোলো, হারজিত যাই হোক, প্রত্যেকটি মামলার জন্যে ভারতীয়রা তাঁকে দশ পাউণ্ড ক'রে দেবে। তাছাড়া, যে-সব মামলায় মিউনিসিপ্যালিটির হার হবে, সে ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির কাছে প্রাপ্য মামলা বাবদ খরচটা-ও গান্ধীজিই নেবেন। সেই সংগে এ-ও স্থির হোলো যে, ঐ টাকার অর্ধেক গরীব জনসাধারণের সেবায় ব্যয়িত হবে। এই ভাবে প্রাপ্ত অর্থ থেকে প্রায় চব্বিশ হাজার টাকা তিনি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকার জন্যে ব্যয় করেন।

উচ্ছেদ-ব্যবস্থা যাদের বিরুদ্ধে চলেছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল বিহার ও মাদ্রাজ অঞ্চলের গিরমিটিয়া। তারা তাদের চুক্তিশেষে এখানে স্বাধীন-ভাবে ব্যবসায় ও বসবাস করছিল। পূর্বে গিরমিটিয়াদের সাহায্য এবং সেবা-শুশ্রূষা ক'রে নাতালেও গান্ধীজি শ্রমিকদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এবার বস্তি-উচ্ছেদের ব্যাপারে ট্রান্সভালে তিনি শ্রমিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠলেন। এখানের শ্রমিকরা নিজেদের দাবী-দাওয়া আদায় এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্যে ইতিপূর্বেই একটি স্বতন্ত্র সংঘ গ'ড়ে তুলেছিল। এই শ্রমিক সংঘের নেতা ছিলেন জেরাম সিং বদ্রী। গান্ধীজি এঁদের এই শ্রমিক সংঘের সাহায্যে এসে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনকে একদা শক্তিশালী ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অস্বাস্থ্য এবং অপরিচ্ছন্নতার অজুহাতে ভারতীয়-অধ্যুষিত বস্তি-অঞ্চলটি

মিউনিসিপ্যালিটির কবলে গেলো সত্য, কিন্তু সেখানের অস্বাস্থ্য এবং অপরিচ্ছন্নতা দিনে দিনে বাড়লো বই কমলো না। কারণ, বস্তির বাসিন্দারা এখন মিউনিসিপ্যালিটির অস্থায়ী ভাড়াটে হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলো। পূর্বে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে যে-টুকু পরিচ্ছন্নতা, সতর্কতা বা তাদের ছিল, সেটুকুও এবার তিরোহিত হোলো নিঃশেষে। আবর্জনা স্তূপী-কৃত হোলো, দুর্গন্ধ পচা পূতিগন্ধময় নর্দমা নরকের বর্ণনাকেও হার মানিয়ে দিলো। অবিলম্বে এলো মহামারী। অকস্মাৎ সমগ্র ভারতীয় পল্লী মুমূর্ষুর আর্তনাদে, শোকার্তের ক্রন্দনে, ভয়ার্তের-চীৎকারে গেলো ভ'রে। প্লেগ। নিউমোনিক প্লেগ। এই প্লেগের আক্রমণ হয় ফুসফুসে, তাই এ প্লেগ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক। জোয়ান জোয়ান মানুষের চওড়া চওড়া বুকগুলো এতটুকু হ'য়ে গেলো, মুখে রা সরলো না। কে কার সেবা করে, স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-স্বজন, কে কার খোঁজ নেয়। পালাও, পালাও। ছায়া মূর্তির মতো মানুষের দল হয় মরতে, নয় পালাতে লাগলো। গান্ধীজিও নিঃসংকোচে নিরাপদে পালাতে পারতেন। কিন্তু পালালেন না। মৃত্যুর সংগে মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার, তাকে চেনবার, তার সংগে খেলা করবার অপূর্ব একটি সুযোগ যেন তাঁর জুটে গেলো। এ যে কেবল সেবার সুযোগ তাই নয়, এ সুযোগ যেন বৈজ্ঞানিকের সুযোগ কোনো পরীক্ষাগারে, দার্শনিকের সুযোগ মৃত্যুর সান্নিধ্যে। মৃত্যুকে চিনতে হবে, মৃত্যুকে জানতে হবে, তার সংগে লড়াই ক'রে দেখতে হবে, অবশেষে আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি তার চেয়ে বড়ো, এই শেষকথা ব'লে চলে যেতে হবে,—এই কল্পনায়, এই আশায় বুঝি গান্ধীজির বুক ভ'রে গেলো। সকলের আগে এই 'শীর্ণ ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষটি' * মরণের সমস্ত ভ্রূভংগকে

* অনেকেই গান্ধীজিকে শীর্ণ, ক্ষুদ্র, দুর্বল মানুষটি ব'লে বর্ণনা করেছেন। দৈহিক বিশালতা গান্ধীজির ছিল না, এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁকে শীর্ণ বা দুর্বল বলতে সংকোচ

হেলায় তুচ্ছ ক'রে সেবার কাজে নেমে এলেন। এ বিষয়ে তাঁর কয়েকজন সুবিশ্বস্ত অনুচর হলেন তাঁর অনুগামী।

সৌভাগ্যক্রমে প্লেগের সূত্রপাতটা ভারতীয় পল্লীতে হয় নি, নইলে-সেই অজুহাতে আর এক দফা ভারতীয়-দলন সুন্দরভাবে চলতে পারতো। প্লেগ প্রথমে দেখা দিয়েছিল, খনি অঞ্চলে, নিগ্রোদের মধ্যে। এই অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার ভার ছিল খোদ শ্বেতাংগদের হাতে।···প্লেগ সম্পর্কে গান্ধীজি সংবাদপত্রে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি পল্লীর অস্বাস্থ্য, অপরিচ্ছন্নতা এবং মহামারীর জন্যে মূলত দায়ী করেন মিউনিসিপ্যালিটিকে। এতে অন্য কোনো লাভ হোক, আর নেই হোক,গান্ধীজির কয়েকজন সহৃদয় শ্বেতাংগ বন্ধুলাভ ঘটেছিল। মিঃ হেনরি পোলক, মিঃ জোসেফ ডোক এবং

হয়। চলৎ-শক্তির দিক থেকে গান্ধীজি ছিলেন অতি-মানুষ। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনের সময়ে তাঁকে প্রায় প্রতিদিন পায়ে হেঁটে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে হোতো। একদিন তিনি ৫৪ মাইল পথ-ও অতিক্রম ক'রেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে-ও তিনি এতো দ্রুত হাঁটতেন যে, বেশ শক্তিশালী ক্যামেরাতে-ও তাঁর ফটো নেওয়া একটি দুরূহ ব্যাপার ছিল।

গান্ধীজি হাঁটার উপযোগী হিসাবে স্যাণ্ডেল ব্যবহারের প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে এই ধরণের চটিই স্বাভাবিক। গোটা পা ঢাকলে, পায়ে সহজে ঘাম হয়। ফলে, গান্ধীজির মতে, পা নরম হ'য়ে যায়। তাই গান্ধীজি তাঁর শিষ্য-সামন্তদের মধ্যে স্যাণ্ডেলের প্রচলন করেন এবং কংগ্রেসীদের অন্যতম অংগত্রাণ বা আভরণ হিসাবে স্যাণ্ডেল যুগলকে প্রায়ই শোভমান দেখা যায়। অবশ্য, এই স্যাণ্ডেল ব্যবহার সম্পর্কে-ও গান্ধীজির উপর যে খৃস্টের বাণীর প্রভাব ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। খৃস্টের বাণী স্মরণ করুন ঃ

"But be shod with sandals, and not put on two coats"' অর্থাৎ গান্ধীজির দারিদ্র্য-বিলাসের অংগ-ও ছিল এই চটিজোড়া।

মিঃ অ্যালবার্ট ওয়েস্ট তাঁদের অন্যতম। একটি নিরামিষ হোটেলে মিঃ-ওয়েস্টের সংগে গান্ধীজির আলাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন একটি ছাপাখানার অংশীদার। প্লেগ-রোগীদের সেবার কাজে তিনি গান্ধীজির সাহায্য করতে চাইলেন। কিন্তু প্লেগ তখন অনেক পরিমাণে ক'মে এসেছিল। তাই গান্ধীজি তাঁকে জনসেবার কাজে অন্যভাবে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দিলেন। 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পরিচালনার ভার নিলেন মিঃ ওয়েস্ট, এবং এইভাবে তিনি গান্ধীজির দীর্ঘকালীন সংগ্রামের অন্যতম সংগী হয়ে উঠলেন।

ভারতীয়দের কল্যাণের প্রতি মিউনিসিপ্যালিটির দৃষ্টি না থাকলেও শ্বেতাংগদের সম্পর্কে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই অবিলম্বে ভারতীয় বস্তিটিকে জ্বালিয়ে দিয়ে বস্তি থেকে প্রায় তেরো মাইল দূরে একটি গ্রামে ভারতীয়দের পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। এ ব্যাপারে গান্ধীজি একদিকে মিউনিসিপ্যালিটিকে যেমন সাহায্য করলেন, তেমনি সাহায্য করলেন ভারতীয় অধিবাসীদের-ও। ফলে, দরিদ্র ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর প্রভাব যেমন আরো বৃদ্ধি পেলো, তেমনি শ্বেতাংগদের সংগে বন্ধুত্ব-ও হলো নিবিড়তর। এইভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকায় আপোষের পথে ভারতীয় ধনিকদের সংগ্রামের পথটিকে গান্ধীজি ধীরে ধীরে প্রশস্ত ক'রে তুলতে লাগলেন।

মিঃ ওয়েস্টের মতোই মিঃ পোলকের সংগে-ও নিরামিষ হোটেলে-ই গান্ধীজির পরিচয় হয়। মিঃ পোলক ছিলেন সংবাদসেবী। কেবল আহারের দিক থেকেই নয়, চিন্তার দিক থেকে বা প্রকৃতির দিক থেকেও গান্ধীজীর সংগে তাঁর প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। তাই তাঁদের উভয়ের বন্ধুত্ব অতি সহজেই গ'ড়ে উঠলো।

গান্ধীজি তাঁর চিন্তার উৎস-ধারা সম্পর্কে বারে বারে যে চারজন

মনীষীর * নাম করেন, তাঁদের মধ্যে ইংরেজ লেখক জন রাস্কিন-ও অন্যতম। বিশেষত, গান্ধীজি খৃস্টান কমিউনিজমের নামে যে ভ্রান্ত অর্থনৈতিক সূত্রকে গ্রহণ করেছিলেন বা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, সে-জন্যে রাস্কিনই ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী,—তাঁর 'Unto This Last' গ্রন্থখানি। এই গ্রন্থখানি মিঃ পোলকই গান্ধীজিকে পড়তে দিয়েছিলেন। সুতরাং গান্ধীজির ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক মতবাদের জন্যে মিঃ পোলক যে বহুল পরিমাণে দায়ী, একথা বলা চলে। ১৮৬২ খৃস্টাব্দে রাস্কিন তাঁর 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই পুস্তকের তিনি বর্ণনা করেন: Four essays on the First Principle of Political Economy ব'লে। কিন্তু ঐ সময়ে,—ঐ সময়ে কেন, ঐ সময়ের বহু পূর্বেই—পাশ্চাত্য দেশের আর একজন মনীষী পলিটিক্যাল ইকনমির প্রথম সূত্রগুলি আবিষ্কারের জন্যে প্রাণপণ সাধনা করেন এবং তাঁর দুখানি মূল্যবান রচনাও একাধিক ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়। কার্ল মার্ক্স্ রচিত 'Communist Manifesto' (১৮৪৮ খৃঃ) এবং Contribution to the Critique of Political Economy (১৮৫৯)। গান্ধীজি যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রাস্কিনের 'আন্টু দিস লাস্ট' গ্রন্থখানি পড়ছেন, তখন মার্কসের সকল শ্রেষ্ঠ রচনাই পৃথিবীর সকল সভ্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তিনি নিজে পরিণত হয়েছেন ইতিহাসে এবং গান্ধীজির প্রায় সমবয়সী আর একটি মানুষ মার্কসের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ইউরোপের বিশাল এক অংশে ঝটিকাবর্তের মতো উদিত হয়েছেন,—যে ঝটিকাবর্ত আপনার বেগে নিয়ে এসেছে বজ্রনাদী অগ্নিগর্ভ কৃষ্ণমেঘ, তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর ঊষর বক্ষে দিয়েছে অবারিত বর্ষণ, পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশকে

* খৃস্ট, টলস্টয়, রায়চাঁদজী এবং রাস্কিন।

নিষিক্ত ক'রে তুলেছে নূতন প্রাণে, নূতন যৌবনে, অভিনব শক্তিতে। কে জানে, সেদিন যদি মিঃ পোলক বা মিঃ পোলকের মতন আর কেউ গান্ধীজির হাতে 'আনটু দিস লাস্টে'র মতো একখানি ভ্রান্ত গ্রন্থ না তুলে দিয়ে মার্কসের কোনো শ্রেষ্ঠ রচনা দিতেন, তবে ওই সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যে এবং সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পুষ্ট মানুষটির মধ্যে কোনো এক আপোষহীন বৈপ্লবিক চেতনার জন্মলাভ ঘটতো কিনা !*

খুব সম্ভবত মার্ক্সের রচনা গান্ধীজির হাতে এলে-ও তা তাঁকে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ করতো না। কারণ, তাঁর পারিস্পার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা ঠিক সেই সময় মার্ক্সবাদকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করার মতো পরিণত ছিল না। অন্যপক্ষে, রাস্কিনের 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থখানি গান্ধীজিকে আকৃষ্ট করার মতো সামাজিক ও ব্যক্তিগত বহু কারণ-ই ছিল। রাস্কিন এবং গান্ধী, উভয়েই বুর্জোয়া সমাজের মানুষ, উভয়েই ব্যবসায়ী সমাজব্যবস্থাকে শাশ্বত সনাতন ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, সামাজিক উদ্বর্তনের ধারা অনুসারে যে

* গান্ধীজি কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে-ও মার্কসের রচনা পাঠ করেন নি। মাত্র কিছুদিন পূর্বে যখন তিনি আগা খান প্রাসাদে বন্দী ছিলেন, তখন নাকি একবার সেগুলি পড়তে চেষ্টা করছিলেন। মার্কসের রচনা পড়েন নি কেন, সে বিষয়ে গান্ধীজি নাকি কোনো সাংবাদিককে বলেছিলেন, তিনি শুনেছেন, মার্কস হিংসায় বিশ্বাস করেন, তাই। হিংসায় মহম্মদ বিশ্বাস করতেন, হিংসায় ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁদের রচনা পাঠ করতে তো কই তিনি ইতস্তত করেন নি! গীতায় হিংসার প্রচার আছে, সেজন্য তো কই গীতা পাঠ থেকে তিনি বিরত হন নি! মার্কসের প্রতি গান্ধীজির বৈরাগ্যের প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, গান্ধীজি ছিলেন তাঁর কালের পুতুল ; তাঁর কাল ছিল উপনিবেশে স্থানীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের যুগ, আর তিনি ছিলেন সেই অভ্যুত্থানের নেতা। তাই বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পরের যুগের দর্শনকে তিনি বোধ হয় সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছেন।

তাদের উদ্ভব হয়েছে, অন্তর্ধান-ও ঘটবে, তাঁরা তা কল্পনা বা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু মানবের মাংগলিকতায় তাঁরা উভয়েই ছিলেন উদ্বুদ্ধ। মানুষের দৈন্যে-দুঃখে, অবিচারে-অত্যাচারে অন্যান্য বুর্জোয়া হিউম্যানিস্টদের মতোই তাঁরা-ও হতেন কাতর এবং পৃথিবীকে দুঃখ-বেদনাহীন অন্যায়-অবিচারহীন এক সুন্দর সমাজে পরিণত করার মহৎ কল্পনায় হ'তেন চঞ্চল। ব্যবসায়ী বুর্জোয়া সমাজের সমগ্র অস্তিত্বই যে, শ্রমিক শোষণ এবং ব্যাপক বঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত তা গান্ধী, রাস্কিন বা অন্যান্য বুর্জোয়া হিউম্যানিস্টরা কেউ লক্ষ্য করেন নি। তাই তাঁরা সরল মনে ধনিক ব্যবসায়ী সমাজকে চিরন্তন ব'লে মেনে নিয়েই শোষণ ও বঞ্চনাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন, প্রচার করেছেন ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে সততার প্রয়োজন, সত্যের স্থান। ইংলণ্ডের উন্নতিশীল বুর্জোয়া যুগের মানব-প্রেমিক, অহিংসার ঋষি জর্জ ফক্স-ও ব্যবসায়ে সত্য এবং সততার প্রয়োজন সম্পর্কে বহুল প্রচার করেছিলেন। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে প্রথমে যে বক্তৃতা দেন—তাঁর জীবনে সর্বপ্রথম বক্তৃতা—তা-ও ছিল ব্যবসায় বাণিজ্য সত্য এবং সততার স্থান সম্পর্কে। রাস্কিন-ও তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের মুখপত্রে বলে'ছেন, এই প্রবন্ধ-গুলির অন্যতম উদ্দেশ্য হোলো "to show that the acquisition of wealth was finally possible only under certain moral conditions of society of which quite the first was the belief in the existence and even, for practical purposes, in the attainability of honesty." কিংবা "Honesty is not a disturbing force, which deranges the orbits of economy, but a consistent and commanding force, by obedience to which and by no other obedience—

those orbits can continue clear of chaos". সুতরাং এই গ্রন্থখানি পড়তে শুরু ক'রে গান্ধীজি যে আকুল হ'য়ে উঠবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি। গান্ধীজি বলেন, তিনি এই বইখানিকে এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলেছিলেন। কেবল তাই নয়, এই বইখানি শেষ ক'রে তাঁর সারারাত্রি ঘুম হয় নি, এবং পরদিন প্রাতঃকালেই নাকি এই পুস্তকে প্রদর্শিত আদর্শকে জীবনে গ্রহণের জন্যে তিনি শপথ করেছিলেন। গান্ধীজি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন: "এর আগে রাস্কিনের কোন বই আমি পড়ি নি। ছাত্রাবস্থায় পাঠ্য পুস্তকের বাইরে কোনো বই আমি পড়ি নি বলা যায়। কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করার পরও খুবই কম পড়েছি। এমন কি আজো এ-কথা বলা যায় যে, আমার পুস্তকী বিদ্যা অত্যন্ত কম।" কথাগুলি খুবই সত্য। আর সত্য ব'লেই রাস্কিনের এই ভ্রমাত্মক অর্থনীতিক সূত্রকে অভ্রান্ত জ্ঞানে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। গান্ধীজি 'সর্বোদয়' নামে এই বইখানির অনুবাদও করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থ-পাঠে তিনি এই তিনটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: (১) সকলের মংগলেই নিজের মংগল, (২) উকীল ও নাপিত উভয়ের পারিশ্রমিক এক হওয়া উচিত, (৩) কৃষক ও মজুরের জীবনই আদর্শ জীবন। গান্ধীজি বলেন: "প্রথম বিষয়টি আমি জানতাম। দ্বিতীয়টি আমি অস্পষ্টভাবে অনুভব করতাম। কিন্তু তৃতীয়টির বিষয় আমি ইতিপূর্বে ভাবি নি। প্রথমটির ভিতরই যে অপর দুইটি সিদ্ধান্ত-ও নিহিত আছে, আনটু দিস লাস্ট পড়ার পরই আমার কাছে তা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তাই সেদিন সকাল থেকেই আমি এই সকল সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করতে কৃতসংকল্প হই।"

গান্ধীজির জীবনে সত্যই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রভাব প্রচুর। এই

গ্রন্থখানিই যে তাঁকে অনেক পরিমাণে একটি ভ্রান্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ক'রে তুলেছিল, তা বলা যায়। সুতরাং, এই গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

আনটু দিস লাস্ট। এই শব্দগুচ্ছটি নিউ টেস্টামেণ্টে বর্ণিত একটি নীতিকাহিনী থেকে গৃহীত। কাহিনীতে খৃস্ট একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, স্বর্গে সবার সমান অধিকার, প্রথম ও শেষের, উত্তম ও অধমের পার্থক্য নেই সেখানে : "But many that are first shall be last, and the last shall be first" (Matt. xix, 3o, & Mark x, 31)

স্বর্গের বিধি-ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে খৃস্ট যে পার্থিব উদাহরণটি ব্যবহার করেছিলেন, তা নিম্নলিখিত রূপ :

একদিন এক গৃহস্বামী তাঁর আঙুরের ক্ষেতের জন্যে শ্রমিকের সন্ধানে বার হলেন। একদল শ্রমিকের সাক্ষাৎ মিললো। তাদের সংগে পারিশ্রমিকের চুক্তি হোলো, সারাদিনের জন্যে এক এক পেনি। শ্রমিকরা মাঠে গেলো। ঘণ্টা তিনেক বাদে আর একদল শ্রমিকের সংগে তাঁর দেখা হোলো, তাদেরও তিনি কাজে নিযুক্ত করলেন। কথা হোলো, কেবল ন্যায্য পারিশ্রমিকই তারা পাবে। আরো তিন ঘণ্টা বাদে এলো আরেক দল শ্রমিক। গৃহস্বামী তাদেরও কাজে নিয়োগ করলেন। বললেন, তারাও ন্যায্য পারিশ্রমিকই পাবে। আরো তিন ঘণ্টা বাদে এলো আরো একদল। তাদের-ও তিনি নিয়োগ করলেন। দিন শেষ হয়ে গেলো। পারিশ্রমিক নিতে এলো সবাই। গৃহস্বামী ওদের সবাইকেই এক পেনি ক'রে পারিশ্রমিক দিলেন। যারা সারাদিন কাজ করেছিল, তারা আপত্তি করলো : যারা

প্রথমে এলো, আর যারা শেষে এলো, তাদের সবারই কি একই পারিশ্রমিক? উত্তরে উদার গৃহস্বামী বললেন, "কিন্তু, বন্ধু, আমি তো তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করি নি। এক পেনি পারিশ্রমিকে সারাদিন কাজ করবে, তুমি এই শর্তেই তো এসেছিলে। স্থতরাং, তোমার যা প্রাপ্য তুমি নেবে। সবার শেষে যে এসেছে, তাকেও আমি তোমার সমানই দেবো।" "Take that thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee." (Matt. xx, 14)

এই কথাগুলির উপর ভিত্তি ক'রেই সমগ্র খৃস্টান সাম্যবাদ গ'ড়ে উঠেছে। তবে সতর্কতার সংগে নিউ টেস্টামেণ্ট পাঠ করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এই ধরণের কোনো সমান পারিশ্রমিকের সাম্যবাদ প্রবর্তনের জন্যে খৃস্ট কখনো স্থপারিশ করেন নি। বস্তুত, পার্থিব সমাজ-সমৃদ্ধিতে যিশুর বড়ো একটা মনোযোগ ছিল না। যিশুর বদ্ধমূল ধারণা ছিল, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীতে আসবে প্রলয়,* স্থতরাং তিনি পারলৌকিক সাম্রাজ্য নিয়ে যতো ব্যস্ত ছিলেন, ইহলৌকিক 'স্বল্পায়ু' সাম্রাজ্য নিয়ে মোটেই ততো ব্যস্ত ছিলেন না। † খৃস্টের পূর্বাচার্যরা ঘোষণা করেছিলেন, প্রলয়কালের পূর্ব মুহূর্তে পৃথিবীতে ত্রাণ-কর্তার আবির্ভাব হবে। খৃস্ট নিজেকে যখন ত্রাণ-

* But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God. (Luke ix 27)

Verily I say unto you This generation shall not pass away till all will be fulfilled. (Luke xx. 32)

† "Jesus answered, My Kingdom is not of this world." (John xviii, 36)

কর্তা বা মেশাইয়া হিসাবে গ্রহণ করলেন, এখন একথাও তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হোলো যে পৃথিবীর অন্তিম মুহূর্ত সমাসন্ন, এবং অপার্থিবের জন্যে মানুষকে এবার প্রস্তুত হতে হবে।

মহম্মদ-ও নিজেকে পৃথিবীতে ভগবানের শেষ পয়গম্বর ব'লে বিশ্বাস করতেন। তাই কেয়ামতের আসন্নতা সম্পর্কেও তাঁর কোনো সংশয় ছিল না। আমরা দেখি, খৃস্টের স্বর্গীয় সাম্যবাদকে যখন খৃস্টান 'সাম্যবাদীরা' পার্থিব সমাজে প্রয়োগের চেষ্টা করেন, এবং সমান পারিশ্রমিকের প্রচার করেন, তখন তাঁরা খৃস্টের উপরোক্ত বাণীর আশ্রয় লন। এমন কি শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী 'মার্কস্‌বাদী' বার্ণার্ড শ-ও এই পারিশ্রমিক-সাম্যের কেবল পক্ষপাতী নন, উগ্র প্রচারক। শ তাঁর যুক্তির অনুকূলে বলেন, মানুষের পরিশ্রমের পরিমাপ করা সম্ভব কেমন ক'রে ? একটি ডাক্তারের এক ঘণ্টার এবং একটি মিস্ত্রির এক ঘণ্টার পরিশ্রমের পরিমাপের মান কি ? সমাজের বিভিন্ন ধরণের কাজকে যদি প্রচলিত কোনো মানদণ্ডে পরিমাপ করা সম্ভব না হয়, তবে শ্রমের পরিমাণ অনুসারে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব কেমন ক'রে ? সুতরাং সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। শ-র এই যুক্তির মধ্যে ব্যবহারিক সত্য কিছু বা থাকতে পারে। তবে শ্রম-শক্তিকে তার যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে না দেখার ফলেই শ-র এই দৃষ্টি-ভ্রংশ ঘটেছে। এক বালতি দুধ এবং এক বালতি ক্ষীরের আয়তন এক হলেও তাদের পরিমাণ যে এক নয়, চূড়ান্ত সাম্যবাদী সমাজেও যে এক বালতি দুধের বিনিময়ে এক বালতি ক্ষীর মেলা স্বাভাবিক হবে না, সে-কথা শ ভেবে দেখেন নি। আমাদের মনে রাখতে হবে, সকল বস্তুরই দুটি গুণ থাকে : ব্যাপকতা (extensity), এবং ঘনতা (intensity)। শ্রমেরও দুইটি গুণ : ব্যাপকতা ও ঘনতা। এক বালতি দুধ এবং এক বালতি ক্ষীরের মধ্যে ব্যাপকতার পার্থক্য না

থাকলেও, ঘনতার যেমন প্রচুর পার্থক্য থাকে, তেমনি একটি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের সংগে একটি শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত শ্রমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের ভেতরেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কারণ, ঘণ্টার মাপকাঠি দিয়ে শ্রমের কেবল ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি মাপা যায়, শ্রমের ঘনতা মাপা যায় না। একটি শিক্ষিত শ্রমিকের এক ঘণ্টার শ্রমের মধ্যে আরো বহু ঘণ্টার শ্রম (যথা শিক্ষাকালীন শ্রম) যে ঠাসাঠাসি সন্নিবদ্ধ থাকে, এই সত্যকে গ্রহণ ক'রেই মার্কস্ শ্রমিক সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।* আর্কিমিডিসের পূর্ব পর্যন্ত যখন কোনো বস্তুর ঘনতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কার, তথা হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের উদ্ভব হয় নি, তখন পদার্থ বিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা ছিল যেমন অসম্ভব, তেমনি শ্রমের ঘন রূপটিকে লক্ষ্য না ক'রে শ্রম-সমস্যার সমাধানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও ছিল পণ্ডশ্রম। শ নিজেকে মার্কস্‌বাদী ব'লে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তিনি মার্কসের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অনেক কিছুকেই এড়িয়ে গেছেন। সম্ভবত, এর প্রধান কারণ, তাঁর নিজের বিজ্ঞান-বিমুখতা। † যাই হোক, শ্রমের পরিমাণ নির্বিশেষে সকলকে সমান পারি-শ্রমিক দানের প্রচার করার জন্যে শকে আমরা সত্যিকারের খৃস্টান কম্যিউ-নিস্ট হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। তাঁর অর্থনীতিক মতবাদের সংগে

* "Skilled labour counts only as intensified, or rather multiplied simple labour, so that a smaller quantity of skilled labour is equal to a larger quantity of simple labour." (Marx, *Capital* Vol. I)

† বৈজ্ঞানিক পাভলভের Conditioned Reflex আবিষ্কারকে তিনি ব্যংগ-বিদ্রূপ করেন, এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে করেন অস্বীকার।

খৃস্টের "I will give unto this last, even as unto thee" কথাগুলি সত্যই খাপ খায়।

কিন্তু রাস্কিন সম্পর্কে সেকথা বলা চলে না। রাস্কিন তাঁর বইএর নাম Unto This Last দিলেও খৃস্টের সাম্যবাদকে কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নি।* সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল ব'লেও মনে হয় না। তিনি বলেন: "If a man works an hour for us and we only promise to work half an hour for him in return we obtain an unjust advantage. The justice is in absolute exchange...."

রাস্কিনের এই কথাগুলি নির্ভুল হোতো, যদি তিনি এক ঘণ্টার শ্রম বলতে মার্কস্ যা বোঝেন তা বুঝতেন। কিন্তু রাস্কিনের কাছে এক ঘণ্টা-ব্যাপী শিক্ষিত শ্রমিকের শ্রম এক ঘণ্টা-ব্যাপী অশিক্ষিত শ্রমিকের শ্রমের সমান। অর্থাৎ শ্রমের ঘনতা বা intensity-কে তিনি লক্ষ্য করেন নি। তাই তাঁর বই প'ড়ে গান্ধীজি উকীল এবং নাপিতের পরিশ্রমের মূল্য সমান, এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছিলেন। এই ধরণের ভ্রমাত্মক labour theory-র যাঁরা প্রচারক, তাঁদেরই একদল সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ায় সব মানুষের সমান পারিশ্রমিক নয় কেন ব'লে চেঁচামেচি করছেন, এবং স্টালিন সাম্য-বাদকে বানচান ক'রে দিলেন এমন ধূয়াও তুলেছেন। যাই হোক, এখানে আমরা লক্ষ্য করি, খৃস্ট স্বয়ং বা খৃস্টান কমিউনিস্ট শ যখন শ্রমিকের শ্রমের পরিমাণ নির্বিশেষে সমান পারিশ্রমিক প্রদানের পক্ষপাতী, তখন রাস্কিন

* খৃস্টের বাণী থেকে নামটি গ্রহণ করলে-ও এই বাণীর ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তিনি তাঁর বইএ করেন নি। এমন কি শ্রমিক ও গৃহস্বামী সংক্রান্ত নীতিকাহিনীটির-ও সেখানে কোনো উল্লেখ নেই।

খৃস্টের 'আনটু দিস্ লাস্ট' কথাগুলিকে তাঁর বইএর মাথায় এবং মলাটে বিজ্ঞাপনরূপে ব্যবহার করলেও, আসলে সকলকে সমান পারিশ্রমিক দেওয়ার পক্ষপাতী নন। খৃস্ট বা খৃস্টান শ যখন সবাইকে সমান (equal) পারিশ্রমিক দিতে বলেন, তখন রাস্কিন বলেন, সকলকে একটি বাঁধা(fixed) পারিশ্রমিক দিতে। অর্থাৎ খৃস্টান সাম্যবাদের ছদ্মবেশে বহু নীতির আতসবাজী দেখাবার পর তিনি তাঁর আসল মুখোসটি নিতান্ত অতর্কিতেই খুলে' বসেছেন, তিনি বাঁধা (fixed) পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের খাটাতে বলেছেন। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে এই বাঁধা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার নামই হোলো চাকরি।

কেবল তাই নয়। তিনি ভালো শ্রমিক এবং মন্দ শ্রমিকের শ্রেণী-বিচারও করেন। পরামর্শ দেন, মন্দ শ্রমিকদের কার্যে নিয়োগ করা চলবে না। কারণ, তাতে নাকি মন্দ শ্রমিকরা স্বল্প পারিশ্রমিক নিয়ে ভালো শ্রমিকদের সংগে প্রতিযোগিতা করবে, এবং এইভাবে ভালো শ্রমিকদের পারিশ্রমিক কমিয়ে দেবে বা চাকরি ছিনিয়ে নেবে। রাস্কিন সাহেবের ভাষায়ঃ "The natural and right system respecting all labour is that it should be paid at a fixed rate, but the good workman employed and the bad workman unemployed. The false, unnatural, and destructive system is when the bad workman is allowed to offer his work at half price and either take the place of the good or force him by competition to work for an inadequate sum." খৃস্টান কমিউনিস্টের মুখে এই ধরণের যুক্তি বা উক্তি নিতান্তই অশোভন। "I will give unto this last, even as unto thee," এবং

"but many that are first shall be last, and the last shall be first" প্রভৃতি খৃস্টের কথাগুলির প্রতি অমার্জনীয় অমনোযোগ!

অবশ্য, রাস্কিন খৃস্টের বাণীতে কর্ণপাত করেন নি ব'লে আমি তাঁর ওপর দোষারোপ করছি না। আমি নিজেও খৃস্টের বাণীতে কর্ণপাত করতাম না। আমি দোষারোপ করছি অন্য কারণে। পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক অবয়ব সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর অজ্ঞতার জন্যে। সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্যের কেবল বাহিক রূপ যেমন রাস্কিনের চোখে পড়েছিল, তেমনি প্রতিযোগিতার বাহিক রূপটিকেই তিনি দেখেছিলেন, তার স্বরূপ কি তা বিন্দুমাত্র বোঝেন নি। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার ফলেই বেকার সমস্যা ও প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়, তার জন্যে তথাকথিত মন্দ শ্রমিকের প্রতিযোগিতা দায়ী নয়। অবশ্য, ছাঁটাইএর সময় অনেক ক্ষেত্রে মালিকরা শ্রমিকদের অযোগ্যতার অজুহাত-ই দেখান। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার অসামঞ্জস্যের ফলে 'ভালো' শ্রমিকরা-ও যখন বেকার হ'য়ে পড়েন, তখন প্রতিযোগিতার মল্ল-মঞ্চে তাঁদের-ও অবতীর্ণ হ'তে হয়। এই ভালো শ্রমিকরা-ও তখন প্রতিযোগিতার পথে পারিশ্রমিকের পরিমাণকে ক্রমেই নিচের দিকে টেনে আনতে বাধ্য হন। (শ্রমিকের চাকরি গেলে-ই তাঁরা মন্দ শ্রমিকের (bad workman) পর্য্যায়ে পড়েন, রাস্কিন-পন্থীরা যদি এমন ভাষ্য দেন, তবে আমরা অবশ্য নাচার।) পুঁজিতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়ার ফলে রাস্কিন শ্রমিকদের দুঃখ-দারিদ্র্য, বেকারত্ব বা আত্মঘাতী প্রতিযোগিতার মূল কারণটি লক্ষ্য না ক'রে সমস্ত দোষত্রুটি অযোগ্য শ্রমিক বা bad workman-এর ঘাড়ে তুলে দিয়েছেন।

তর্কের খাতিরে রাস্কিনের এই ভ্রান্ত যুক্তিকে স্বীকার ক'রে নিলে-ও

প্রশ্ন ওঠে, যোগ্য ও অযোগ্য শ্রমিক বলতে তিনি কি বোঝেন এবং সেই পার্থক্যটিই বিচার করা সম্ভব কি ভাবে—তাদের বেকারত্ব দেখেই কি? রাস্কিনকে তাঁর জীবিতকালে-ই এই প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। প্রশ্নের জবাব তিনি যা দিয়েছিলেন, তা বস্তুত জবাব নয়,—জবাব না দেওয়ার কারণ। বলেছিলেন, মাত্র বারো পৃষ্ঠার ছোটো একটি প্রবন্ধে সে-সব কথা আলোচনা করা যায় না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বারো শ পৃষ্ঠার একখানি প্রবন্ধ লিখে-ও রাস্কিন কোনো দিন সে বিষয়ে আলোচনা করেন নি! অবশ্য তাঁর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের পক্ষে বারো শ পৃষ্ঠার একখানি বই লেখার-ও কোনো অন্তরায় ছিল না!

গান্ধীজির মতো রাস্কিন-ও পুঁজিবাদীদের শ্রেণীগত সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিলেন। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা যখন বহুকে শোষণের ভিত্তিতে মুষ্টিমেয়কে পুষ্ট করে, তখন পুঁজিবাদীদের শ্রেণীগত সংস্কৃতিতে ব্যক্তির স্তুতি ও বড়াই বড়োই শোনা যায়। রাস্কিন-ও ব্যক্তির স্তুতি করেন। তাঁর মতে, সমাজ নয়,—ব্যক্তির প্রচেষ্টাই সমাজকে অগ্রবর্তী করবে, তার দুঃখদারিদ্র্য বিনাশ করবে, তার কল্যাণ আনবে। তিনি বলেন: "Note, finally, that all effectual advancement towards this true felicity of the human race must be by individual, not by public effort." তাই গান্ধীজির মতো রাস্কিন-ও পুঁজিবাদীদের সৎ হ'তে বলেন।

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থায় কয়েক বৎসর বাদে বাদে ভয়াবহ মন্দা আসতে দেখা যায়। এই সময় অত্যন্ত সহৃদয় পুঁজিবাদীর পক্ষে-ও শ্রমিক ছাঁটাই এবং অনেক ক্ষেত্রে লক-আউট না ক'রে উপায় থাকে না। আর এই মন্দা পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থার চরিত্রগত ঘটনা,

পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত ত্রুটির ফসল নয়। কিন্তু রাস্কিন সেকথা বোঝেন নি। বুর্জোয়া অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার ফলে, শ্রমিকদের অল্প বেতন, ছাঁটাই, লক-আউট প্রভৃতির জন্যে ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিবাদীদের দোষী ক'রে তিনি তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বস্তুত, পুঁজিবাদের সমূলে উচ্ছেদই এই সংশোধনের একমাত্র উপায়। ছাঁটাইএর বিরুদ্ধে রাস্কিন বলেন: আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত "maintaining constant numbers of workmen in employment, whatever may be the accidental demand for the article they produce." কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় এবং লাভের উপরই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি। লাভের জন্যেই চাই শ্রমিককে তার প্রাপ্যের অপেক্ষা কম পারিশ্রমিক দেওয়া। আবার এইভাবে কম পারিশ্রমিক পাওয়ার ফলে শ্রমিকদের—অর্থাৎ দেশের শতকরা প্রায় ৯৫ জন মানুষের ক্রয়শক্তি পায় হ্রাস। ফলে, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন সমাজে একদিকে মুষ্টিমেয় মালিকের লাভজনক বিক্রয়ের ইচ্ছা এবং অন্যদিকে, অসংখ্য মানুষের ক্রয়শক্তিহীনতা দাঁড়ায় মুখোমুখি এসে। আর, এই হোলো পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্নিহিত বিরুদ্ধতা, তার অনিবার্য ধ্বংসের বীজ। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এই দেহতত্ত্ব সম্পর্কে রাস্কিন কিন্তু বিন্দুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তিনি কল্পনা-ও করেন নি যে, মানুষের জন্মের মধ্যেই যেমন তার মৃত্যুর বীজ নিহিত থাকে এবং একদিন তা বার্ধক্য, জরা অবশেষে মৃত্যুর রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি যে-শোষণ ও লাভের ফলে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব হয়েছে, সেই শোষণ ও লাভের মধ্যেই নিহিত আছে তার ধ্বংসের বীজ। তাই জরাজীর্ণ, বার্ধক্যপীড়িত, গলিত বুর্জোয়া উৎপাদন-ব্যবস্থাকে

তিনি যৌবনলাভের দাওয়াই দিতে চেয়েছেন। আর গান্ধীজি সেই দাওয়াইকে গ্রহণ করেছেন ধন্বন্তরির দান হিসাবে।

মার্ক্সের সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বে-ও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক ধারাকে রাস্কিন লক্ষ্য করেন নি। তিনি শোষক ও শোষিতের মধ্যে দেখেছেন, দ্বন্দ্ব নয়, সহযোগিতাঃ দারিদ্র্য হোলো ত্যাগ, শোষণ ন্যায়সংগত গ্রহণ মাত্র। তিনি বলেন, মালিক ও শ্রমিকের স্বার্থ তাদের দ্বন্দ্বশীল ক'রে তোলে না। শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ককে তিনি সন্তান ও মাতার সম্পর্কের সংগে তুলনা করেন। উপমা অনেক সময় মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তোলে ও যুক্তিকে ক'রে দেয় জড়িত। বর্তমান উপমাটি-ও সেই শ্রেণীর। গান্ধীজি-ও তাঁর লেখনে ও ভাষণে এই ধরণের বিভ্রান্তিকর বহু উপমা ব্যবহার করেছেন। রাস্কিন বলেনঃ "If there is only a crust of bread in the house, and mother and children are starving, their interest are not the same…yet it does not necessarily follow that there will be 'antagonism' between them, they will fight for the crust, and the mother, being strongest will get it and eat it." মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের সংগে মাতা ও সন্তানের তুলনা অত্যন্ত অসংলগ্ন। প্রথমত, মাতা ও সন্তানের মধ্যে স্নেহমমতার যে সম্পর্ক থাকে, তা রক্তগত, সংসর্গগত। কিন্তু মালিকের সংগে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্নেহ ও মমতার সম্পর্ক তো দূরের কথা, তাদের ব্যক্তিগত পরিচয় পর্যন্ত থাকে না। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় থাকা সম্ভব-ও নয়। মালিকের কাছে শ্রমিকরা মানুষ নয়, শ্রমশক্তি মাত্র। বুর্জোয়া ইংরেজি ভাষায় তাই মানুষকে man বলে না, বলে hand.

দ্বিতীয়ত, মাতা এবং সন্তানের মধ্যে-ও যখন জীবন ধারণের সমস্যা নিয়ে সংগ্রাম বেধে ওঠে, তখন স্নেহ মমতার কোমল সম্পর্ক-ও টেকে না, দুর্ভিক্ষের সময়ে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, মালিককে মাতা এবং শ্রমিককে সন্তান ভাবা-ও ভুল। মাতা সন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের জন্ম দেয় না, বরং বলা যেতে পারে শ্রমিকরাই জন্ম দেয় পুঁজিপতিদের—তাদের ঘর্ম ও রক্ত মোক্ষণের মধ্য দিয়ে। সুতরাং সেই কুলাংগার সন্তান পুঁজিপতিরা যখন তাদের জন্মদাতাদের (রাস্কিন সাহেবের উপমার খাতিরেই বলছি) বঞ্চিত করে, অনাহারে রেখে হত্যা করে, তখন তাদের প্রাপ্য স্নেহ নয়, শাস্তি। যাই হোক, মাতা-সন্তানের এই উপমাকে কোনো বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রশ্রয় দেবেন না, একথা বলা চলে।

বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই ধরণের বিভ্রান্তিকর আর একটি উপমা বুর্জোয়া সমাজনীতিকরা ব্যবহার করেন। সেটি হোলো মানব-সমাজের সংগে মধুমক্ষিকা সমাজের তুলনা। তাঁদের মতে মধুমক্ষিকার সমাজে প্রচলিত সমাজতন্ত্রই হোলো সত্যিকারের সমাজতন্ত্র। আর সেই সমাজতন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থাই আজ মনুষ্য সমাজে প্রচলিত রয়েছে—যার নাম পুঁজিতন্ত্র। এই মক্ষিকা-সমাজতন্ত্রীরা বলেন, মক্ষিকার সমাজে দেখা যায়, একটি চক্রে অসংখ্য শ্রমিক মক্ষিকা এবং একটি মাত্র রাণী মক্ষিকা থাকে। শ্রমিক মক্ষিকার দল অনবরত কাজ ক'রে যায়, তারা অনশনে অর্ধাশনে থাকে এবং এই ভাবে কর্মহীনা রাণী মক্ষিকাকে নিয়মিত পোষণ ও তোষণ করে। এই মক্ষিকা সমাজতন্ত্রের অনুরূপ অবস্থাই মানবপুঁজিতন্ত্রে-ও রয়েছে। মুষ্টিমেয় মালিকের পোষণ ও শোষণের জন্যে অসংখ্য শ্রমিক অনশনে অর্ধাশনে খেটে মরে। সুতরাং বুর্জোয়া প্রচারকরা বলেন,

মক্ষিকা-সমাজতন্ত্র অর্থাৎ মানব পুঁজিতন্ত্র প্রকৃতির আদিম ও অকৃত্রিম রূপ। এর পশ্চাতে প্রাকৃতিক নীতির সমর্থন রয়েছে। বহু বুর্জোয়া প্রচারক যেমন এই 'প্রাকৃতিক' উপমার আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি বহু ব্যক্তি এই উপমার আপাত চাকচিক্যে বিমুগ্ধ প্রতারিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যদি এই উপমার সত্যকে যাচাই ক'রে দেখতেন, তবে বুঝতে পারতেন, মক্ষিকা সমাজতন্ত্রের মানবিক সংস্করণ পুঁজিতন্ত্র মানব সমাজে দীর্ঘকাল থাকা সম্ভব নয়, এই কারণেই যে, মক্ষিকা সমাজের সমস্ত সন্তানের জন্মদানের দায়িত্ব একটি মাত্র রাণী মক্ষিকার ওপরই ন্যস্ত থাকে, আর সেই কারণেই অন্যান্য মক্ষিকারা নিজেদের জাতি-রক্ষার জন্যে নিজেরা অনশনে অর্ধাশনে থেকে মক্ষীরাণীকে সতেজ ও সজীব রাখতে চায়। কিন্তু মানব-সমাজে যাঁরা মক্ষী-সমাজতন্ত্রের প্রচারক, তাঁদের প্রশ্ন করি, তাঁরা কি মানব-জাতির তথা-কথিত মক্ষীরাণী পুঁজিবাদীদের জাতির জনসংখ্যা রক্ষার দায়িত্ব নেওয়াতে পারবেন? তাঁরা নিজেদের বংশরক্ষা করতে-ও তো অনেক সময় অসমর্থ হন। সেন্সাসে দেখা যায়, যে কোনো কারণেই হোক, তাঁদের সন্তানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং, জাতিরক্ষার দিক থেকেই মক্ষিকাসমাজ-তন্ত্রের নীতি বা নিয়ম মনুষ্য সমাজে সম্পূর্ণ অচল। অসংখ্য শ্রমিকের বংশ রক্ষার ভার শ্রমিকের নিজের। দীর্ঘকাল তাদের অনশনে অর্ধাশনে রাখলে, সারা মনুষ্য জাতিটাই যে পৃথিবীর বুক থেকে একদা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতে পারে, তাতে আর আশ্চর্য কি? (অবশ্য ইতিমধ্যে ধনিকপত্নীরা যদি লক্ষপ্রসবিনী না হয়ে ওঠেন!)

আমরা লক্ষ্য করি, এই জাতীয় উপমার উপর ভর ক'রেই অনেক ক্ষেত্রে রাস্কিন, গান্ধী, বা তাঁদের স্বগোত্ররা অর্থনীতিক বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্পষ্ট জটিল ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা শব্দের যে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেছেন, তাতে

জনসাধারণ যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তেমনি বিভ্রান্ত হয়েছেন তাঁরা নিজেরা-ও।

জীবনের মধ্যেই যে মৃত্যুর বীজ নিহিত রয়েছে, পলে পলে বাঁচবার সংগে জীবরা যে পলে পলে মরছে-ও, এই সত্যের উপর ভিত্তি ক'রেই মার্কস্‌বাদের হয়েছে জন্ম। কিন্তু রাস্কিন বুর্জোয়া সমাজের সৃষ্টির রূপটিকে-ও যেমন প্রত্যক্ষ করেন নি, তেমনি করেন নি ধ্বংসের রূপটিকে-ও। তাই তিনি শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বকে অস্বীকার ক'রে তাদের সহযোগিতার বাণী আওড়েছেন : "But the universal law of the matter is that, assuming any quantity of energy and sense in master and servant, the greatest material result obtainable by them will be, not through antagonism to each other, but through affection for each other."

সুতরাং রাস্কিন এবং তাঁর পদাংক অনুসরণ ক'রে গান্ধী শ্রেণী-সংগ্রামের বিরোধিতা করেন, পুঁজিবাদীদের ন্যায়পরায়ণ ও স্নেহশীল হ'তে বলেন, শ্রমিকদের ত্যাগী ও সহিষ্ণু হ'তে উপদেশ দেন। উপসংহার করেন, "every question concerning these things merges itself ultimately in the great question of justice."......কিন্তু পুঁজিবাদীরা বিন্দুমাত্র ন্যায়পরায়ণ হন নি, তাঁরা তাঁদের শোষণের ধারাকে ক্রমেই দ্রুততর ক'রে ধ্বংসের পথেই এগিয়ে চলেছেন। রাস্কিন তথা গান্ধীর অর্থনীতির ভ্রান্ততা এ থেকেই নিঃসংশয়ে বোঝা যায়।

গান্ধীজি বলেন, এই বইখানি তাঁকে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ উত্তেজিত করেছিল যে, পরদিন প্রাতেই তিনি মিঃ ওয়েস্টের কাছে একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন, স্থির হয় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিঅন' পত্রিকাখানি-ও

সেই কৃষিক্ষেত্র থেকেই বার হবে। 'আনটু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থ পাঠ ক'রে গান্ধীজি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে অকস্মাৎ কিভাবে উদ্বুদ্ধ হ'লেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কারণ 'আনটু দিস্ লাস্ট' গ্রন্থে নাগরিক অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা হয় নি। আমার বিশ্বাস, রাস্কিনের নিম্নলিখিত কথাগুলিই গান্ধীজিকে পল্লীতে কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের পরিকল্পনা দিয়েছিল: "The desire of the heart is also the light of the eyes. No scene is continually and untiringly looked but one rich by joyful labour; smooth in field, fair in garden, full in orchard; trim, sweet and frequent in homestead; ringing with voices of vivid existence; no air is sweet that is silent; it is only sweet when full of low currents of undersounds—triplets of birds, and murmur and chirp of insects, and deep-toned words of men, and wayward trebles of childhood."

এই 'আদর্শ' কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের জন্যে গান্ধীজি নাতালের রাজধানী ডারবান থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে ফিনিক্স স্টেশনের কাছে ষাট বিঘা জমি কিনলেন। ১৯০৪ খৃস্টাব্দে ফিনিক্স কৃষিক্ষেত্রের হোলো প্রতিষ্ঠা। স্থির হোলো, সকলকেই এই কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হবে, সকলেই সমান পারিশ্রমিক পাবে। সমাজের বাইরে এই ধরণের কল্পনা-প্রণোদিত সাম্যবাদী পল্লী বা কলোনি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই নতুন নয়। গান্ধীজির জন্মের বহু পূর্বেই ইউরোপে বহু মনীষী সে-চেষ্টা করেছিলেন এবং রবার্ট আওএনের মতো কর্ম-প্রতিভার মধ্যে তা এক চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল। ১৮২০ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ গান্ধীজির জন্মের অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে, রবার্ট আওএন

তাঁর 'নিউ হারমনি' নামে একটি সাম্যবাদী সমবায়-পল্লীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ছয় মাসের মধ্যে তা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। রবার্ট আওএনের বিপুল শক্তি ও বিশাল পরিকল্পনার ব্যর্থতাই এই ধরণের 'ইউটোপীয়ান' সাম্যবাদকে অকার্যকরী ব'লে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ ক'রে দেয়। এই ধরণের অর্থনীতিক পরীক্ষা প্রতি-পরীক্ষা সম্পর্কে গান্ধীজি সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। তাছাড়া, টলস্টয়ের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় তিনি পল্লীবাস, কৃষকের অনুরূপ জীবন-যাপন এবং কল্পনাবিলাসী সাম্যবাদের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। তাই গান্ধীজি যখন সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কৃষি-কলোনি স্থাপন করলেন, তা অনেকখানি ভূগোল-না-জানা ভূ-আবিষ্কারকের পৃথিবী ভ্রমণের মতোই হ'য়ে দাঁড়ালো ; এ যেন কোনো সুআবিষ্কৃত দেশকে পুনরায় আবিষ্কারের চেষ্টা!

এই প্রসংগে সুবিখ্যাত আমেরিকান লেখক র‍্যাল্‌ফ ওঅল্ডো এমার্সনের কথা মনে পড়ে। একদা গান্ধীজি তাঁর রচনায় আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। এই আকর্ষণের কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন, এমার্সনের চিন্তাধারার সংগে ভারতীয় চিন্তাধারার 'সুনিবিড় সাদৃশ্য'।* এমার্সন তাঁর জন্মস্থান বোস্টন শহর ত্যাগ ক'রে নিভৃত কংকর্ডের পল্লীবাসে গিয়ে আশ্রয়

* এমার্সনের চিন্তা সম্পর্কে অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র বলেছিলেন ; "I recognise a close affinity between the thought of Emer son and that of the orient."

কবি, সমালোচক ও দার্শনিক এমার্সনের (১৮০৩–১৮৮২) রচনার কতকগুলি কলি আমাকে বিশেষভাবে গান্ধীজির জীবন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যেমন :

"He that feeds men serveth few ;
He serves all who dares be true."

নিয়েছিলেন। এবং কারণ স্বরূপ ব'লেছিলেন, "I am by nature a poet and therefore must live in the country." ভারতীয় চিন্তার সংগে এমার্সণের চিন্তার কি সাদৃশ্য আছে বা নেই, তা বিচারের স্থান এ নয়। তবে এমার্সনের সংগে গান্ধীজির যে প্রকৃতিগত অনেকখানি মিল ছিল তা বলা চলে। পল্লী-প্রিয়তা গান্ধীজির চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কেবল ফিনিক্সের এই সমবায় কৃষিক্ষেত্র নয়, গান্ধীজি তাঁর পরবর্তী জীবনে-ও যে-সমস্ত আশ্রম স্থাপন করেছিলেন তা ছিল শহরের কোলাহল থেকে দূরে, নিভৃত পল্লীতে। রবীন্দ্রনাথ-ও কলিকাতা থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বীরভূমের এক পল্লীতে, তাঁর শান্তিনিকেতন। কি এমার্সন, কি গান্ধী, কি

এই কারণেই বুঝি গান্ধীজি সারা জীবন 'সত্যের সাধনা' ক'রে গেলেন, কোটি কোটি ভারতবাসীর অন্নের কোনো সংস্থান করলেন না! আবার এমার্সন বলেন:

"Go put your creed into your deed
Nor speak with double tongue."

এমার্সনের এই বাণীকে গান্ধীজির জীবনে আমরা ফলিত হ'তে দেখি। গান্ধীজি এমার্সনের কথাগুলি ভোলেন নি:

"The greatest homage we can pay to truth is to use it."

(অবশ্য, সত্য বলতে এখানে বুঝতে হবে, গান্ধীজি যাকে সত্য ব'লে বুঝেছিলেন,—বস্তুত হোক না তা মিথ্যে।)

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, এমার্সনকে-ও গান্ধীজি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। এমার্সন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, তার উদ্বর্তনে, তার মানবের কল্যাণসাধনী শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বোস্টন থেকে কংকর্ডে পালিয়েছিলেন সত্য, তথাপি যন্ত্র তাঁর কাছে যন্ত্রদানব হয় নি। তিনি তাঁর কবিমনের ও মিস্টিসিজমের ঝাপসা দৃষ্টিতে-ও যন্ত্রদানবের রোগটাকে যেন অনেকখানি স্পষ্ট দেখেছিলেন। কবিসুলভ অপূর্ব ভাষায় বলেছিলেন:

ওআর্ডস্বার্থ, কি রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের সবার এই পল্লীতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটিকে অন্তত তাঁরা সবাই কবি-মনের পরিচয় ব'লেই ভেবেছেন। কিন্তু বস্তুত, তা নয়। এ ছিল তাঁদের সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনের আর্ত-পলায়ন-পরতা—excapism. মানুষের দৈন্য-দুঃখ যখন পল্লীতে বিক্ষিপ্ত বিস্তৃত হ'য়ে থাকে, তখন তার রঙটা ফিকে হয়ে আসে, তার ভয়াবহ রূপটা ততো সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু শহরে মানুষের ভীড় যেমন বাড়ে, তাদের দুঃখ-বেদনার রূপটি-ও ততো পুঞ্জীভূত প্রকট হ'য়ে দেখা দেয়। সে দুঃখ ও বেদনার জ্বালা হয়ে ওঠে যেমন তীব্র, রঙটা-ও হয় তেমনি গাঢ়, পিচ্ছল, বীভৎস। ওআর্ডস্বার্থ, এমার্সন, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী মানুষের দুঃখদারিদ্র্যের পুঞ্জীভূত নাগরিক রূপটিকে সহ্য করতে পারেন নি। তাই তাঁরা সবাই পলায়ন করেছেন শহর থেকে দূরে—যতো দূরে সম্ভব। কেবল ওআর্ডস্বার্থ, এমার্সন,

---

"Things are in the saddle and ride mankind."

পণ্য দ্রব্যের উপর কোটি কোটি মানুষ আজ তাদের অধিকার হারিয়েছে। যে-পণ্য-দ্রব্যেকে শ্রমিকরা তাদের স্বহস্তে রচনা করেছে, আজ সেই পণ্যদ্রব্যের-ই বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে শ্রমিককে। শ্রমিকরা-ও পরিণত হয়েছে পণ্যে। কেবল তাই নয়, আজ তাদের পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করে তাদের সহস্ত রচিত পণ্য-দ্রব্যগুলিই। এই হোলো বর্তমান পণ্য-সভ্যতার স্বরূপ। এমার্সনের কথাগুলি সহজেই মার্কসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিবর্তনে-ও বিশ্বাস করতেন এমার্সন। বার্ণার্ডশ-র মতন evolution-ই তাঁর God :

> "The energy that searches through
> From chaos to the dawning morrow,
> Without halting, without rest,
> Lifting better up to best."

রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীর মধ্যেই নয়, বর্তমান শোষণ-সভ্যতার যুগে বহু প্রখর অনুভূতিশীল মানুষকেই কি কার্যে, কি চিন্তায় এই পলায়নপরতাকে আশ্রয় করতে হয়েছে। তাই দেখি, ডি, এচ, লরেন্স বর্বর আরণ্যক জীবনের স্তুতিতে আশ্রয় নিয়েছেন, লরেন্স অব্ অ্যারেবিয়া পালিয়েছেন বুর্জোয়া বৃটিশ শাসনের তাণ্ডব থেকে দূরে—আরবের বালু-ধূসর মরুভূমিতে। কেবল সাহিত্যে বা ক্যব্যে নয়, এই পলায়নপরতা দেখা যায়, সমাজ-জীবনের অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে-ও। অর্থনীতিতে দেখা যায়, নাগরিক সভ্যতাকে ত্যাগ ক'রে পল্লীতে পলায়নের চেষ্টা, গান্ধীবাদে ঘটেছে তার প্রকৃষ্ট প্রকাশ। ধর্মের মধ্যেও এই পলায়নপরতা; আধুনিক কালে ভারতে তার প্রকৃষ্ট প্রকাশ হয়েছে শ্রীঅরবিন্দে। (অবশ্য ধর্ম বস্তুটি-ই হোলো এক প্রকার পলায়নপরতা। এই পলায়ন ঘটে অরণ্যে, গিরিগুহায়, মঠে, আশ্রমে, হৃদয়ে, ভগবানে, মোক্ষে, স্বর্গে।) এমন কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানেও অনেকক্ষেত্রে এই পলায়নপরতাকেই লক্ষ্য করা যায়, যথা ফ্রয়েডিয়ানায়।

পল্লী এবং কৃষি-প্রীতির ব্যাপারে-ও গান্ধীজির উপর টলস্টয়ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পল্লীবাসী কৃষকের জীবনই ছিল টলস্টয়ের আদর্শ জীবন। তাই টলস্টয় বা টলস্টয়পন্থীরা বেশভূষাতে পর্যন্ত রুশ চাষা সেজে থাকতে চাইতেন, এবং তাতে গর্ববোধ করতেন। টলস্টয় ছিলেন খাঁটি একজন রুশ জমিদার, তাঁর শিষ্যদের অধিকাংশই ছিলেন বিত্তবান শ্রেণীর লোক। সুতরাং কৃষকের অভিনয় করাটা তাঁদের মধ্যে একপ্রকার দার্শনিক ফ্যাসানে পরিণত হয়েছিল। টলস্টয় যেমন একদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন সকলপ্রকার বিত্তের-ও বিরোধী। তাই তিনি একদিকে যেমন ধনীদের বিভব-বিলাস বা বিত্তের ব্যক্তিগত ভোগের তীব্র নিন্দা করেছিলেন, তেমনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন

বিত্তহীন কৃষকের জীবনকে। টলস্টয়-ও গান্ধীর মতোই সমাজে অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে প্রধান ব'লে স্বীকার না ক'রে করেছিলেন ধর্মকে প্রধান ব'লে। তাই টলস্টয় চেয়েছিলেন, ধর্মের অংগ হিসাবে প্রত্যেক মানুষ ত্যাগের অনুশীলন করবে এবং এই ভাবেই সমাজের একদিকের অতিরিক্ত ঐশ্বর্য এবং অন্যদিকের অসহনীয় দারিদ্র্যের হবে অবসান। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বৌদ্ধভিক্ষু বা খৃস্টান সাম্যবাদীর মতো হ'য়ে উঠবে ত্যাগী। এইভাবে দেশের সমস্ত বিত্তের হবে সুষ্ঠু বিতরণ এবং সাম্যের হবে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু টলস্টয়ের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নি, যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রচার তাঁর পরবর্তী মার্কসিস্ট সাম্যবাদীদের পথকে অনেক পরিমাণে সহজ ক'রে তুলেছিল। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাব সত্ত্বে-ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রচার গান্ধীজির মধ্যে তীব্র রূপ লাভ করে নি। কারণ, পূর্বেই বলেছি, তাঁদের উভয়ের পারিপার্শ্বিক অর্থনীতিক অবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল। টলস্টয় ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সমাজের মানুষ। অন্যপক্ষে, গান্ধী নবজাত ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজের মুখপাত্র, যে বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তিই হোলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু টলস্টয় ও গান্ধী, উভয়েই ত্যাগ ও দারিদ্র্যের স্তুতি করেছেন। ফলে, তাঁদের শিষ্য-সামন্ত দেশের ধনীরা কেউ ত্যাগের দ্বারা দারিদ্র্যকে বরণ করেন নি, কেবল শোষণের দ্বারা দারিদ্র্যকে দেশময় বিস্তীর্ণ ও তীব্রতর করার বিবেকসংগত সমর্থন লাভ করেছেন। তাই সেদিন রাশিয়ায়, কিম্বা আজ ভারতে বিভববিলাসহীনতা ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। তাই গান্ধীবাদী ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ আজ ত্যাগের মহিমায় সুন্দর হয় নি, শোষণে হয়েছে শুষ্ক, অনাহারের মুমূর্ষু, নিষ্পেষণে নিবীর্য।

টলস্টয় বা গান্ধীর কৃষক সাজবার পেছনে আর একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্য-

ও নিহিত ছিল। আত্ম-নির্যাতনের আনন্দ। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা নিশ্চয় একে বলবেন masochism.

দুঃখ পেলে মানুষ কাঁদে এই কারণেই যে, মানুষ কেঁদে আনন্দ পায়। কান্নাটা দুঃখের ক্ষতি-পূরণ মাত্র। তাই ক্ষতিপূরণের আশা নেই এমন দুঃখে মানুষ কাঁদে না। কিন্তু কান্না-ও একপ্রকার আত্ম-নির্যাতন মাত্র। এণ্টিস্থিনিস, ডিওজিনিস থেকে টলস্টয় ও গান্ধী পর্যন্ত অনেকের মধ্যেই আত্ম-নির্যাতনের তীব্র আনন্দবোধকে আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দৈহিক আত্মপীড়নের মধ্য দিয়েই প্রাচীন ভারতের কৃচ্ছ্র সাধক মহাতপা ঋষিরা পরমার্থিক আনন্দের পথ প্রশস্ত করতেন। এঁদের সকলেরই বেদনা ছিল বিলাস, দৈহিক দুঃখ-দহনের জ্বালা ছিল মানসিক দীপ্তি।

কেবল সন্ন্যাসী কেন, ব্যভিচারীদের মধ্যেও আত্ম-নির্যাতনের এই ভাবটীকে লক্ষ্য করা যায়। ধূমপান, মদ্যপান প্রভৃতি-ও অল্পবিস্তর আত্ম-নির্যাতন। তাই ব্রহ্মচর্যকে আধুনিকরা এক-প্রকার ব্যভিচার বলেই নির্দেশ করেন। বস্তুত পক্ষে, ব্রহ্মচর্য বা ব্যভিচার কোনোটিই স্বাভাবিক নয়। ও যেন দোলায়মান পেণ্ডুলামের দুই প্রান্তসীমা। ওরা পরস্পর থেকে যতোই দূরবর্তী হোক, ওদের মধ্যে চরিত্রগত একটী ঐক্য এবং আকর্ষণ আছে। তাই এক প্রান্ত অন্য প্রান্তের পানে পেণ্ডুলামটিকে কেবলই চালিত করে। মধ্য যুগে খৃস্টান ধর্মে ব্রহ্মচর্য পালন কি ভাবে ব্যাপক ব্যভিচারে পরিণত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক বর্ণনা পাওয়া যায় সুবিখ্যাত বোকা-সিওর কুবিখ্যাত 'ডেকামেরন'-এর মধ্যে। হত্যা আর আত্মহত্যা দুটোই মূলত এক — হত্যা মাত্র। আজকের স্বাস্থ্যহীন সমাজে ব্যভিচার ও উচ্ছৃংখলতা যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে, ব্রহ্মচর্যকেই সেখানে লোভনীয় আদর্শ মনে হয়। দোলায়মান পেণ্ডুলামের মতোই ব্যভিচারের প্রান্তসীমা

জীবনকে ঠেলে দেয় ব্রহ্মচর্যের প্রান্ত-সীমার দিকে। এ-ও একপ্রকার পলায়ন। দুঃস্থ সমাজ থেকে ব্যক্তির মধ্যে ফিরে আসা যেমন পলায়ন, ব্যভিচারী সমাজ থেকে ব্রহ্মচর্যের দিকে ধাবিত হওয়াও ঠিক তেমনি এক-প্রকার পলায়ন। পলায়নের দ্বারা ব্যক্তিগত নিষ্কৃতি হয়তো আংশিক ভাবে সম্ভব হতে পারে, বিপদের কারণটা কিন্তু রয়েই যায়। যে-সমাজে জীবন নেওয়াটাই দস্তুর, জীবন দেওয়াটা সেই সমাজের ধর্ম। যেখানে স্বার্থপরতাই মানুষের দ্বিতীয় স্বভাব, সেখানে স্বার্থত্যাগ হোলো আদর্শ। কিন্তু জীবন-দান বা স্বার্থত্যাগ কোনটি স্বাভাবিক আদর্শ নয়। কারণ, একের জীবন-দান অন্যকে হত্যাকারী ক'রে তোলে, একের স্বার্থত্যাগ অন্যকে ক'রে তোলে স্বার্থপর। তাই, আমরা দেখি, টলস্টয় বা গান্ধী, যিনিই ত্যাগ ও আত্মদানের স্তব করেছেন, তিনিই নিজের অজ্ঞাতে প্রচার করেছেন আদর্শের নামে অন্য একটা অনাদর্শকে।

গান্ধীজির ত্যাগ ও আত্মনির্যাতন প্রসংগে টলস্টয় ছাড়া আর যাঁর উল্লেখ অনিবার্য, তিনি হ'লেন গ্রীক দার্শনিক ডিওজিনিস।

আমরা বর্তমান প্রচলিত ভাষায় সংশয়ী নিরাশাবাদী মানুষদেরই সাধারণত সিনিক ব'লে থাকি। কিন্তু 'সিনিক' বলতে বস্তুত তা নয়। 'সিনিক' শব্দের অর্থ কুকুরের মতো। প্রাচীন কালে গ্রীক দেশে এক শ্রেণীর দার্শনিকের আবির্ভাব হয়, যাঁরা 'কুকুরের মতো' অর্থাৎ অতীব সহজ সরল জীবন যাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিতেন 'সিনিক' বা কুকুরপন্থী বলে। 'সিনিক' দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ডিওজিনিস। ডিওজিনিসের জন্মস্থান ছিল এশিয়ার অন্তর্গত পটাস। জন্মকাল সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৪১২। মৃত্যু-স্থান করিন্থ, মৃত্যুকাল খৃঃ পূঃ ৩২৩।

ডিওজিনিসের বাবা মেকী মুদ্রার কারবার ক'রে জেলে যান। ডিও-

জিনিস দেখলেন, কেবল তাঁর বাবাই যে দেশে মেকী মুদ্রা চালিয়েছিলেন তা নয়। জীবনের সকল দিকেই চলছে এই মেকী মুদ্রার কারবার। সমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চরিত্র, সব কিছুই মেকী। তাই ডিওজিনিস বার হলেন খাঁটির সন্ধানে। গ্রীক দার্শনিক এন্টিস্থিনিসের সংগে তাঁর পরিচয় হোলো। এন্টিস্থিনিস ছিলেন সক্রেতিসের সম-সাময়িক। প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক প্লেটোর চেয়ে কুড়ি বছরের বড়ো। এন্টিস্থিনিসের মধ্য দিয়ে ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার কয়েকটি সূত্র ডিওজিনিসের মধ্যে এক বিরাট, ব্যাপক ও চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে: ডিওজিনিস ঘোষণা করলেন, মানুষকে সুখী হ'তে হ'লে হ'তে হবে ত্যাগী। সম্পদ, শক্তি, সম্মান ও শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হবে। দৈহিক নির্যাতন হোলো তাঁর চিন্তার ফলিত বা অনুষ্ঠিত দিক। ডিওজিনিস অনেক সময় দিনের পর দিন ক্ষুধা সহ্য ক'রে থাকতেন, এবং এই অনিবার্য দৈহিক দাবীকে তিনি দমন ও অস্বীকার করার চেষ্টা করতেন। পরিধান করতেন স্বল্প বস্ত্র। (গান্ধীজির সংগে তুলনা করুন।) তাঁর শয্যা-ও ছিল সরলতম। অনেকে বলেন, তিনি একটি ঝুড়ির মধ্যে শুতেন। যাই হোক, ডিওজিনিস সম্পর্কে আমাদের এ-কথাও মনে রাখতে হবে, যে-সামাজিক বাতাবরণে থেকে টলস্টয় বা গান্ধীর মধ্যে ত্যাগের মহিমা ও দারিদ্র্যের স্তুতি দার্শনিক মূর্তি লাভ ক'রেছিল, অনুরূপ একটি অবস্থাতেই ডিওজিনিস হ'য়ে উঠেছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। বর্তমানে, টলস্টয় বা গান্ধীর যুগে, যেমন শত শত শ্রমিক শোষণের উপরে ভিত্তি ক'রেই বুর্জোয়া সমাজ ও রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি ডিওজিনিসের কালে-ও গ্রীসে শত শত বঞ্চিত ক্রীতদাসের শ্রমের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছিল গ্রীসের নাগরিক সমাজ ও নগর-রাষ্ট্রগুলি। তাই সেদিন ডিওজিনিসের দর্শন টলস্টয় ও গান্ধীর দর্শনের মতোই এসেছিল

দরিদ্র সর্বহারাকে সান্ত্বনা দিতে, সহিষ্ণুতা শেখাতে। আপাতদৃষ্টিতে সেদিন সর্বত্যাগী ডিওজিনিসকে সর্বগ্রাসী আলেকজান্দারের বিপরীত শক্তি ব'লে মনে হলে-ও, বস্তুত তাঁরা ছিলেন একই সামাজিক অবস্থার ছুটি উপসর্গ,—পরস্পরের পরিপূরক। তাই সেদিন ত্যাগ, দারিদ্র্য-প্রীতি ও দুঃখসহনের স্তুতির মধ্য দিয়ে টলস্টয় ও গান্ধীর মতোই ডিওজিনিস নিজের অজ্ঞাতে, পরোক্ষভাবে হ'য়ে উঠেছিলেন শোষক শ্রেণীর সহায়ক। কারণ, টলস্টয় বা গান্ধীর কালের শ্রমিকদের মতোই ডিওজিনিসের কালের ক্রীতদাসরা নিজেদের নিঃস্বতার মধ্যে পেয়েছিল আত্ম-সন্তুষ্টি, আত্মস্তুতি। তাদের দৈন্য পেয়েছিল ত্যাগের মহিমা, ভীরু অক্ষমতা পেয়েছিল দৃপ্ত সহিষ্ণুতার গৌরব। ফলে, সেদিন ডিওজিনিসের দর্শন ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, দাস-বিপ্লবের প্রতি-কূল, ঠিক টলস্টয় ও গান্ধীর দর্শন আজ যেমন হয়েছে শ্রমিক-বিপ্লবের প্রধান অন্তরায়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে টলস্টয় বা গান্ধীর মতোই ডিওজিনিস-ও ছিলেন অপূর্ব। তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর কাহিনী প্রচলিত আছে:

করিন্থের রাজপথের পার্শ্বে ব'সে আছে অর্ধোলংগ অপরিচ্ছন্ন একটি মানুষ। সম্মুখ দিয়ে চলেছে 'দিগ্‌বিজয়ী' গ্রীক সম্রাট আলেকজান্দারের শোভাযাত্রা। অজস্র মানুষের কোলাহল, তাদের সমারোহ, জয়ধ্বনির আকাশবিদারী উচ্ছ্বাস। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই ওই মানুষটির। ব্যাপারটা চোখে পড়লো আলেকজান্দারের। বড় আশ্চর্য লাগলো, দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দারের শক্তি ও ঐশ্বর্যকে ঈর্ষা করে না, কৌতূহল পর্যন্ত দেখায় না, কে এই মানুষ?

আলেকজান্দার ডিওজিনিসের কাছে এগিয়ে এলেন, পরিচয় দিলেন: 'আমি দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দার।'

কিন্তু পরিচয় পেয়ে লোকটি চমকে উঠলো না, ব্যস্ত বিব্রত হোলো না, তেমনি নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে ব'সে রইলো। কেবল বললো: 'আমি কুকুরপন্থী ডিওজিনিস।'

দিগ্‌বিজয়ী গ্রীক সম্রাট বুঝি এই প্রথম দেখলেন, তাঁর পরিচয় শুনে মানুষ চমকে ওঠে না, ভয় পায় না, শ্রদ্ধা দেখায় না, এমন কি কৌতূহল-ও প্রকাশ করে না! সম্রাট বিমুগ্ধ হ'য়ে বললেন, 'আপনার কি প্রয়োজন আমায় বলুন, ধন-রত্ন,—ক্রীতদাস……'

'কিছু না। কেবল আপনি দয়া ক'রে ভগবানের দেওয়া সূর্যালোকটুকুর পথ ছেড়ে দাঁড়ান।'

আলেকজান্দার বিস্মিত হলেন। মনে হোলো, বিপুল জলোচ্ছ্বাস যেন অকস্মাৎ একটি উপলখণ্ডের দিকে তাকিয়ে পলকের জন্যে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। বুঝি ভাবলো, বিপুল বিধ্বংসী তার শক্তি, উত্তাল উচ্ছ্বসিত তার তরংগ, দুরন্ত দুর্বার গতিবেগ, কিন্তু তবু—তবু সে কতো তরল! আর এই স্থবির স্থাণূ ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডটি কতো—কতো কঠিন! আলেকজান্দার ব'লে উঠলেন, 'আমি যদি দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্দার না হতাম, তবে কুকুরপন্থী ডিওজিনিস-ই হতাম।'

আরো একটি গল্প:

একদিন দিনের বেলা ডিওজিনিস একটি লণ্ঠন হাতে আথেন্সের রাজপথে কিসের সন্ধানে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেছিলেন, তিনি একজন সাধু ব্যক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। গান্ধীজি-ও যেন এমনি একটি সাধু ব্যক্তির সন্ধানে সমস্ত জীবন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, অবশেষে হয়তো তার সন্ধান পেয়েছিলেন নিজের মধ্যে, হয়তো!

শোনা যায়, ডিওজিনিসকে সক্রেতিস নাকি বলেছিলেন, 'তোমার শতচ্ছিন্ন পরিধানের ছিদ্র-পথেই তোমার দম্ভ আমি দেখতে পাচ্ছি।' গান্ধীজিকে সক্রেতিস কি বলতেন কে জানে। টলস্টয়ের মধ্যে অবশ্য কৃষক সেজে থাকার, গরীবিয়ানা করার একটি দম্ভ আমরা সহজেই লক্ষ্য করি।*

ডিওজিনিসের মৃত্যুক্ষণটিকে-ও স্মরণ না ক'রে পারা যায় না। আলেকজান্দারের মৃত্যুর দিনই ডিওজিনিস মারা যান ব'লে প্রবাদ আছে। এমন শান্ত, সমাহিত মৃত্যু সত্যই খুব কম দেখা যায়। মৃত্যুর দিন ডিওজিনিস বুঝলেন, তাঁর জীবনের দিকবলয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তাই তিনি রাজপথের পাশটিতে এসে বসলেন। দেখতে লাগলেন, মানুষের আনাগোনা। ভাবলেন, এমনি ভাবে মানুষ আসে, যায়। তিনিও যাচ্ছেন।

যদি আততায়ীর হাতে গান্ধীজির অপঘাত মৃত্যু না ঘটতো, তবে হয়তো তাঁরও এমনি একটি শান্ত, সুস্মিত, মনোরম মৃত্যু-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতো, কে জানে!

পৃথিবীর সিনিক দার্শনিকদের মধ্যে, বস্তুতপক্ষে, ডিওজিনিস, টলস্টয় এবং গান্ধী যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এ-কথা বলা চলে।

---

* ম্যাক্সিম গর্কি-ও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন: "গত কাল তিনি (টলস্টয়) আমাকে বলেছিলেন, 'তোমার চেয়ে আমার মধ্যে কৃষকের দিকটা আছে অনেক বেশি। তাই চাষাড়ে ভংগীতে চিন্তা করতে আমার ভালো লাগে।'

ও হরি! ও নিয়ে বড়াই করা উচিত ছিল না। অবশ্যই না।"—গর্কি রচিত 'টলস্টয়ের স্মৃতি' থেকে।

রোম্যাঁ রোলাঁ-ও তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে বলেন: "টলস্টয়ের কাছে সমস্তই ছিল এক সদম্ভ বিদ্রোহ—দম্ভের বিরুদ্ধে, ঘৃণা ঘৃণার বিরুদ্ধে, উচ্ছ্বাস—উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে।"

এই ভাবে, ভ্রান্ত হোক, অভ্রান্ত হোক, একটি আদর্শে প্রণোদিত হ'য়েই রুশ জমিদার টলস্টয়ের মতোই বিলাত-ফেরৎ ব্যারিস্টার গান্ধী কৃষাণ সাজতে চাইলেন। গান্ধীজির সহকর্মী শিষ্যরা অনেকে অবিলম্বে এই কৃষিক্ষেত্রে যোগদান করলে-ও গান্ধীজিকে আরো কিছুদিন জোহান্‌স্‌বার্গে থেকে যেতো হোলো। কেবল ব্যারিস্টারির জন্যে নয়, রাজনীতিক কারণে-ও জোহান্‌স্‌বার্গ ছেড়ে আসা গান্ধীজির পক্ষে সহজ ছিল না। ট্রান্সভালে তখন ভারতীয়-নির্যাতনের এক বিপুল কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছিল। স্থির হ'য়েছিল, ট্রান্সভালে নূতন ভারতীয় আসা যদি সত্যিই বন্ধ করতে হয়, তবে পুরাতন যারা আছে, তাদের সম্পর্কে এমন ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে একজনের বদলে আর একজন এসে না ঢুকতে পারে, যদি বা আসে যেন তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। ট্রান্সভাল ইংরেজ অধিকারে আসার পর থেকেই 'পাশ' দেওয়া হোতো। 'পাশে' সই এবং নিরক্ষর হ'লে টিপসই থাকতো। পরে ঠিক হোলো, ফটোগ্রাফ, সই আর টিপসই এ তিনই লাগবে। এর জন্যে আইন করার কোনো দরকার ছিল না। কারণ, ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থাকে সাময়িক হিসাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু ব্যবস্থাটাকে সাময়িক রাখার ইচ্ছা মোটেই ছিল না সরকারের। তাই ভারতীয়দের ফটো, সই ও টিপসই দেওয়ার ব্যবস্থাটাকে আইনে পরিণত করার জন্যে একটি বিল আইন সভায় উত্থাপিত হোলো।

ট্রান্সভালে বৃটিশরা যখন ভারতীয়দের উপর এই ধরণের জুলুম করছিল, তখন নাতালে বৃটিশরা আদিম অধিবাসী জুলুদের উপর করছিল অমানুষিক অত্যাচার। এবং জুলু দমনের এই নৃশংস ঘটনাকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশরা সভ্য জগতের কাছে প্রচার করছিল বিদ্রোহ ব'লে। গান্ধীজি-ও তাঁর 'আত্ম-কথা' গ্রন্থে বলেন : "এ তো যুদ্ধ নয়, এ ছিল মানুষ শীকার।"

নাতালে জুলু-বিদ্রোহের এই সংবাদ ট্রান্সভালে গান্ধীজির কানে গেলো গান্ধীজি বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করতে চাইলেন। "জুলুদের সংগে আমার কোনো শত্রুতা ছিল না। একজন ভারতবাসীর-ও তারা কোনো ক্ষতি করে নি। তাদের বিদ্রোহ করার সামর্থ্য সম্পর্কে আমার নিজের-ও সংশয় ছিল। কিন্তু তখনো ইংরেজ রাজত্বকে আমি জগতের কল্যাণকামী রাজত্ব ব'লেই মানতাম।...বৃটিশের ক্ষতি হোক, আমি তা চাইতাম না। এ জন্যেই বল-প্রয়োগের নীতি বা দুর্নীতি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত আমাকে আমার সংকল্প থেকে বিরত করতে সমর্থ হোলো না।"

রাতারাতি গান্ধীজি নাতালে চ'লে গেলেন। কস্তুরবাই গেলেন ফিনিক্সের কৃষিক্ষেত্রে। স্থানীয় ভারতীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে তিনি একটি সেবাদল তৈরী করলেন। সামরিক পদ হিসাবে গান্ধীজি হলেন সার্জেণ্ট মেজর গান্ধী। ইংরেজদের সাহায্যে এসে কিন্তু গান্ধীজি প্রথমে স্বস্তি পান নি। তবে আহত জুলুদের সেবা ও শুশ্রূষা করার ভার যখন তাঁর উপর এসে পড়লো, তখন তিনি সত্যই আনন্দিত হ'য়ে উঠলেন। তিনি যে তথাকথিত কর্তব্যের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তার যেন একটা আপোষ-মীমাংসা ঘটলো। "দেখলাম, আমরা যে সমস্ত নিগ্রোর সেবা করছিলাম, আমরা না গেলে তারা বিনা শুশ্রূষায় মরতো।...কতকগুলি নিগ্রোর ঘায়ে পাঁচ ছয় দিন হাত দেওয়া হয় নি, ঘা প'চে দুর্গন্ধ হয়েছে।"

নাতালে গান্ধীজি যখন আহত জুলুদের শুশ্রূষা ক'রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন ট্রান্সভাল থেকে কেবলই তাঁর জরুরী ডাক আসতে লাগলো, সেখানে তাঁর একান্ত প্রয়োজন। গান্ধীজি অধীর হ'য়ে উঠলেন। অবশেষে মাস খানেকের মধ্যে 'জুলু বিদ্রোহ' দমিত হোলো। গান্ধীজি আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করলেন না, এমন কি নাতালের

ফিনিক্সে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সংগে সাক্ষাতের-ও সময় পেলেন না, ট্রান্সভালে ফিরে গেলেন। জোহান্সবার্গে পৌঁছেই গান্ধীজি 'এশিয়াটিক আইনের' খসড়াটি হাতে পেলেন।

খসড়ায় বলা হয়েছে : ট্রান্সভালবাসী সমস্ত ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষ এবং আট বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক বালক-বালিকা, সবাইকে নাম লিখিয়ে নূতন ক'রে পাশ নিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাম লিখিয়ে পাশ না নিলে ট্রান্সভালে থাকার অধিকার আর থাকবে না। কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং ট্রান্সভালের বাইরে বহিষ্কার-ও হতে পারবে। যে পাশ দেওয়া হবে, তাও আবার যেখানে যেমন অবস্থায় যখন ইচ্ছা পুলিশ দেখতে চাইলে দেখাতে হবে। গান্ধীজি বলেন : "পৃথিবীর অন্য কোথা-ও স্বাধীন মানুষের জন্যে এই রকম আইন আছে ব'লে আমি জানি না।…এই আইন ভংগের যা সাজা, তা-ও নাতালের অন্যান্য আইন ভংগের সাজার সংগে তুলনাই করা যায় না। যে-ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছে, এই আইনের বলে তাকেও বহিষ্কৃত হ'তে হবে। কেবল তাই নয়, এই আইনে কারো কারো আর্থিক সর্বনাশ ঘটবে।" গান্ধীজি আরো বলেন : "আমার মনে হোলো, এই বিল যদি পাশ হয়, এবং ভারতীয়রা তা মেনে নেয়, তবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তারা সর্বতোভাবে উৎপাটিত হবে। আমি স্পষ্ট দেখলাম, ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এ হোলো মরা-বাঁচার প্রশ্ন।"

সুতরাং ধনিক ভারতীয়ের নেতৃত্বেই এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হোলো। ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আহূত হোলো একটি সভা। তাতে ট্রান্সভালের বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিরা যোগ দিলেন। সভায় শপথ গৃহীত হোলো যে, প্রাণ পণ ক'রে এই আইনের বিরোধিতা করা হবে। এর পর ট্রান্সভালের সর্বত্রই সভাসমিতি ও সংগঠন শুরু হোলো।

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লো জোনান্সবার্গ শহর থেকে চারিদিকে, ট্রান্সভালের বিস্তৃত ভূমিতে।

কেবল সংগ্রাম নয়, আপোষ-মীমাংসার পথে-ও ভারতীয়রা অগ্রসর হলেন। বস্তুতপক্ষে, কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে সমস্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সংগ্রামের চেয়ে সহযোগিতার উপর-ই বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। এবং এর কারণ এই ছিল যে, বৃটিশ বুর্জোয়াদের সংগে ভারতীয় বুর্জোয়াদের লড়াইটা যতোই প্রবল হোক, তারা উভয়েই ছিলো একই বুর্জোয়া বংশেরই মানুষ। তাই তাদের স্বার্থের লড়াইটা প্রবল হ'লে-ও, তা কতকটা ভাই-এ ভাই-এ কলহের রূপ নিয়েছিল। তার একদিকে যেমন ছিল আস্ফালন, অন্যদিকে ছিল তেমনি অভিমান, একদিকে যেমন ছিল স্বার্থের জন্যে বিচ্ছেদ, অন্যদিকে তেমনি ছিল পরস্পরের স্বার্থের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

গান্ধীজিকে সচরাচর সত্যাগ্রহ সংগ্রামের উদ্ভাবক বলা হয়। গান্ধীজি কতক পরিমাণে নিজে-ও তা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের দিক থেকে, তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। যুদ্ধের এই নীতি ও রীতি দুই হাজার বৎসর ধ'রে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে প্রযুক্ত হয়েছে। গান্ধীজি তাকে প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, এই মাত্র।

আর একটি জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি। পৃথিবীতে যতো বার অনুরূপ অহিংস প্রতিরোধের নীতি গৃহীত হয়েছে, প্রতি বারেই তা হয়েছে কোনো সুদৃঢ় শক্তিশালী এক শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আবার যখন-ই সেই শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হ'য়ে পড়েছে, তখনই দেখা গেছে, তার বিরোধিতা ঘটেছে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। গান্ধীজি-ও খৃস্টকে প্রথম সত্যাগ্রহী ব'লেই বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু যিশু খৃস্টের পূর্বে জুডিআ বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যতোদিন স্বাধীন, কিম্বা দুর্বল, ক্ষুদ্র, খণ্ডিত ছিল, ততোদিন সেখানে জোনা, নোআ ও মোজেজ প্রভৃতি মহাপুরুষদের 'চোখের বদলে চোখ, ও দাঁতের বদলে দাঁত' নীতিরই ছিল প্রচলন তথা প্রচার। এমন কি খৃস্টের অনতিপূর্ববর্তী ঋষি হ্যাগাই-এর বাণীর মধ্যে-ও আমরা তারই প্রতিধ্বনি শুনি। ঋষি হ্যাগাই-এর কাল প্রায় খৃস্টপূর্ব ৫২০। জুডিয়া বা তৎ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যখন শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হোলো, তখন দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য প্রবলতর হওয়া সত্ত্বে-ও তার প্রতিবিধান করার আর কোনো আশা ছিল না। কারণ, এই শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল অসম্ভব, তাই রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত মানুষরা যখন দেখলো যে, পার্থিব দুঃখ-দারিদ্র্যের হাত থেকে তাদের আর কোনো অব্যাহতি নেই, তখন তাদের মধ্যে দেখা গেল পার্থিব বিষয় সম্পর্কে গভীর হতাশা, এবং অবৈপ্লবিক সহিষ্ণু মনোবৃত্তি। তারা একদিকে যেমন সহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও দারিদ্র্যের মহিমা কীর্তিত ক'রে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে চাইলো, তেমনি অন্য দিকে অপার্থিবের আশায় ও কল্পনায় উঠলো মেতে। খৃস্টপূর্ব ঋষিরা, যাঁরা রোম সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসেন নি, তাঁদের বাণীর মধ্যে অপার্থিবের প্রতি এই রকম নিবিড় অনুরাগ দেখা যায় না। তাই তাঁরা বিপ্লবী, তাঁরা হিংসাপরায়ণ, তাঁরা প্রতিবিধিৎসু। হ্যাগাই-এর বাণীর

মধ্যে এই পার্থিব স্থর স্থন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল। তাঁর বাণীর মধ্যে খৃস্টের 'স্বর্গীয় ব্যবস্থার' কল্পনা নেই, তা পার্থিবের দীপ্তিতে ভাস্বর, তেজস্মান। "I will shake the heavens and earth, and the sea and the dry land……And the desirable things of all nations shall come, and I will fill this house, with my glory, saith Yahveh of hosts. The silver is mine, the gold is mine, saith Yahveh of host."

পরে আবার যখন রোম সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরলো, তার দৌর্বল্য প্রকাশ পেলো, তখন খৃস্টানরা বিনা দ্বিধায় ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার বাণী ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করলেন—মহম্মদের মতোই তরবারি যোগে প্রচার করতে চাইলেন খৃস্টান ধর্ম। খৃস্ট ধর্মের অন্যতম শাখা ইসলাম-এর যখন অভ্যুত্থান ঘটেছিল, সেই সময়ে আরব দেশে রোম সাম্রাজ্যের মতো শক্তিশালী কোনো শাসন-ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, সেখানে খৃস্টান ধর্ম মহম্মদের মারফৎ সহিংস, সশস্ত্র বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করেছিল। অবশ্য, মরুভূমিতে পার্থিব সম্পদের অপাচুর্য তাঁদেরও অপার্থিবের প্রতি বিশেষভাবে আসক্ত ক'রে তোলে।

গান্ধীজির ত্যাগ, অহিংসা বা পারলৌকিকতার সংগে আদিম খৃস্টানদের রীতিনীতির বহুল সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সাদৃশ্যের প্রধান কারণ—গান্ধীজি-ও রোম-সাম্রাজ্যের অনুরূপ বিশাল শক্তিশালী একটি সাম্রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণের কাছে সশস্ত্র বিদ্রোহ যেমন ছিল কল্পনার অতীত, পার্থিব স্থখ-সম্পদ-ও ছিল তেমনি অবাস্তব। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দরিদ্র জনসাধারণের কাছে-ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ছিল একটি আতংকের বস্তু। তার বিপুলত্ব তাকে অনেক পরিমাণে

মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল। বিশেষত, সিপাহী-বিদ্রোহের পরাজয়ের পরে, তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের কল্পনা করাও ছিল যেমন বৃথা, তেমনি পার্থিব দুঃখদৈন্যের নিরশন হওয়ার আশা-ও ছিল অবাস্তব। ফলে, ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ এক দিকে যেমন গান্ধীর ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও অহিংসার মধ্যে সান্ত্বনা পেলো, তেমনি আশা ও ভরসা পেলো তাঁর ধর্ম, ভগবান ও পারলৌকিকতার মধ্যে। তাই আদিম খৃস্টান ধর্মের অনুরূপ পথেই গান্ধীর খৃস্টান ধর্ম-ও গ'ড়ে উঠলো—তা মহম্মদের মতো সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ নিলো না।

কেবল খৃস্ট বা গান্ধীর কালে-ই নয়, অন্যান্য সময়ে-ও যখনি দেখা গেছে, জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগ ঘটছে, রাষ্ট্রের কাছে তার কোনো প্রতিকার মিলছে না, অথচ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের বিন্দুমাত্র আশা-ও নেই, তখনই এই অহিংস প্রতিবাদের পথ গৃহীত হয়েছে। পশ্চিম জগতে এর নাম দেওয়া হয়েছে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance. গান্ধীজি তাঁর সত্যাগ্রহ অন্দোলনকে এই নিষ্ক্রিয় আন্দোলন থেকে পৃথক ক'রে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, সত্যাগ্রহ নিষ্ক্রিয় নয়। অর্থাৎ ইউরোপের প্যাসিভ রেজিস্টেন্সগুলি যেন নিষ্ক্রিয়ই ছিল!* কোয়েকার বা দুখবরদের আন্দোলনের কথাই ধরা যাক। তাঁরা সভাসমিতি, প্রচার, আন্দোলন, আইন অমান্য ইত্যাদি সত্যাগ্রহের সমস্ত পথগুলিকে সময়োপযোগীভাবে ব্যবহার করতেন। সেদিক থেকে তাঁরা

* "সত্যাগ্রহের মূল-মন্ত্রের প্রয়োগ সামাজিক ভাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে ট্রান্সভালেই প্রথম হোলো। টলস্টয় এই কথাই বলেন। আমি শুদ্ধ সত্যাগ্রহ প্রয়োগের ঐতিহাসিক উদাহরণ পাই না। আমার ইতিহাসের জ্ঞান অল্প ব'লে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারি না।"

গান্ধীজি বা গান্ধীবাদীদের অপেক্ষা কোনো অংশে-ই নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। গান্ধীজির আন্দোলনের সংগে তাঁদের আন্দোলনের একমাত্র পার্থক্য হোলো গান্ধীজির আন্দোলনের অধিকতর ব্যাপকতা এবং বৃহত্তর জনসংখ্যা। অথচ আন্দোলনকারীর জনসংখ্যার উপর গান্ধীজি নিজে বিন্দুমাত্র জোর দেন না। তাঁর মতে, একজন মানুষ-ও সত্যগ্রহ করলে যথেষ্ট। তাতেই সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে, অবিচার অনাচার লোপ পাবে, 'রামরাজ্য' হবে প্রতিষ্ঠিত। "I do not regard the force of number as necessary in a just cause."* অথচ দক্ষিণ আফ্রিকায় বা ভারতবর্ষের প্রধান আন্দোলনগুলিতে তিনি সংখ্যার উপর নির্ভর না ক'রে পারেন নি, জনসাধারণ প্রস্তুত নয় ব'লে তিনি বারে বারে আন্দোলন স্থগিত রেখেছিলেন। অবশ্য, ব্যষ্টিবাদী বুর্জোয়া-সমাজের মুখপাত্র হিসাবে ব্যক্তি-মহিমাকে বাক্যত স্বীকার ও প্রচার না ক'রে তাঁর উপায় ছিল না। এই প্রচারের কবলে তিনি নিজে-ও কবলিত হয়েছিলেন। তেলে-পোকার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, তারা নাকি তাদের জারক রসে অন্যান্য পোকাকে ভিজিয়ে, কেবল তাদের জাতি নয়, বর্ণ-ও বদলে দিয়ে স্বজাতিভুক্ত ক'রে নেয়। গান্ধীজির বেলাতে-ও হয়েছিল তা-ই। তিনি সত্য সন্ধান করতে গিয়ে বুর্জোয়া প্রচারের জারক রসে পতিত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রচার-বাক্যগুলিকে স্বর্গীয় বাণী ব'লে করেছিলেন গ্রহণ। তাঁর সংখ্যা-বিদ্বেষ তারই অন্যতম নিদর্শন। তাই আমরা গান্ধীজির জীবনে লক্ষ্য করি, একদা ভারতবর্ষে স্থানীয় শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা ও আত্মসংগঠন শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সংগে সংগে, অর্থাৎ শ্রমিক বা কৃষাণরা যখন আর

* ইয়াং ইণ্ডিয়া, হাণ্টার কমিটিতে প্রশ্নোত্তর।

কেবল বুর্জোয়া যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত না হয়ে নিজেদের স্বার্থের জন্যে-ই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলো, তখন গান্ধীজির মধ্যে ব্যষ্টিবাদিতা (individualism) দ্রুত একটি চরম রূপ গ্রহণ করলো, গান্ধীজি আন্দোলনকে ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর ক'রে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকের প্রথমে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে ফিরে এলেন—তাঁর 'ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ' আন্দোলনে। জনসাধারণের প্রচণ্ড সংগ্রামী শক্তির বিস্ফোরণকে শক্তিহীন ও দুর্বল করার মানসেই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের আন্দোলন গৃহীত হয়েছিল, একথা বলা চ'লে। এই আন্দোলন ছিল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশী ধনতন্ত্রবাদের 'সেফটি ভাল্‌ভ্‌'। সুতরাং আন্দোলনকারীর সংখ্যার অনুপাতের দিকে লক্ষ্য না দিলে গান্ধীর সত্যাগ্রহের সংগে বৃটিশ কোয়েকার ও রুশ দুখবরদের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র পার্থক্য থাকে না। একথা-ও এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রুশ দুখবর আন্দোলন শক্তিশালী রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই ঘটেছিল।

গান্ধীজি বলেন, ডাঃ ক্লিফোর্ডের নেতৃত্বে 'নন-কনফর্মিস্ট' খৃস্টানরা বা ভোটের দাবীতে ইংরেজ মহিলারা যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করেছিলেন, তা ছিল দুর্বলের আন্দোলন, সে সব আন্দোলন থেকে বিপক্ষের প্রতি বৈরী-ভাবকে দূর করা হয় নি। অন্যপক্ষে, তাঁর নিজের আন্দোলন ছিল শক্তিমানের আন্দোলন, তাতে বিপক্ষের প্রতি প্রেম ও ক্ষমা ছাড়া কিছুমাত্র শত্রুতা ছিল না। গান্ধীজির এই উক্তি অলীক কল্পনা মাত্র। গান্ধীজি তাঁর আন্দোলনকে এমনি একটি পথে পরিচালিত করতে হয়তো চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুবর্তীরা যে সেই দার্শনিক মনোভাবকে বিন্দুমাত্র গ্রহণ করে নি, কেবল বিপক্ষকে পরাজিত করার জন্যে তাকে রণকৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছিল, একথা সত্য। তাই কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে

সর্বত্রই দেখা গেছে, জনসাধারণের মধ্যে রোষ ও আক্রোশ স্থলে স্থলে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। হিংসার এই সাময়িক খণ্ড প্রকাশের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে বিপক্ষের প্রতি রোষ ও ক্ষোভ প্রচুর পরিমাণে ছিল, সেগুলিকে তারা রণকৌশলের অংগ হিসাবে দমন ক'রে রেখেছিল মাত্র। সত্যাগ্রহ আন্দোলন যে শক্তিমানের আন্দোলন, তাও বলা চলে না। গান্ধীজি ছাড়া তাঁর শিবিরের অন্যান্য সেনানায়করা এ কথা বিশ্বাস করতেন না। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা নিঃসংকোচে বলেছেন, অহিংসা আন্দোলন তাঁদের কাছে 'expedient' মাত্র। সম্ভব হ'লে, সুযোগ থাকলে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানে তাঁদের আপত্তি ছিল না। গান্ধীজি নিজে-ও বলেন: "একথা আমি বোঝাতে চাই না যে ভারতীয়দের যদি মতাধিকার বা অস্ত্রবল থাকতো, তবুও তারা সত্যাগ্রহ করতো। ভোটাধিকার থাকলে অধিকাংশক্ষেত্রে সত্যাগ্রহের আবশ্যকই হয় না। আর যদি অস্ত্রবল থাকে, তবে অপর পক্ষ অবশ্যই সাবধান হ'য়ে চলেন।" (—"দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ') অন্যত্র: "মিষ্টি কথায় তিনি (মিঃ চেম্বারলেন) আমাদের বুঝিয়ে দিলেন যে, 'তোমাতে আমাতে তরবারির সম্পর্ক।' কিন্তু আমাদের তরবারি কোথায়? তরবারির আঘাত সহ্য করার দেহ থাকে তো আমরা তাই ভাগ্য গণবো।" (—গান্ধীজির 'আত্মকথা') সুতরাং বোঝা যায়, ইউরোপীয় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সংগে ভারতীয় সত্যাগ্রহের কোনো মূলগত পার্থক্য নেই। সত্যাগ্রহ বস্তুত দুর্বলেরই আন্দোলন। সত্যাগ্রহের শক্তি, সহিষ্ণুতা ও ধর্মের মহিমা দেওয়ার ব্যাপারটা কতোক পরিমাণে এই রকম দাঁড়ায়: ভিখারীর ভাণ্ডারে চাল নেই; উপবাস তার অনিবার্য; কিন্তু সেদিন ছিল

একাদশী; তাই ভিখারী ভাবলো, ব্রত করলে কেমন হয়? উপবাস তো হচ্ছেই, সেই সংগে পুণ্যলাভ-ও হবে খানিকটা, আর তাতে উপবাস সহ্য করার মানসিক সাহায্য-ও জুটবে। গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে শক্তির ও ধর্মের মহিমা দিয়ে তাঁর অনুবর্তীদের মনোবল যে বাড়িয়ে তুলেছিলেন, একথা তিনি নিজে-ও স্বীকার করেন।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরিবর্তে 'সত্যাগ্রহ' নামটি কেন এই আন্দোলনকে দেওয়া হোলো, তার অন্যতম কারণ হিসাবে গান্ধীজি বলেন: "যুদ্ধ যতোই এগোতে লাগলো, নামটা ততই বেখাপ মনে হোলো। এই মহাসংগ্রামকে একটা ইংরেজি নামে ডাকতে আমার লজ্জা করতো। তাছাড়া ঐ বিদেশী শব্দটি সম্প্রদায়ের মুখে চালু করা-ও ছিল কঠিন।" নূতন নামকরণের পক্ষে এই যুক্তিটি সম্পূর্ণ গ্রহণীয়। কেবল তাই নয়, কোনো সংগ্রামকে নিষ্ক্রিয় নামে অভিহিত করলে সংগ্রামের উদ্যম হ্রাস পেতে পারে, এই আশংকা-ও ছিল। তাই নিষ্ক্রিয় কথাটির বিরুদ্ধে রণকৌশলী গান্ধীজি সতর্ক হ'য়েছিলেন মনে হয়।

যাই হোক, আমরা লক্ষ্য করেছি, রোম সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনেই মূলত অহিংসাত্মক সংগ্রাম বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আত্মপ্রকাশ করেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে অহিংসার সংস্কৃতি আমেরিকা মুলুকেও পৌছেছিল। সেখানে তা যে কয়েকজন মনীষীর মধ্যে প্রধানত প্রকাশ লাভ করেছিল তাঁদের মধ্যে অ্যাডিন ব্যাল্লু (Adin Ballou) এবং গ্যারিসনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ব্যাল্লু ও গ্যারিসন প্রায় সমসাময়িক। অবশ্য, অহিংসা যুদ্ধের সংঘ ও সূচী গ্যারিসনের মধ্যে-ই পূর্ণতর রূপ লাভ ক'রেছিল।

উইলিয়ম লয়েড গ্যারিসনের জন্ম হয় মাসাচুসেটে, ১৮০৪ খৃস্টাব্দে। তাঁর

কালের আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ। তাই বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার আগেই গ্যারিসন দাস প্রথা-উচ্ছেদের কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ গান্ধীজির জন্মের ঠিক দশ-বৎসর বাদে, তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্যারিসন বিশ্বাস করতেন, কেবলমাত্র অহিংসার প্রচার এবং অহিংস সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই কোনো মহৎ কার্য সাধিত হ'তে পারে। তাই অহিংসা প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্যারিসন একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অহিংস উপায়ে দাস-প্রথার উচ্ছেদের জন্যে প্রচার চালাতে থাকেন। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রচারে দাস-প্রথার সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করতে থাকে। গ্যারিসনের কাছে হত্যার ভয় দেখিয়ে চিঠিপত্র প্রায়ই আসতো। কিন্তু গান্ধীজির মতোই গ্যারিসন-ও ঘাতকের অস্ত্রকে ভয় করতেন না। বন্ধু-বান্ধবদের বহু অনুরোধ সত্ত্বে-ও তিনি কোনো অস্ত্র কখনো সংগে নিতেন না। দাস-প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস যুদ্ধ পূর্ণ উদ্যমে চলতো। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, আইনত আমেরিকা থেকে দাস-প্রথার উচ্ছেদ হয়েছিল ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। কিন্তু সত্যিকারের উচ্ছেদের জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল একটি ব্যাপক রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের। সেই গৃহযুদ্ধের বিজয়ী নেতা ছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন,—অহিংস যোদ্ধা উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন নন!

সুতরাং দেখা যায়, ঐতিহাসিকতার দিক থেকে 'সত্যাগ্রহ' গান্ধীজির উদ্ভাবন নয়। অনুরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে তা বহুবার প্রকাশ লাভ করেছে। তবে সময়োপযোগী অস্ত্র হিসাবে অহিংস যুদ্ধের কলাকৌশল এবং রীতিনীতিকে গ্রহণ করার সকল গৌরব যে গান্ধীজির, এ-কথা বলা বাহুল্য। অস্ত্র আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করলে-ও

—হোক তা অহিংস অস্ত্র—সৈনাপত্যের গৌরব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করবে কে? সে গৌরব তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বৃটিশ সরকারের কাছেও প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হোলো। কারণ, ট্রান্সভাল তখনো 'ক্রাউন কলোনি' বা খাস উপনিবেশ হিসাবে গণ্য হোতো। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেছিলেন গান্ধীজি স্বয়ং। ট্রান্সভালে স্বায়ত্ত-শাসন না থাকায় সেখানের সরকারী কার্যকলাপের দায়িত্ব খোদ বৃটিশ সরকারের ঘাড়ে এসে শেষে পড়ে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-দলনে বৃটিশ সরকারের পূর্ণ সমর্থন থাকলে-ও ভারতবর্ষের শাসন-কার্যে পাছে গোলযোগ ঘটে এই ভয়ে দায়িত্ব তাঁরা নিতে নারাজ। তখন উপনিবেশ-সচিব ছিলেন লর্ড এলগিন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি-দলকে নিতান্ত অমায়িক ভাবেই জানালেন যে, ভারতবাসীর উপর এমন অন্যায় বৃটিশ সরকার কখনো হ'তে দিতে পারেন না। এশিয়াটিক বিল না মঞ্জুর করার জন্যে তাঁরা সম্রাটকে পরামর্শ দেবেন।

কিন্তু তাঁরা সেই সংগে আর-ও একটি পরামর্শ সম্রাটকে দিলেন। স্থির হোলো, ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ১লা জানুয়ারি থেকে ট্রান্সভালকে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে। তাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দলন চলবে, অথচ তার দায়িত্ব বৃটিশ সরকারকে গ্রহণ করতে হবে না।

ট্রান্সভালে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হোলো। নূতন আইন সভায় প্রথমে পাশ হোলো বাজেট, ঠিক তার পরেই এশিয়াটিক বিল। স্থির হোলো, ১৯০৭ সালের ১লা জুলাই থেকে এশিয়াটিক আইন বলবৎ হবে। ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে নিজেদের নাম লেখাবার জন্যে হুকুম হোলো ভারতীয়দের উপর।

কিন্তু কে মানে হুকুম ! ভারতীয়রা ক্রমেই সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলেন। বৃটিশ সরকারের প্রতারণা তাঁদের আরো ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। প্রিটোরিয়ার এক জনসভায় স্থির হোলো, এই অপমানজনক আইন ভারতীয়রা কেউ মানবেন না। শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহের পথে তাঁরা এর প্রতিরোধ করবেন। সরকারী জুলুমের ভয়ে গোড়ায় শ পাঁচেক লোক পাশ নিয়েছিল। কিন্তু এর বেশী সরকারের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হোলো। ফলে শুরু হোলো ব্যাপক গ্রেফতার। বিচারে সত্যাগ্রহীদের উপর অবিলম্বে ট্রান্সভাল ত্যাগের আদেশ হোলো। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা ফের আদেশ অমান্য করলেন। গান্ধীজি-ও গ্রেফ্‌তার হোলেন। গান্ধীজির গ্রেফতারের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় দিনে বন্দী সত্যাগ্রহীতে কারাগার ভ'রে গেলো। এই ভাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে বন্দীর সংখ্যা হোলো শতাধিক। মেয়েরাও বাদ গেলেন না। জেলের বাইরে ভারতীয়দের মধ্যে অপূর্ব চাঞ্চল্য এবং উৎসাহ দেখা গেলো। এমন সময় ট্রান্সভাল সরকারের পক্ষ থেকে এলো সন্ধির প্রস্তাব। শর্ত, প্রথমে ভারতীয়রা সত্যাগ্রহ বন্ধ ক'রে স্বেচ্ছায় গিয়ে নাম লিখিয়ে পাশ নিয়ে আসবেন, তাহলে ট্রান্সভাল সরকার পরে আইনটি তুলে নেবেন। সরকারের প্রধান কর্তা জেনারেল স্মাটসের ধূর্ততা সম্পর্কে গান্ধীজি যে সন্দিহান ছিলেন না, এমন নয় ; তবু তিনি এই শর্তেই আপোষ করতে রাজী হলেন। কারণ, আপোষ এবং সহযোগিতাই সত্যাগ্রহের প্রথম ও শেষ কথা। সত্যাগ্রহ স্থগিত রইলো। গান্ধীজি ভারতীয়দের বুঝিয়ে বললেন, ধ'রেই নেওয়া যাক, জেনারেল স্মাটস্ তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখবেন। যদি না রাখেন, তবে ভয় কি, পুনরায় সত্যাগ্রহ শুরু করা যাবে। *

* এ সম্পর্কে প্রথম সত্যাগ্রহী যিশুর বাণী স্মরণীয় :

"Agree with thine adversary quickly, while thou art in the

অনেকে প্রতিবাদ করলেন, তাতে জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তা ব্যাহত হবে; পরে সত্যই যদি আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁদের সাহায্য মিলবে না। কিন্তু গান্ধীজি জবাবে বললেন, সত্যাগ্রহীর যুদ্ধ সাময়িক উত্তেজনার উপর নির্ভর করে না। কারণ, তা শান্তি, ধৈর্য এবং বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যাগ্রহীর সর্বপ্রথম কর্তব্য শত্রুকে বিশ্বাস করা: সুতরাং আন্দোলন স্থগিত রইলো। গান্ধীজি সত্যাগ্রহীদের বললেন, তাঁরা যেন শান্তিপূর্ণ এবং আইনানুগভাবে নিজেদের নাম লিখিয়ে পাশ নিয়ে আসেন এবং স্থির করলেন, সর্বপ্রথমে তিনিই পাশ নেবেন। কিন্তু তবু প্রতিবাদের শেষ হয় না: একদা গান্ধীজি স্বয়ং এই পাশের বিরুদ্ধে প্রচার ক'রে ছিলেন, আজ অকস্মাৎ তাঁর মধ্যে পাশের প্রতি প্রীতি উথলে উঠলো কেন? এই প্রশ্নের জবাব-ও গান্ধীজি তাঁর স্বাভাবিক বাক্-চাতুর্যের সংগেই দিলেন: স্বেচ্ছায় নমস্কার করাটাই ভদ্রতা। কিন্তু কেউ যদি নমস্কার করিয়ে নেয়, সেটা হোলো জুলুম। আমরা এখন স্বেচ্ছায় পাশ নেবো; এটাই সৌজন্য।' কিন্তু এতে-ও সমস্ত আন্দোলনকারীর সন্দেহের নিরশন হোলো না। কারো কারো ধারণা হোলো, গান্ধীজি ঘুষ খেয়েছেন, এমন কি কল্পনায় এবং জনশ্রুতিতে ঘুষের পরিমাণটাও নির্ধারিত হ'য়ে গেলো, পনের হাজার পাউণ্ড। তাই পরদিন পাশ নেওয়ার

---

way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer and thou be cast into prison" (Matt. v, 25)

অবশ্য, গান্ধীজি স্বেচ্ছায় ও সহজে কারাবরণ করতেন। রোম সাম্রাজ্যের কারাগারের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের কারাগার অনেক সহণীয় ছিল, এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য।

কিছু আগে গান্ধীজি জনৈক ভারতীয় কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। নির্দয় প্রহারের ফলে তিনি আহত এবং মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সুস্থ হ'তে গান্ধীজির দশ এগারো দিন সময় লাগে। তাঁর আগ্রহাতিশয্যের ফলে প্রথম পাশখানি তাঁর জন্যে রেখে বাকী অন্যান্য সবাইকে পাশ দেওয়া হয়।

ট্রান্সভালস্থ ভারতীয়দের উদ্যোগে আন্দোলন পরিচালিত হলেও সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীরাই এই আন্দোলনকে নিজেদের আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আন্দোলনের এই আকস্মিক ছেদে ট্রান্সভালের বাইরেও প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। গান্ধীজি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন, এমনি একটি জনরব নাতালেও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ সময়ে তাঁর পরিবার নাতালের ফিনিক্সেই ছিলেন। গান্ধীজির আহত হবার সংবাদে তাঁরা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েছিলেন। সুতরাং সুস্থ হয়েই গান্ধীজি রাজনীতিক ও পারিবারিক উভয় কারণেই নাতালে গিয়ে পৌছলেন।

নাতালে জনসভার আয়োজন হোলো। গান্ধীজি স্থির করলেন, ভারতীয়দের পক্ষ থেকে ট্রান্সভাল সরকারের সংগে তিনি কি শর্তে সন্ধি করেছেন, এই সভায় তা জানাবেন। তাঁর কোনো কোনো বন্ধু তাঁকে সতর্ক ক'রে দিলেন যে, এখানেও একদল লোক তাঁর কাজে ক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে, তারা তাঁর প্রাণ-নাশের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু এই সতর্ক-বাণী গান্ধীজিকে বিরত করলো না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহীর বাণী* স্মরণ ক'রেই নির্ভয়ে সভামঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন।

* সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যাগ্রহী যিশু বলেন:

"He that loveth his life shall lose it and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal." (John xii. 25)

সভা শুরু হয়েছিল রাত্রি আটটায়। সভার কাজ এবার শেষ হ'য়ে এলো। এমন সময় একজন পাঠান লাঠি হাতে সভামঞ্চে এসে দাঁড়ালো। আলোগুলি নিভে গেলো অকস্মাৎ। চারিদিক থেকে অন্ধকার আর অন্ধকর বাঁধভাঙা বন্যার জলের মতো ছুটে এলো এক নিমিষে। গান্ধীজি বলেন: "আমি বুঝতে পারলাম। সভাপতি শেঠ দাউদ মহম্মদ টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের বোঝাতে লাগলেন। আমাকে যারা বাঁচাতে চান, তাঁরা আমাকে ঘিরে ধরলেন। আত্মরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই আমি করি নি। কিন্তু আক্রমণ হবে ব'লে যাঁরা আশংকা করেছিলেন, তাঁরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের পকেটে ছিল পিস্তল। তিনি ফাঁকা আওয়াজ করলেন। ইতিমধ্যে পার্শী রস্তমজী হাংগামার আভাস পেয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আলেকজান্দারকে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ এসে গেলো। গণ্ডগোলের মাঝ দিয়ে পথ ক'রে পুলিশ আমায় ঘিরে রস্তমজীর বাড়ী পৌছে দিল।"

পরদিন পুনরায় গান্ধীজি পাঠানদের বোঝাতে চাইলেন, কিন্তু গান্ধীজির কথায় তারা কর্ণপাত করলো না। গান্ধীজি ফিনিক্সে ফিরে গেলেন। কিন্তু আক্রমণের আংশকা গেলো না। ফিনিক্সে গান্ধীজিকে তাঁর বন্ধুরা পাহারা দিতে লাগলেন। গান্ধীজি বলেন, "যদিও এই দলের (পাহারায় রত শিষ্য বন্ধুদের) সংগে ডারবানে তামাসা করেছি, আমার সংগে তাঁদের আসতে মানা করেছি, তবু এ দুর্বলতা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, যখন তাঁরা পাহারা দিচ্ছিলেন, তখন আমার মন অধিকতর নির্ভয় ছিল, একথা-ও মনে হয়েছিল, যদি এঁরা সংগে না থাকতেন, তবে কি সত্যই আমি এতোখানি নির্ভয় হতে পারতাম?"

আগে বলেছি, আবার বলছি, অহিংস আন্দোলন কেবল তখনই সম্ভব

যখন মানুষের কতকগুলি নাগরিক অধিকারকে আইনত স্বীকার ক'রে নেওয়া হয় এবং রাষ্ট্র সেই অধিকার রক্ষার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। এই জন্যেই দেখা যায়, সত্যাগ্রহী আন্দোলন কোনো না কোনো শক্তিশালী সরকার শাসিত অঞ্চলেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অহিংস সত্যাগ্রহী গান্ধীজির জীবন রক্ষার জন্যে কি নাতালে, কি ট্রান্সভালে, কি ভারতবর্ষে সর্বত্র পুলিশ ও সরকার বারে বারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, তা লক্ষণীয়। ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে যখন ভারতের শাসনভার এলো, যখন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন ব্যবস্থার সে দৃঢ়তা আর রইলো না, তখনই দিল্লীতে ভারতীয় বুর্জোয়া সরকারদের অসতর্ক অকর্মণ্যতায় সত্যাগ্রহী গান্ধীজির ঘটলো মৃত্যু। নাতালে, ট্রান্সভালে, এমন কি ১৯৪৬ সালের বিক্ষুব্ধ নোয়াখালিতে বৃটিশ সরকার যা পেরেছিল, নেহরু পরিচালিত দেশীয় সরকার দিল্লীতে তা করতে সমর্থ হোলো না। দুর্বল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অহিংস আন্দোলনের যেমন প্রয়োজন নেই, তেমনি তা যে সম্ভব-ও নয়, এ-ও তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

যাই হোক, জেঃ স্মাট্স্ কিন্তু সত্যাগ্রহী ছিলেন না। তাই ভারতীয়রা যখন স্বেচ্ছায় নাম লিখিয়ে পাস নিয়ে গেলো, তখন তিনি এশিয়াটিক আইন তোলা তো দূরের কথা, ভারতীয় দমনের জন্যে নূতন আইনের খসড়া করলেন। সুতরাং পুনরায় আন্দোলনের হোলো প্রয়োজন। গান্ধীজি বোঝালেনঃ শত্রুকে সুযোগ দেওয়াই সত্যাগ্রহীর ধর্ম। "যারা সই দিয়ে টাকা নেয়, তাদের নামেও আদালতে মামলা করতে হয়। তারা মামলার বিরুদ্ধতা করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। অবশেষে ডিক্রি হয়, মাল ক্রোক হয়, অনেকখানি সময় নষ্ট হয়, কিন্তু সেজন্যে কি সতর্কতা অবলম্বন করা যায় বলুন?"

গান্ধীজিঃ জে. স্মাট্স্‌কে পত্র দিয়ে জানালেন যে, স্মাট্স্ অন্যায়ভাবে তাঁর

প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছেন। আলবার্ট কাটরাইট, যিনি মীমাংসার মধ্যস্থতা করেছিলেন, তিনি-ও লজ্জিত হলেন। অবশেষে স্থির হোলো, সরকার যদি তাঁদের প্রতিশ্রুতি মতো এশিয়াটিক আইন রদ না করেন, তবে গৃহীত পাসগুলি পুড়িয়ে ফেলা হবে। কিন্তু সরকার পক্ষ চুপচাপ রইলেন; এশিয়াটিক আইন রদ তো করলেন-ই না, বরং দ্বিতীয় আইনটি-ও পাশ হ'য়ে গেলো। ফলে একদিন সভা ক'রে সমারোহের সংগে ভারতীয়রা তাঁদের গৃহীত পাসগুলি পুড়িয়ে ফেললেন। আবার যুদ্ধ ঘোষিত হোলো।

আইন সভার যে অধিবেশনে দুই নম্বর এশিয়াটিক আইন পাশ হয়, সেই অধিবেশনেই ভারতীয়-দলনের জন্যে জেনারেল স্মাট্স্ আর একটা নূতন আইনের খসড়া পেশ করলেন 'এমিগ্রেসন রেস্ট্রিকসন এ্যাক্ট'। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রবেশ বন্ধ করা। এশিয়াটিক আইনের গণ্ডী এড়িয়ে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার অধিকারে ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে পারতেন, এই আইনের বলে তাঁদের প্রবেশাধিকার লোপ পেলো। সুতরাং গান্ধীজি স্থির করলেন, এই আইনের বিরুদ্ধে-ও সত্যাগ্রহ গৃহীত হবে। এই আইন ভংগের জন্যে প্রয়োজন ছিল এমন একজন লোকের, যিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অথচ পূর্বে ট্রান্সভালে প্রবেশ করেন নি। এই উদ্দেশ্যে সোরাবজী শাপুরজী আড়জনীয়াকেই সত্যাগ্রহ কমিটি যোগ্য সত্যাগ্রহী হিসাবে গ্রহণ করলেন।

ট্রান্সভাল সরকারকে পূর্বাহ্নে নোটিশ দিয়ে সোরাবজী ট্রান্সভালে প্রবেশ করলেন। কিন্তু ট্রান্সভাল সরকার প্রথমে সোরাবজীকে গ্রেফতার করলো না। পরে তাঁর উপর আদালতে হাজির হবার আদেশ এলো। বিচারে সোরাবজীর কোনো শাস্তি হোলো না, তাঁকে কেবল এক সপ্তাহের মধ্যে

ট্রান্সভাল ত্যাগ ক'রে যেতে বলা হোলো। সোরাবজী সে-আদেশ অমান্য করলেন। ফলে তাঁর এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হোলো।

এশিয়াটিক আইন ভংগ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয়রা যে গৃহীত পাসগুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সেজন্যে সরকার কাউকে গ্রেফ্‌তার করলো না। কারণ, প্রথমত, অধিক সংখ্যক কয়েদী রাখার ব্যাপারটা সরকারের পক্ষে ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়রা পাস পুড়িয়ে দিলে-ও সরকারী খাতায় তাদের নাম ছিল। সুতরাং এখন নূতন ভারতীয়ের প্রবেশ রোধ করতে পারলেই সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

পাসগুলি নষ্ট করায় সরকার যখন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করলো না, তখন স্থির হোলো ভারতীয়রা অন্য উপায়ে সরকারকে আক্রমণ করবেন। এবার, দুই রকমের ভারতীয়কে নাতাল থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত স্থির হোলো—পূর্ব থেকে যাঁদের ট্রান্সভালে বসবাসের অধিকার আছে, আর যাঁরা ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারেন।

এই নূতন সত্যাগ্রহীর দল যখন নাতাল থেকে ট্রান্সভাল সীমান্তে পৌঁছলেন, তখন ট্রান্সভাল সরকার প্রস্তুত ছিলেন। সত্যাগ্রহীদের বন্দী করা হোলো। সত্যাগ্রহ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করলো। কেউ বিনা লাইসেন্সে ফেরী ক'রে, কেউ বা বিনা পাসে ট্রান্সভালে প্রবেশ ক'রে ভারতীয়রা দলে দলে গ্রেফ্‌তার হ'তে লাগলেন। জেল উঠলো ভ'রে।

গান্ধীজি-ও আবার গ্রেফ্‌তার হলেন। প্রিটোরিয়া জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হোলো।

জেলে তিলধারণের ঠাঁই রইলো না। সরকার বিপদ গণলো। যাঁদের গ্রেফ্‌তার ক'রে ট্রান্সভালের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসা হোতো, তাঁরা আবার ফিরে ফিরে আসতেন। এবার স্থির হোলো, ভারতীয়দের দলে

দলে গ্রেফ্‌তার ক'রে জাহাজে ভ'রে ভারতবর্ষে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে। বন্দীদের মধ্যে এমন অনেক 'ভারতীয়' ছিলেন, যাঁরা জীবনে কখনো ভারতবর্ষ দেখেন নি, বা ভারতে যাঁদের পরিচিত আত্মীয়স্বজন-ও কেউ নেই। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুক্ত গিরমিটিয়াদের বংশধর। সুতরাং এঁদের পক্ষে ভারতবর্ষে নির্বাসন ছিল অনাহারে, অনাশ্রয়ে প্রাণদণ্ডেরই নামান্তর। ট্রান্সভাল সরকারের এই নৃশংস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে-ও তুমুল আন্দোলন শুরু হোলো। অন্যপক্ষে ট্রান্সভাল সরকারের এই জুলুম সত্যাগ্রহীদের উপর যে কোনো প্রভাব বিস্তার করলো না, এমন নয়। গান্ধীজির স্বীকারোক্তি: "নির্বাসনের দ্বারা সরকারেরই অপমান বাড়ছিল, এ বিষয়ে কতকগুলি মামলায় সরকার হেরেছিলেন। এদিকে ভারতীয়রাও আর ভালো রকম লড়াই দিতে প্রস্তুত ছিল না। আগেকার মতো সত্যাগ্রহীর সংখ্যা-ও বেশি ছিল না। কতক সত্যাগ্রহী ভয় পেয়েছিল, কতক বা হার মেনেছিল।"

এই সময় দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে-ও পরিবর্তন দেখা দিলো। ট্রান্সভাল, নাতাল, কেপ কলোনি ও অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট একত্রিত হ'য়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলো। কিন্তু গান্ধীজি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ধনিকদের অধিকার তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসী হিসাবেই মূলত দাবী করছিলেন। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরে যাওয়াকে ভারতীয়রা সমর্থনের চোখে দেখলেন না। ভারতবর্ষে-ও তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছিল, তা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকে কিছু কিছু দাবী-দাওয়া আদায়ের আন্দোলন। সুতরাং বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরিত হলেন।

এই প্রতিনিধি দলের প্রার্থনা ছিলো বৃটিশ সরকার যদি দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাম্রাজ্য থেকে বাইরে যেতে দেন, তবে তাঁরা যেন ভারতীয়দের জন্যে কোনো সুবন্দোবস্ত ক'রেন। গান্ধীজিই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছিলেন।

বৃটিশ সরকারের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাদের দাবী কতক পরিমাণে পেলো সত্য, কিন্তু ভারতীয়দের অবস্থা রইলো যথাপূর্ব, বরং অপেক্ষাকৃত মন্দ। দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাবার জন্যে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া ভারতীয়দের কোনো গত্যন্তর ছিল না। প্রস্তুতির বিষয় সম্পর্কে গান্ধীজি বলেন: "টাকার জন্যে আমার ভাবনা ছিল। দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাবার উপযুক্ত অর্থ আমার কাছে নেই, এই দুঃখ আমাকে বিষম ব্যথিত করছিল।" কিন্তু টাকা শীঘ্রই এসে পড়লো। সার রতন টাটা পঁচিশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলেন। এই টাকা দিয়ে গান্ধীজি এমন একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করতে চাইলেন, যাতে সেখান থেকে দীর্ঘকাল ধ'রে সত্যাগ্রহ যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়, শত শত অহিংস সত্যাগ্রহী সৈনিকের বাসস্থান ও আহারের অভাব না ঘটে। ফিনিক্সের কৃষিক্ষেত্র ছিল নাতালে। কিন্তু সত্যাগ্রহ চলছিল ট্রান্সভালে। সুতরাং ট্রান্সভালে জোহান্সবার্গের কাছাকাছি কোথাও একটি কৃষিক্ষেত্র স্থাপনের কথা স্থির হোলো। গান্ধীজির বন্ধু তথা শিষ্য মিঃ কলেনবেকের সেখানে তিন হাজার তিন শ বিঘা জমি কেনা ছিল। সেই জমি তিনি সত্যাগ্রহীদের ব্যবহারের জন্যে দিলেন। এই ভাবে জোহান্সবার্গ থেকে একুশ মাইল দূরে নূতন একটি কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠলো, গান্ধীজি তার নাম দিলেন টলস্টয় ফার্ম। টলস্টয় ফার্মকে গান্ধীজির অহিংসা যুদ্ধের কেল্লা বলা যেতে পারে। বহু সত্যাগ্রহী সপরিবারে এখানে এসে আশ্রয় নিলেন। বছরের পর বছর ধ'রে এখান থেকে অহিংস

যুদ্ধের রসদ-সরবরাহ এবং আক্রমণ চলতে লাগলো। এ বিষয়ে গান্ধীয় যুদ্ধের প্রথম কেল্লা ফিনিক্স-ও অবশ্য উল্লেখযোগ্য।

১৯১১ খৃস্টাব্দে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় এলেন। ইতিপূর্বে তিনি ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের পক্ষ নিয়ে বহু আলোচনা আন্দোলন করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সংগে-ও তাঁর আলাপ-আলোচনা হোলো। আলাপ-আলোচনার ফল সম্পর্কে তিনি গান্ধীজিকে বলেন, "সব মীমাংসা হয়ে গেছে। এশিয়াটিক আইন রদ হবে। এমিগ্রেসন আইন থেকে শাদা-কালোর বিচার উঠে যাবে। তিন পাউণ্ড কর-ও দিতে হবে না।"

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এবারে-ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করলেন। ফলে তিন পাউণ্ড কর রহিতের দাবীকে-ও সত্যাগ্রহের অংগীভূত করা হোলো।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার-ও ওদিকে ক্ষান্ত ছিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা যাতে বংশানুক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ধনসম্পত্তি ভোগ করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতীয়দের বিবাহকেও অবৈধ ঘোষণা করলো। এই ভাবে তিন পাউণ্ড কর এবং বিবাহের বৈধতার প্রশ্ন ভারতীয় আন্দোলনকে এমন একটি ব্যাপক রূপ দিলো, যার ফলে ভারতীয় সর্বসাধারণও সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলো।

গান্ধীজি এবার তাঁর রণক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। ইতিপূর্বে নাতাল থেকে সত্যাগ্রহীরা ট্রান্সভালে প্রবেশ ক'রে এমিগ্রেশন আইন ভংগ করছিল। তখন যুদ্ধ ছিল কেবল ট্রান্সভাল সরকারের বিরুদ্ধে। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউনিয়ন গঠিত হওয়ায় সে যুদ্ধের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেলো।

ফলে এমিগ্রেশন আইন ভংগের জন্যে ট্রান্সভাল থেকে-ও সত্যাগ্রহীরা নাতালের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। প্রথম সত্যাগ্রহী দলটি কয়েক জন মহিলাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। গান্ধীজি এঁদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এঁরা প্রথমে সীমান্ত অতিক্রম ক'রে নাতালে প্রবেশ করবেন। নাতালে সম্ভবত পুলিশ ওঁদের গ্রেফ্‌তার করবে। যদি না করে, তবে ওঁরা সটান নিউক্যাশ্‌লে কয়লার খনি অঞ্চলে চলে যাবেন এবং সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্যে শ্রমিকদের উত্তেজিত করবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এইটি হোলো স্বর্ণ মুহূর্ত। সত্যাগ্রহী মহিলারা নাতাল সীমান্তে গ্রেফ্‌তার হলেন না, তাঁরা সটান চ'লে গেলেন নিউক্যাশ্‌লে, খনি-অঞ্চলে। সমগ্র খনিতে বিদ্যুৎ-গতিতে সত্যাগ্রহ ছড়িয়ে পড়লো। হাজারে হাজারে ভারতীয় শ্রমিক ঘোষণা করলেন হরতাল।* ধর্মঘটী শ্রমিকের স্রোত অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে উঠলো।

গান্ধীজি-ও অবিলম্বে নিউক্যাশ্‌লে উপস্থিত হলেন। মনে হোলো, গান্ধীজি যেন নিজের অজ্ঞাতে অকস্মাৎ এক বিপুল শক্তিশালী অস্ত্রাগারের সন্ধান পেয়েছেন। মহিলা সত্যাগ্রহীরা গ্রেফ্‌তার হলেন। তাঁদের শৌর্য ও সহিষ্ণুতার কাহিনী ভারতে-ও আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

---

* এই সত্যাগ্রহ সম্পর্কে রেভারেণ্ড হোম্‌স্ বলেন:

"It was in essence, I suppose, a strike—a withdrawal of the Indians from labour in the towns and villages, and a paralysis, therefore of the industrial and social life of the Republic."

সত্যাগ্রহের আত্মিক শক্তি সম্পর্কে গান্ধীজি যাই বলুন, তার সত্যিকারের শক্তি যে শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যেই নিহিত ছিল, তা রেভারেণ্ড হোম্‌সের মতো গান্ধীবাদীও স্বীকার করেন।

এখন দেখা দিলো এক নূতন সমস্যা। এই সহস্র সহস্র কর্মত্যাগী শ্রমিককে কেমন ক'রে আহার ও আশ্রয় দেওয়া যায়, গান্ধীজি তা-ই ভাবতে লাগলেন। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সাহায্য করবেন সত্য, কিন্তু তাতে ক দিন চলবে? গান্ধীজি স্থির করলেন, এই বিপুল জনতাকে নিয়ে তিনি ট্রান্সভালে প্রবেশ করবেন, তাতে একদিকে সরকারের এমিগ্রেশন আইন যেমন চূড়ান্তভবে ভংগ করা হবে, তেমনি অন্যদিকে সরকার যদি শ্রমিকদের গ্রেফ্‌তার করে, তবে জেলেই তাদের আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা হ'তে পারবে। গান্ধীজি আগাগোড়া বাক্যত force of number-এ অবিশ্বাসী হ'লে-ও, গোড়ার দিকে কার্য্যত যে বিশ্বাসী ছিলেন, তার প্রমাণ এখানে-ও মিলে। এই সময়ের বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেন: "অনেক লোক এক সংগে গেলে যে-কাজ হয়, অল্প অল্প লোক গেলে সে-কাজ হয়-ও না।"

সত্যাগ্রহ শিবিরে ঐ সময় প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক সমবেত হয়েছিল। ওখান থেকে ট্রান্সভালের সীমান্ত ছিল ছত্রিশ মাইল। এই দীর্ঘ পথ দুই দিনে পায়ে হেঁটে যাবার সিদ্ধান্ত হোলো। ইতিমধ্যে খনির মালিকদের সংগে গান্ধীজির কিছু আলাপ-আলোচনা-ও হোলো। কিন্তু তাতে কোনো ফল হোলো না।

অতঃপর শুরু হোলো আইন অমান্যের এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। সহস্র সহস্র আবালবৃদ্ধ শ্রমিকের পুরোভাগে চলেছেন অহিংস যুদ্ধের সেনানায়ক গান্ধীজি। অপূর্ব সে দৃশ্য! পরবর্তীকালে গুটি কয়েক গান্ধী-বাদীর পুরোভাগে তিনি যে ডাণ্ডী অভিযান করেছিলেন, সে দৃশ্যকে এর পাশে কী বিবর্ণ-ই না লাগে! নাতালের শ্রমিক শোভাযাত্রার এই দৃশ্যকে বাইবেলে বর্ণিত Exodus-এর সংগে তুলনা করা চলে। লাঞ্ছিত,

বঞ্চিত এস্রায়েল-বংশীয়রা চলেছেন দলে দলে······পৃথিবীতে তাঁদের বাঁচবার মতো একটুকু ঠাঁই খুঁজে নিতে। তাঁদের পুরোভাগে চলেছেন এস্রায়েলদের জাতীয় নেতা মহর্ষি মোজেজ, বক্ষে তাঁর দৃপ্ত বল, কণ্ঠে 'ভগবান' জেহোভার আশীর্বাণী। কিন্তু মহর্ষি মোজেজ-এর সংগে আমাদের মহর্ষি গান্ধীর কতোই না প্রভেদ! আজ যদি কোনো দৈব-দুর্বিপাক ঘটে, রক্তের লোহিত সমুদ্রে শত্রুর দল ভেসে যায়, তবে তিনি মোজেজ-এর মতো উৎফুল্ল হবেন না, তাঁর প্রবলতম শত্রুটিকে-ও বাঁচাবার জন্যে তিনি সেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বেন, প্রয়োজন হ'লে রক্ত সমুদ্রে ভেসে যাবেন।

শোভাযাত্রীর দল অগ্রসর হ'তে লাগলো। পথে গান্ধীজি পর পর দুবার গ্রেফ্‌তার হলেন এবং জামিনে খালাস পেলেন। সরকার চাচ্ছিল, গান্ধীজির অবর্তমানে শোভাযাত্রীর দল অসংযত উচ্ছৃংখল হ'য়ে পড়ুক, তখন তাদের উপর অত্যাচারের সুযোগ মিলবে। কিন্তু সে-সুযোগ মিললো না। হাজার হাজার শ্রমিক শান্তভাবে অগ্রসর হ'লে লাগলো।

আবার গ্রেফ্‌তার হলেন গান্ধীজি। এবার মিঃ পোলক শোভাযাত্রীদের নিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। হেডলবার্গে শ্রমিকদের গ্রেফ্‌তারের জন্যে দুখানা ট্রেণ অপেক্ষা করছিল। শ্রমিকদের গ্রেফ্‌তার শুরু হোলো।

অবশেষে মিঃ পোলক, মিঃ কলেনবেক এবং মিঃ ওয়েস্ট, একে একে সবাই গ্রেফ্‌তার হলেন। বিচারে গান্ধীজির হোলো ন মাসের কারাদণ্ড। কিন্তু গান্ধীজির অনুপস্থিতিতে-ও আন্দোলন থামলো না। গান্ধীজি বলেন: "সরকারের সমস্ত ব্যবস্থাই বিফল হোলো। সারা আকাশ যদি ভেঙে পড়ে, তাবে আর তাতে জোড়া-তাড়া দেওয়ার ঠাঁই থাকে কই? নাতালের ভারতীয় গিরমিটিয়ারা সবাই জেগে উঠেছিল। তাদের প্রতিরোধ করে, এমন সাধ্য কার?"

পরবর্তীকালে শ্রমিক ও জনসাধারণের এই প্রচণ্ড শক্তির প্রতি কী ঘোর অবিশ্বাসই না তাঁর জন্মেছিল! ভারতীয় কৃষাণ ও শ্রমিকরা যখন আর বুর্জোয়াদের জন্যে লড়তে চাইলো না, তারা নিজে সংগঠিত হয়ে নিজেদের লড়াই লড়তে প্রস্তুত হোলো, তখন তিনি তাদের এড়িয়ে চললেন, তাঁর যুদ্ধের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণতর হোলো,—এক হাস্যকর পরিণতি লাভ করলো ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মধ্যে।

কিন্তু সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রান্তরে হাজার হাজার শ্রমিক মূলত ধনিকদের লড়াই-ই লড়ছিল। তাই শ্রমিকদের শক্তিতে গান্ধীজির ছিল কী অবিচল বিশ্বাস, কী নির্ভয় নির্ভর!

যাই হোক, শ্রমিকদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু হোলো। বন্দী শ্রমিকদের বিচারে হয়েছিল সশ্রম কারাদণ্ড। কিন্তু তাদের কারাগারে পাঠানো হোলো না, বন্দী হিসাবে পরিশ্রমের জন্যে পাঠানো হোলো খনিতে। তারা যেন সেই মধ্যযুগের 'গ্যালি স্লেভ'! কেবল তারা বন্দী নয়, ক্রীতদাস! শ্রমিকদের উপর এই নির্যাতনের ফল কিন্তু ভালো হোলো না। অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা ছিল না, সেখানে-ও সংঘবদ্ধভাবে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটলো। এবার আতংকগ্রস্ত সরকার বন্দুক ব্যবহার করতে লাগলো।

ভারতীয় শ্রমিকের উপর এইভাবে দীর্ঘকাল একটানা অত্যাচার কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, ইউরোপীয় শ্রমিক-দের মধ্যে-ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। তাই ভারতীয়দের সংগে আপোষ-মীমাংসার সংকেত হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করতে চাইলেন। এই কমিশনকে ভারতীয়রা প্রথমে বর্জন করলে-ও

পরে তাঁরা তাকে স্বীকার ক'রে নিলেন। আসলে, শ্বেত শ্রমিকদের জাগরণ ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে-ও খুব প্রীতিপ্রদ ছিল না।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় রেল ধর্মঘট শুরু হয়েছিল। এই ধর্মঘট সম্পর্কে গান্ধীজি বলেন: "এই ধর্মঘট এমন ভীষণ হয়েছিল যে, ইউনিয়ন সরকারকে দেশে সামরিক আইন জারী করতে হ'য়েছিল। রেল কর্মচারীরা যে কেবল বেতন-বৃদ্ধি চাচ্ছিলেন, তা নয়, রাজ্যের উপর সর্বময় প্রভুত্বের অধিকার-ও তাঁরা চেয়েছিলেন।" সরকারের উপর এই রেল ধর্মঘটের প্রভাব কী পরিমাণ হয়েছিল, সে বর্ণনা-ও গান্ধীজি করেন: "আমি যখন সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যাত্রা স্থরু করেছিলাম, তখন তাঁর (জেনারেল স্মাটসের) যে-দম্ভ দেখেছিলাম, আজ আর তা নেই।"

সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ শ্রমিকদের মধ্যে ভেদ-সাধনের জন্যে ত্বরিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভারতীয় সত্যাগ্রহী শ্রমিকদের সংগে যে কোনো সর্তে সন্ধি করতে চাইলেন। তিন পাউণ্ড কর রহিত হোলো; ভারতীয় বিবাহ একপত্নীক হ'লে বৈধ হিসাবে গণ্য হোলো; পাস সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ-ও অনেক পরিমাণে হোলো শিথিল। এমনি ভাবে আপাত-দৃষ্টিতে অহিংস সত্যাগ্রহের জয় হলে-ও বস্তুত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এক মর্মান্তিক বিভেদের মূল্যেই সেদিন গান্ধীজির নেতৃত্বে ভারতীয় ধনিকরা তাদের প্রাপ্য লাভ করলো—যে মূল্যের কঠিন ঋণ শোধ তারা আজো দক্ষিণ আফ্রিকায় করছে। অর্থাৎ, খনি ও রেল শ্রমিকদের যুগ্ম জাগরণ না ঘটলে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ যে বিন্দুমাত্র সফল হোতো না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সেদিন আফ্রিকাস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণ বুর্জোয়াদের মধ্যে যে দ্রুত মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল, তা সত্যাগ্রহের বিজয়ী শক্তির ফলে হয় নি, হয়েছিল স্থানীয় শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের আতংকে। কিন্তু সত্য-সন্ধানী

হওয়া সত্ত্বে-ও এই সহজ সত্য গান্ধীজির চোখ এড়িয়ে গেলো। তিনি অবিলম্বে বিজয় উল্লাসে বিলাতের পথে ভারতে রওনা হলেন। ভাবলেন, তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ-ই তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্থযোগ-স্থবিধা লাভের সংগ্রামে সাফল্য দিয়েছে।

এগারো

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই গান্ধীজি ভারতীয় রাজনীতিতে পদার্পণ করলেন। সুতরাং ঐ সময় ভারতের রাজনীতিক অবস্থা কি ছিল, বা তার ইতিহাসের ধারার স্বরূপটা কী, তা আমাদের জানা প্রয়োজন। নইলে সেখানে গান্ধীজির ভূমিকাটিকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা সম্ভব হবে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ভাঙন দেখা গেলো। কয়েক শতাব্দী পূর্বেকার ইউরোপের মতোই এবার ভারতবর্ষেও ধীরে ধীরে একটি নাগরিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার বা বুর্জোয়া সমাজের অংকুরোদ্গম হোলো।* ফলে, ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীব্যাপী সুকঠিন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের খোসাতে ফাটল দেখা গেলো। সামাজিক বনিয়াদে এই অর্থনীতিক ফাটলের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের আকাশস্পর্শী শাসন সৌধটা যেমন পড়লো ভেঙে, তেমনি ভারতব্যাপী সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুরু হোলো ঠোকাঠুকি, গুঁতো-গুঁতি—দেশময় আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় গোলযোগ, আত্মকলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব। ঐ সময়কার ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থাকে ইংলণ্ডের Wars of

---

* মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় ভারতীয় নাগরিক জীবন যথেষ্ট উন্নত হ'য়ে উঠেছিল, ইউরোপে বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পূর্বে যেমনটি দেখা যায়। লর্ড ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে বাংলার মুর্শিদাবাদ শহরের বর্ণনা করেন: "As extensive, populous and rich as the city of London."

Roses বা জার্মানীর ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের সংগে অনেক দিক থেকে তুলনা করা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে যখন এমনিভাবে একটি দেশীয় বুর্জোয়া সমাজ স্বাভাবিক ভাবে গ'ড়ে উঠতে চলেছে, সেই সময়ে ভারতে অপেক্ষাকৃত পরিণত ইউরোপীয়,—পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরেজ বুর্জোয়াদের ঘটলো প্রবেশ। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ভাঙন ধরার ফলে ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানেরই ছিল কথা। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র অর্থনীতিক পরিণতি সমান না হওয়ায়, এবং ইউরোপে পুঁজির জন্ম ভারতীয় পুঁজির কয়েক শতাব্দী আগে হওয়ায়, ভগ্নপ্রায় ভারতীয় সামন্ত-তান্ত্রিক অবয়বের ছিদ্রপথে ভারতীয় নবজাত বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের স্থলে ইউরোপীয় বুর্জোয়ারাই মাথা তুলে দাঁড়ালো। এমনিভাবে ভারতবর্ষে ভারতীয় বুর্জোয়াদের স্বাভাবিক অভ্যুত্থান সম্ভব হোলো না। ভারতবর্ষে যে সমস্ত ইউরোপীয় বুর্জোয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক পরিণতির দিক থেকে বৃটেনই ছিল সর্বাগ্রগণ্য। সুতরাং ভারতীয় শিশু বুর্জোয়ার স্থান বৃটেনের তরুণ বুর্জোয়ারাই অধিকার ক'রে বসলো এবং ভারতীয় দেশীয় শিশু বুর্জোয়া সমাজের তারা করলো কণ্ঠরোধ ও হত্যা। আরো প্রায় শতাব্দীকাল বাদে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই ঔরসে ভারতে গ'ড়ে উঠলো এক নবতরো জারজ বুর্জোয়া সমাজ—যার নিবীর্য জড়ত্ব আমাদের চমকে দেয়, উদ্বিগ্ন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বৃটিশরা বাংলাদেশ অধিকার করলো, এবং পত্তন করলো সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন সর্বপ্রথম ভারতে এসেছিল, তখন তারা মূলত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই এসেছিল, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনাও

তারা করে নি। বৃটেনে উৎপন্ন মালের বাজার হিসাবেও সেদিন তারা ভারতবর্ষে আসে নি, তারা ভারতবর্ষে এসেছিল ভারতীয় মালের জন্যে, যে-মাল তারা ভারতে সস্তায় কিনে ইউরোপের বাজারে চড়া দামে বিক্রয় করতে পারবে। এবং এমনি ভাবেই একটা মোটা মুনাফা তাদের কুক্ষিগত হবে। তাই আমরা দেখি, প্রথম যুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল ভারতীয় শিল্পের অধঃপতন নয়—ভারতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পকে স্বল্পদামে বা বিনা দানে কেনা। কিন্তু ভারতবর্ষের সংগে বাণিজ্য করতে গিয়ে গোড়া থেকে একটা অসুবিধা বৃটিশ বণিকরা লক্ষ্য করতে লাগলো। ভারতবর্ষ থেকে মাল নিতে হ'লে তার মূল্য হিসাবে বিনিময়ে ভারতবর্ষকে কিছু বৃটিশ মাল দেওয়াও দরকার। কিন্তু ঐ সময়ে ভারতবর্ষের উৎপাদন-শিল্পের অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে এসেছিল, যাতে বলা চলত, যা নেই ভারতে, তা নেই পৃথিবীতে। সুতরাং ভারতবর্ষকে কোনো বৃটিশ পণ্য দিয়ে তার বিনিময়ে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করার উপায় ছিল না বৃটেনের। কাজেই রজত মূল্য ছাড়া ভারতীয় মাল পাওয়ার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং ঐ সময় বৃটেন থেকে বৎসরে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের মতো সোনা, রূপা এবং অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা বাইরে রফ্‌তানি করার মতো অনুমতি পেয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কিন্তু বণিক পুঁজিপতিদের পক্ষে ঘর থেকে বাইরে সোনা রূপা চালান দেওয়ার মতন মর্মান্তিক ঘটনা আর কিছুই ছিল না। কারণ, তাদের ধারণা ছিল দেশের সত্যিকারের সমৃদ্ধি হোলো তার সঞ্চিত, রাশীকৃত ধাতব সম্পদ। সুতরাং প্রতি বৎসর যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য ভারতবর্ষে রফ্‌তানি হ'য়ে যায়, এটা তাদের কাছে ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠলো। কেবলই তারা মতলব ভাঁজতে লাগলো, কেমন ক'রে ভারতীয় মাল কেনা যাবে, অথচ তার বিনিময়ে

রজত-মূল্য দিতে হবে না। প্রথমের দিকে তারা ইংল্যাণ্ড থেকে ধাতব মুদ্রা রফ্‌তানি বন্ধ ক'রে আমেরিকা এবং আফ্রিকার উপনিবেশগুলিতে নির্মমভাবে লুণ্ঠন চালিয়ে ক্রীতদাস বিক্রয় ক'রে যা পেতো, তা দিয়েই ভারতীয় মালের দাম দিতো। ঠিক এই সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিক রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থায় প্রচণ্ড ভাঙন দেখা দিলো, ইংরেজ তার সুযোগ গ্রহণ করলো পরিপূর্ণ ভাবে। ভারতে স্থাপন করলো সাম্রাজ্য। জল-দস্যুতা ছিল ইউরোপীয় বাণিজ্যের অংশ বিশেষ। এবার তারা ভারতের স্থলভাগে নেমে স্থলদস্যুতা শুরু করলো। বাণিজ্যের নামে চললো লুণ্ঠন, রজত মূল্যের বড়ো একটা প্রশ্নই আর রইলো না। বৃটিশ পুঁজিপতিরা লাভ করলো তাদের স্বপ্ন-স্বর্গ।

এই ভাবে ভারতের এই লুণ্ঠিত সম্পদ গিয়ে সঞ্চিত হ'তে লাগলো ইংলণ্ডে এবং এই সঞ্চিত সম্পদের জোরেই ইংলণ্ডের বণিক পুঁজিতন্ত্র রূপান্তরিত হোলো শিল্প-পুঁজিতন্ত্রে। ভারতীয় সম্পদের স্রোত যতো প্রবলভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পক্ষেত্রে প্রবাহিত হ'তে লাগলো, ততই সেখানে দ্রুত গ'ড়ে উঠলো কল-কারখানা, ঘটলো শিল্পবিপ্লব বা Industrial Revolution. উদীয়মান বৃটিশ শিল্প-পুঁজির প্রতিফলন ঘটলো বৃটিশ বিজ্ঞানে-ও। ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে হারগ্রীভ্‌স্ সাহেব আবিষ্কার করলেন স্পিনিং জেনী; ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে আর্করাইট সাহেব আবিষ্কার করলেন 'ওঅটার ফ্রেম'; ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে এলো তাঁর তূলো ধুনবার, সূতা কাটার কল; ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে এলো তাঁর যন্ত্র চালিত তাঁত। সর্বোপরি ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে ব্লাস্ট ফারনেসের সংগে বাষ্প চালিত যন্ত্রের ঘটলো সংযোগ। এইভাবে ইংল্যাণ্ডের শিল্পসম্ভাবনা এক বিপুল শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করলো। ভারতের লুণ্ঠিত সম্পদের উপর ভিত্তি ক'রেই ইংলণ্ডে ঘটলো শিল্প-বিপ্লব। অর্থাৎ ভারতের লক্ষ লক্ষ রক্তাক্ত

হৃৎপিণ্ড নিজের অজ্ঞাতে, অনিচ্ছাতে, পৃথিবীর শিল্পসভ্যতাকে এক অভিনব পরিণতির পথে এগিয়ে দিলো। মার্ক্‌স বলেছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে তাদের অজ্ঞাতে ইতিহাসের হাতিয়ার রূপে কাজ করেছে ; কারণ, তারা নিজেদের অনিচ্ছা সত্বেও এক বুর্জোয়া সমাজের জন্ম দিতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপ ভাবেই বলা চলে, ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের ফলে কোটি কোটি লুণ্ঠিত শোষিত ভারতবাসী তাদের অজ্ঞাতে অনিচ্ছায় পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া সমাজকে এক চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে, যে-পরিণতির মধ্যেই রয়েছে পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া ব্যবস্থার মৃত্যু।

ইংল্যাণ্ডের কল কারখানা ও শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সংগে দেখা দিল নূতনতর সমস্যা, প্রয়োজন হোলো উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে সুবিস্তৃত বাজারের। ফলে, বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা চাইলো ভারতবর্ষকে বৃটিশ-মাল বিক্রয়ের বাজার রূপে ব্যবহার করতে। ভারতে শুরু হোলো বৃটিশ শোষণের এক নূতনতর অধ্যায়। এ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বনিক-পুঁজিপতিরা প্রধানত ভারতীয় বয়নজাত দ্রব্যকে দেশময় নাম মাত্র মূল্যে লুণ্ঠন ক'রে চালান দিতো ইউরোপে এবং এইভাবে প্রচুর মুনাফা লুঠতো। কিন্তু এবার ইংলণ্ডের শিল্পপুঁজিপতিরা চাইলো ঠিক তার বিপরীত —ইংল্যাণ্ডের বয়নজাত দ্রব্যকে ভারতে রফ্‌তানি ক'রে সেখানে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করতে। ফলে, বৃটিশ বণিক-পুঁজিপতিদের সংগে বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিদের ঘটলো বিরোধ। বৃটেনের শিল্প-পুঁজিপতিরা বণিক-পুঁজিপতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত ক'রে সেখানে তাদের নিজেদের অবাধ আধিপত্য বিস্তার করেতে চাইলো। এখানেও নবতর বুর্জোয়া শোষকরা আবার পুরাতন প্রথা অনুসারে

তুললো মানবিকতার ধূয়া। ইংল্যাণ্ডে এদের প্রতিনিধি ও প্রচারকরা তীব্র ভাষায় করতে লাগলো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমালোচনা, নিন্দা। অভ্যুত্থান ঘটলো অ্যাডাম স্মিথ, ফক্স, পিট, বার্ক, শেরিডান, ম্যাকলে প্রভৃতির মহাজনদের। বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে শুরু করলো প্রচার। ধূয়া তুললো ফ্রী ট্রেড বা প্রতিযোগিতাশীল ব্যবসায়ের। সাধারণত, ১৮৫৮ খৃস্টাব্দকেই ভারতীয় ইতিহাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকার লোপের সাল ব'লে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে তাদের একচেটিয়া অধিকার ক্রমেই লোপ পেতে থাকে। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গভর্ণর জেনারেল হিসাবে ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। তিনি বৃটিশ শিল্প পুঁজিপতিদের নয়া শোষণ ব্যবস্থার প্রবর্তক রূপেই ভারতে আসেন। এখন থেকে বৃটিশ শোষণের রূপটা এমন হ'য়ে ওঠে যে, যাকে শাণিত ছুরিকার সংগে তুলনা করা চলে। গৃধ্নুতায় নৃশংস, অথচ দীপ্তিতে দৃপ্ত, উজ্জ্বল। এই হোলো খাঁটি বুর্জোয়া কালচার। ঐ যুগের বুর্জোয়া কালচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন এডমাণ্ড বার্ক। ভারত-হিতৈষণার জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরাও তাঁর স্তুতি করেন। (বস্তুত পক্ষে, বর্তমান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপই হোলো এই!) গান্ধীজি তো তাঁর ছাত্রাবস্থায় বক্তৃতার পাঠাভ্যাস শুরু করেছিলেন পিটের বক্তৃতা দিয়েই।

এখন বৃটিশ শিল্প-পুঁজিপতিরা ভারতবর্ষকে যে ভাবে শোষণ করতে চাইলো, তা কার্যকরী করার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ভারতবর্ষের নাগরিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া, এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করা; এবং এই ভারতময় কৃষিক্ষেত্রে-ও যাতে শোষণ কার্যটি

বিনা গোলযোগে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়, তার জন্যে জমিদারী-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভারতবর্ষে বৃটিশ শোষণ ব্যবস্থার ঘাঁটি রূপে বহু জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করলেন। শাসনের সুব্যবস্থার নামে ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠতে লাগলো এক বিরাট শোষণ-যন্ত্র। মুসলমানদের হাত থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ইংরাজদের হাতে যাওয়ায় ঐ সময় মুসলমানরা বৃটিশের প্রতি বিন্দু মাত্র সদয় ছিলেন না। বৃটিশরাও ঐ অবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সমীচীন ভাবলো না। ফলে, দেশময় যে সব জমিদারী গঠিত হোলো, সে গুলির অধিকাংশেরই অধিকারী হলেন হিন্দুরা। অবশ্য কোন কোন মুসলমান যে ইংরেজের প্রসাদ-দাক্ষিণ্য লাভ করলেন না, এমনো নয়। আজ ভারতীয় হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনগ্রসরতার উল্লেখ ক'রে যে গর্ব অনুভব করেন, তার পশ্চাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে এই অবাধ সহযোগিতাই যে রয়েছে, সে কথা আমাদের ভুললে চলবে না। যাই হোক, নয়া শোষণ ব্যবস্থা অনুসারে ইংলণ্ড থেকে কলে তৈয়ারী কাপড় আসতে লাগলো, আসতে লাগলো কলে কাটা সুতো। কাটুনি আর তাঁতিদের উঠলো অন্ন। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে ভারতে যে সূতা এলো, তার পরিমাণ পূর্বেকার চেয়ে ৫,২০০ গুণ বেশী।

ফলে ভারতের নাগরিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার ঘটলো অপমৃত্যু। মানুষ দলে দলে শহর ছেড়ে চললো গ্রামে। গ্রাম ভ'রে উঠলো, উপছে পড়লো মানুষের স্রোত। কিন্তু এতো মানুষের ঠাঁই হোলো না কৃষিতে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এরই নাম দিলো overpopulation. ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনকে পুনরায় গ'ড়ে তুলে গ্রামাঞ্চলের কৃষি থেকে তারা

অতিরিক্ত মানুষের চাপ দূর করতে চাইলো না। ভারতের নাগরিক সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে তাকে কেবল দিগন্তবিসারী কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে না পারলে বাণিজ্যের নামে তাদের ভারতব্যাপী শোষণ-ব্যবস্থাকে তারা চালু রাখে কেমন ক'রে? তাই 'মানবহিতৈষী' বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে যেমন একদিকে গাইতে লাগলো গ্রাম্যজীবনের মহিমা, তেমনি অন্যদিকে ভারতের দুঃখদারিদ্র্যের জন্যে দায়ী করলো ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার হিসাবে ম্যালথাস সাহেব-ও তাঁর overpopulation-এর সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনীতিক তত্ত্ব নিয়ে ভারতে এসে উপস্থিত হ'লেন। সুষ্ঠুভাবে শোষণের জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তাই তারা একদিকে যেমন ভারতবর্ষে করদ মিত্র সামন্ত রাজাদের জীইয়ে রাখছিল, তেমনি অন্যদিকে ভারতবর্ষে আমদানী করেছিল জমিদারি প্রথা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবের ফলে যখন ইউরোপে বুর্জোয়া অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ হয়েছিল, তখন বুর্জোয়া প্রতিরোধে যে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিক তত্ত্বের উদ্ভব হ'য়েছিল, তার পুরোভাগে ছিলেন পাদরী ম্যালথাস। সুতরাং, ভারতে স্থানীয় বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের প্রতিরোধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন দেশময় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখতে চাইলো, তখন তারা অমোঘ তত্ত্বরূপে ভারতবর্ষে আমদানি করলো ম্যালথাসের বাণীকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সকল প্রকার চেষ্টা সত্ত্বে-ও কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে ভারতে স্থানীয় বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুত্থানকে সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব হোলো না। ভারতে বুর্জোয়াদের জন্ম হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সহযোগিতার মধ্য দিয়ে—তাদের শিক্ষায়, দীক্ষায়, সংস্কৃতিতে পুষ্ট হ'য়ে। ফলে ভারতীয়

বুর্জোয়ারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সামন্ততান্ত্রিক প্রচারগুলিকে উদরস্থ করলো, তারা-ও আওড়াতে লাগলো সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক তত্ত্ব, গ্রাম্যজীবনে প্রত্যাবর্তনের কথা, জনসাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যের মূলকারণ হিসাবে গ্রহণ করলো ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে। গান্ধীজির মধ্যে এই সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক প্রচার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আশ্রয় লাভ ক'রেছিল। তিনি একদিকে যেমন গ্রাম্যজীবনের মহিমায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভারতের অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রতিরোধক রূপে প্রচার করতে চেয়েছিলেন ব্রহ্মচর্যের। সাম্রাজ্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির আফিম-খাওয়া ভারতীয় বুর্জোয়ারা তাই কেবলই ঝিমিয়েছে, তাদের মধ্য বিপ্লবী সংগ্রামী শক্তির প্রচণ্ড প্রকাশ কখনো ঘটেনি। তারা প্রতি দিনই সাম্রাজ্যবাদীদের দেওয়া সামন্ততান্ত্রিক অবয়বের মধ্যে কায়ক্লেশে পুষ্ট হ'তে চেয়েছে, চাইছে। তাই গান্ধীজির জীবন-দর্শন, যা মূলত সাম্রাজ্যবাদী প্রচার—শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে গ'ড়ে উঠেছিল, তা ভারতবর্ষকে কলকারখানার পথ ত্যাগ ক'রে হস্তশিল্প এবং কৃষিকার্যের পথে অগ্রসর হ'তে উপদেশ দিয়েছে। তাই গান্ধীজির এই প্রচার বৃটিশেরই সহায়ক হয়েছে, কারণ এই প্রচারের অর্থ হোলো, ভারতকে বৃটিশের বাজাররূপে রক্ষা করা।

ভারতীয় জনসাধারণ শিল্পজীবন ত্যাগ ক'রে সকলে কৃষির উপর নির্ভরশীল হওয়ায়, ভারতে বারে বারে এলো দুর্ভিক্ষ, মহামারী। পংগপালের মতো মরলো মানুষ। কিন্তু ম্যালথাসের থিওরি আর মরে না। দেশের অন্নাভাব যেমন কেবলই বাড়তে লাগলো, তেমনি ম্যালথাসের মহত্ত্ব-ও কেবলি দৃঢ়তর হোলো। ভারতবর্ষকে কৃষি কলোনি হিসাবে ব্যবহার করার জন্যে ইংরেজরা নিজেরা-ও ভারতবর্ষে এসে চাষ-আবাদে

মন দিলো। এদের মধ্যে চা-কর এবং নীলকরদের কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাদের নৃশংস অত্যাচার মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক গাঢ় কৃষ্ণ অধ্যায়।

ভারতবর্ষে তথাকথিত বৃটিশ ব্যবসায় চালু রাখার জন্যে বৃটিশরা ভারতীয়দের মধ্য থেকেই তাদের তাঁবেদার খুঁজে বার করতে লাগলো। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ভারতীয় মুসলমানরা ইংরেজদের সম্পূর্ণ বয়কট করতে চেয়েছিল। ভারতবর্ষের রাজত্ব যে তাদেরই ছিল এবং বৃটিশরা তা ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদেরই কাছ থেকে, এমনি একটা ধারণা তাদের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল ছিল। তাই ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন জেহাদ চালিয়ে যেতে লাগলো, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলো সারা উত্তর ভারতব্যাপী ওয়াহাবি আন্দোলন এবং সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে। এই আন্দোলন বা বিদ্রোহের মধ্যে পুরাতন জীর্ণ বিগত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপক চেষ্টা চলেছিল। সুতরাং, এগুলি বৃটিশ-বিরোধী হ'লে-ও আসলে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল।

এখানে লক্ষণীয় যে, যে-খৃস্টান ধর্মের শাখা রূপে একদা মহম্মদ তাঁর ইসলাম গ'ড়ে তুলেছিলেন, সেই খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধেই ধর্মের নামে ভারতীয় মুসলমানরা ঐ সময়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেলেন। ইউরোপের মুসলমানদের সংগ খৃস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের মূলে যেমন অর্থনীতিক স্বার্থ বর্তমান ছিল, ভারতবর্ষে-ও ছিল তেমনিটি। কেবল মুসলমানদের বেলাতেই নয়, অনুরূপ ধর্মযুদ্ধ বা ধর্মমৈত্রীর মূলে সর্বদা অর্থনীতিক কারণই থাকে। হিন্দুদের বেলাতে-ও যে তার ব্যতিক্রম হয় নি, আমরা তা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো।

ভারতীয় হিন্দুরা প্রধানত মুসলমান শাসনে দীর্ঘকাল থাকায় বৃটিশ

বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে তারা অনেকখানি সানন্দেই গ্রহণ করলো। এ ব্যাপারটা তাদের কাছে সাময়িকভাবে প্রভু পরিবর্তনের মতো মুখরোচক হ'য়ে উঠলো। এইভাবেই অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একদল ভারতীয় হিন্দু বৃটিশের সংগে সহযোগিতা ক'রে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শোষণের সহায়ক হ'য়ে উঠলো। এই শোষণের অংশ-ও তারা কিছু কিছু পেতে লাগলো। এমনিভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রসাদে পুষ্ট হ'য়ে গ'ড়ে উঠলো হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ।* বাংলাতেই ভারতীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রস্তর ভিত্তি প্রোথিত হয়েছিল। তাই সেদিন বাংগলী হিন্দুরাই ছিলেন বৃটিশের সহযোগিতায় সর্বাগ্রগণ্য। ফলে বাংলাদেশেই প্রথমে হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ গ'ড়ে উঠলো। খৃস্টান ধর্মের অন্যতম শাখা ইসলাম যখন অর্থনীতিক ও রাষ্ট্রনীতিক কারণে ভারতবর্ষে খৃস্টান সভ্যতাকে বিজাতীয় ব'লে বর্জন করলো, ঠিক তখনই নবজাত ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়ারা বৃটিশ বুর্জোয়াদের সহযোগী হবার পরিপূর্ণ চেষ্টায় খৃস্টান সভ্যতার সংগে হিন্দু সভ্যতার এক অভিন্ন-সত্তার সন্ধান করতে লাগলো। তার ফলে ভারতের হিন্দু বুর্জোয়া ও ইংল্যাণ্ডের খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে ঘটলো ধর্ম-মৈত্রী, ধর্মীয় সহযোগিতা। এই মৈত্রী ও সহযোগিতার পূর্ণ প্রকাশ হোলো রাজা

* এখানে হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ বলতে কিন্তু কেবল হিন্দুকেই বোঝায় না। এর মধ্যে পার্শীরা এবং সামান্যসংখ্যক মুসলমানও ছিলেন। গোড়ার দিকে মুসলমান সম্প্রদায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংস্পর্শ বর্জন করায় দেশে মূলত যে বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাতে হিন্দুরাই ছিলেন সংখ্যাপ্রধান। তাই প্রথম যুগে উদ্ভূত এই বুর্জোয়া সমাজকে হিন্দু বুর্জোয়া ব'লেই অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী কালে মুসলমানরা যখন বৃটিশের তোষণ শুরু করেছেন, তখন যে বিলম্বিত বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাকেই বলা হয়েছে মুসলমান বুর্জোয়া সমাজ। এর মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বঞ্চিত তপশীল হিন্দুরাও কিছু কিছু ছিলেন।

রাম মোহনের যুগে। বৈদিক হিন্দু এবং ভিক্টোরিয়ান খৃস্টান ধর্ম অভিন্ন-হৃদয় হ'য়ে উঠলো। এই অভিন্ন হৃদয়তার প্রকাশ রূপে জন্ম হোলো ব্রাহ্ম ধর্মের। ১৮২৮ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হোলো ব্রাহ্ম সমাজ। হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মের এই মিলন একদা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করলো গান্ধীজির ধর্মে—যখন খৃস্ট এবং গান্ধী প্রায় একাকার হ'য়ে গেলেন। (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং স্থানীয় বুর্জোয়া সহযোগিতা গান্ধীজির মধ্যেই পূর্ণতম প্রকাশ লাভ করেছিল।)

এখানে একথা-ও উল্লেখযোগ্য যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে এই সময়কার হিন্দুদের সহযোগিতা, এবং পক্ষান্তরে মুসলমানদের অসহযোগিতার ফলে-ই পরবর্তীকালে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বুর্জোয়া পরিণতির যে অসাম্য ঘটলো, তার ফলে (অবশ্য এই অসাম্যকে বৃটিশরা ক্রমাগত জীইয়ে রেখেছিল) একদা ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান বুর্জোয়াদের মধ্যে ঘটলো চরম বিরোধ, আত্মঘাতী কলহ, দেশঘাতী বিচ্ছেদ। অন্যূন শতাব্দীকাল পূর্বে বর্তমান হিন্দু ও মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা সমাজের ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মধ্যে যে অসাম্যের বীজ বপন ক'রে গিয়েছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়মিত কূটনৈতিক বারিসিঞ্চনের ফলে তা-ই একদা দিগন্তব্যাপী এক বিষ-মহীরুহে আত্মপ্রকাশ করলো। ঘটলো নৃশংস সাম্প্রদায়িক কলহ। অবশেষে একদিন ওই বিষ বৃক্ষের ফল গান্ধীজিকে-ও গ্রহণ করতে হোলো। কারণ ভারতের সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম করুণতম কাহিনী হোলো গান্ধীজির হত্যা!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে কলকারখানা গ'ড়ে তোলার বিরোধিতা করলে-ও নিজের ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্যে অতঃপর ভারতবর্ষে রেলপথ প্রবর্তন করতে বাধ্য হোলো। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে রেলপথের উপ-

যোগিতা সম্পর্কে ডালহাউসী বলেন : "Every increase of fecilities for trade has been attended, as we have seen, with an increased demand for articles of European produce in the most distant markets of India" তিনি এ প্রসংগে আরো বলেন যে, রেলপথ প্রবর্তনের ফলে কেবল যে ভারতের দিকে দিকে বৃটিশ মাল বিক্রীত হবে তাই নয়, বৃটেনে রপ্তানীর জন্যে ভারতের সর্বত্র থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করাও হবে সম্ভব। তাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থবিধার জন্যে ব্যাপকভাবে ভারতের সর্বত্র রেলপথ প্রবর্তিত হোলো, বহু পথ-ঘাট খাল-নালার হোলো ব্যবস্থা। এমনিভাবে রেলওয়ে ষ্টীমার প্রভৃতির আমদানীর ফলে আনুসংগিক কল কারখানাগুলি উঠলো গ'ড়ে। প্রয়োজন হোলো ভারতীয়দের মধ্য থেকে দলে দলে কর্মচারী সংগ্রহ করা। স্থতরাং ইংরেজী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার হোলো স্থরু। এই ভাবে ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ ক্রমেই পুষ্টতর হ'য়ে উঠতে লাগলো।

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, মুসলমানরা তাদের বিগত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ভারতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মানসে বৃটিশের সংগে অসহযোগিতা এবং অনেকক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছিলেন। তাই ইংরেজরাও মুসলমান সম্প্রদায়কে সংশয় এবং অপ্রীতির চোখে দেখতো, সিপাহীবিদ্রোহের পর তা কানায় কানায় পূর্ণ হোলো। অন্যপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে নবজাত হিন্দু বুর্জোয়ারা তাদের সহযোগ ও সমর্থন চালিয়ে গেলো পূর্ণোদ্যমে। এমনি ভাবে বৃটেনের পক্ষপাতিত্ব এবং ভারতীয় হিন্দু মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি ভিন্নতর মানোভাব পোষণের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে একটী বিভেদ ক্রমেই দীর্ঘতর হয়ে উঠতে লাগলো। হিন্দুদের মধ্যে যখন 'আলোকপ্রাপ্ত' মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিস্তৃত হ'য়ে উঠলো, তখন মুসলমানরা রইলো নিরক্ষর ইংরেজী-শিক্ষা বিবর্জিত।

ভারতবর্ষ কিন্তু দীর্ঘকাল বৃটিশ মাল বিক্রয়ের বাজার রূপেই কেবল রইলো না। পুঁজির ধর্ম সস্তায় শ্রমিক খোঁজা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবার ভারতবর্ষের শ্রমিক শক্তিকেও শোষণের জন্যে ব্যবহার করতে লাগলো। ভারতবর্ষে শুরু হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ফাইন্যান্স কপিট্যালের যুগ। কিন্তু পুঁজিবাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারে পুঁজির প্রসার যে ভাবে হয়, এখানে সে ভাবে হোলো না। বৃটেন থেকে কোনো পুঁজিই এলো না ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন খাতে সংগৃহীত লুণ্ঠিত অর্থ-ই ভারতবর্ষের বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ'ড়ে তুললো। আবার ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত সংগৃহীত অর্থকে-ই ভারতবর্ষের নামে ঋণ হিসাবে লিখে দেওয়া-ও হোলো। এইভাবে ভারতবর্ষে বৃটিশ শোষণের ধারা ক্রমেই রূপান্তরিত হ'তে লাগলো। *

এতোদিন পর্যন্ত বৃটিশের শোষণ কার্যে সহায়তা ক'রে হিন্দু বুর্জোয়ারা দিনে দিনে ক্রমেই পুষ্ট হ'য়ে উঠছিল। কিন্তু এবার মুসলমান সম্প্রদায়-ও তাদের বর্জন ও অসহযোগের নীতি পরিত্যাগ ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহচর্যে বুর্জোয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে চাইলো। বৃটিশের তোষণে তারা-ও এবার হ'য়ে উঠলো শতমুখ। এ ব্যাপারে তাদের নেতৃত্ব করলেন সার সৈয়দ আহমদ খান। এদিক থেকে সার সৈয়দকে মুসলিম রামমোহন বলা চলে। রামমোহনের যুগে নবজাত হিন্দু বুর্জোয়ারা যেমন খৃস্টান ধর্মের সংগে হিন্দু ধর্মের একান্ত সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিল, তেমনি এখন

* ভারতবর্ষ 'স্বাধীন' হওয়ার পরেও বৃটিশ শোষণের এই ধারাই ভারতবর্ষে বর্তমান রয়েছে। এবং সেই ধারার তন্ত্রধারক হয়েছেন ভারতীয় বুর্জোয়ারা। তাই বৃটিশ শোষণটা আজ ভারতবর্ষে কতকটা হিন্দু পরম ব্রহ্মের রূপ ধারণ করেছে, সর্বব্যাপী, কিন্তু সাধারণের পক্ষে অনধিগম্য।

নবজাত মুসলমান বুর্জোয়ারা-ও ইসলাম ধর্মের সংগে খৃস্টান ধর্মের সাদৃশ্য আবিষ্কার (!) করলো। মহম্মদের জীবন ও বাণীকে সার সৈয়দ এমন ভাবে প্রচার করতে লাগলেন যে, ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের পক্ষে ধর্মের দিক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে মিলনের আর কোনো অন্তরায়ই রইলো না। ইউরোপে বা আমেরিকায় * বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের কালে খৃস্টের জীবনকে যেভাবে rational ক'রে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের কালে-ও মহম্মদের জীবনকে তেমনি rational বা যুক্তিসংগত ক'রে সার সৈয়দ চিত্রিত করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ মনীষীদের মতোই তিনি অতিপ্রকৃতকে ত্যাগ ক'রে প্রকৃতকে (natural) নিয়ে-ই তাঁর ধর্মের আলোচনাগুলি চালাতে লাগলেন। এজন্যে কেউ কেউ তাঁকে ব্যংগার্থক আখ্যা-ও দিলো, 'নেচারী' ব'লে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশীয় পুঁজিবাদীদের সম্মিলিত শোষণের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের অবস্থা ক্রমেই দুঃসহ শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল। তা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হোলো ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময়। ঠিক ঐ সময়েই আবার ভারতীয় অসংখ্য মানুষের দুঃখবেদনাকে ব্যংগ বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যেই যেন মহাসমারোহে বহু অর্থ ব্যয়ে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হোলো মহারানী ভিক্টোরিয়ার দরবার। এই অত্যাচারে অপমানে দেশব্যাপী আক্রোশ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠলো। অত্যাচারের বিরুদ্ধে

* আমেরিকায় এঁদের অগ্রণী ছিলেন নাগরিক টমাস পেইন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সংগে প্রচার চালাতে থাকেন। তিনিই 'United States of America' এই শব্দগুচ্ছটির রচয়িতা।

চতুর্দিক থেকে ষড়যন্ত্র এবং হিংসাত্মক প্রস্তুতির প্রচুর সংবাদ-ও সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের হাতে এলো। ফলে এক দিকে বিদেশী শাসকরা যেমন ভয় পেতে লাগলো, পাছে স্থানীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে ভারতীয় জন-সাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসে, তেমনি অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সহযোগী স্থানীয় জমিদার-বণিকরাও ভয় পেতে লাগলো, জনসাধারণের বিস্ফুরিত আক্রোশ তাদের গায়ে গিয়ে-ও হয়তো বা পড়ে। বৃটিশ সরকার প্রথমে একদিকে দেশের জনসাধারণকে এবং অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের দমন করতে চাইলো। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যে পাশ হোলো ভার্ণাকিউলার প্রেস অ্যাকট্। জনসাধারণকে নিরস্ত্র করার জন্যে তারা অবিলম্বে অস্ত্র আইন-ও পাশ করলো। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাতেই নিরস্ত হোলো না, দমন-নীতির সংগে কূটনীতির-ও ঘটালো সংযোগ। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সংগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হাত মেলাতে-ও চাইলো। এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম। এইভাবে ভারতের প্রধূমিত গণবিক্ষোভকে শান্ত দমিত করার উদ্দেশ্যেই ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হোলো প্রতিষ্ঠা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এ. ও. হিউমের জীবনীকার সার উইলিয়াম ওএডারবার্ণ বলেন: "Towards the close of Lord Lytton's viceroyalty, that is, about 1878 and 1879, Mr. Hume became convinced that some definite action was called for to counteract the growing unrest." দেশব্যাপী বিক্ষোভ এবং গোপন ষড়যন্ত্রের বহু সংবাদ সরকারী সূত্রে মিস্টার হিউম পেয়েছিলেন। মিঃ হিউমের কাগজ

পত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য সম্পর্কে সার ইউলিয়ম ওয়েডারবার্ণ সংক্ষেপে বলেন: "Many of the entries reported conversations between men of the lowest classes, all going to show that these poor men were pervaded with a sense of the hopelessness of the existing state of affairs, that they were convinced that they would starve and die, and they wanted to do something. They were to do something, and stand by each other and that something meant violence."

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ঐ সময় ভারতে এক চূড়ান্ত বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছিল, সে কথা-ও হিউম স্বীকার করেন: "I could not then, and do not now, entertain a shadow of doubt that we were then truly in extreme danger of a most terrible revolution."

এই আসন্ন গণ-বিপ্লবের ভয়েই আতংকগ্রস্ত হিউম তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরীনের সংগে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করেন এবং ভারতীয় বুর্জোয়াদের হাতে রাখার জন্যে তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হয় প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পেছনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কী অভিসন্ধি ছিল, তা ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে লর্ড ডাফরীন-প্রদত্ত বক্তৃতা থেকেই বোঝা যায়:

"Amongst the natives I have met there are a considerable number who are both able and sublime and upon whose loyal co-operation one could undoubtedly rely. The fact of their supporting the government would popularise many of its acts which now have the appearance of being driven through

the legislature by force and if they in their turn had a native party behind them, the government of India would cease to stand up, as it does now, an isolated rock in the middle of a tempestuous sea, around whose base the breakers dash themselves simultaneously from all the four quarters of the heavens." ('Life of the Marquis of Duffrin and Ava' by Sir Alfred Lyall)

অর্থাৎ সহজ ভাষায়, কংগ্রেস স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রামশীল অংশ থেকে 'রাজভক্ত' সহযোগী, কৃপালোভী বুর্জোয়াদের পৃথক ক'রে রাখা এবং তাদের অন্তরালে থেকে ভারতীয় কল্যাণের নামে ভারতবর্ষকে শোষণ করা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের এই কূটনৈতিক পরিকল্পনায় কতোখানি সফল হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের পরবর্তী দীর্ঘ ষাট বৎসরের ইতিহাস থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। ভারতবর্ষে যখনই কোনো চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেছে, তখনই শনৈঃ সংস্কারের পথে ভারতের স্বায়ত্ত শাসন বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নামে এই সহযোগী বুর্জোয়া সমাজকে সাম্রাজ্যবাদীরা বর্মরূপে পেয়েছে। কারণ, দেশের গণ-জাগরণ ছিল, যেমন বিদেশী বুর্জোয়া বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদীদের পক্ষে সর্বনাশা, তেমনি স্বদেশী বুর্জোয়াদের পক্ষে-ও সম্পূর্ণ ভয়ংকর। কিন্তু স্বদেশীয় বুর্জোয়াদের নিজেদের স্বার্থের জন্যে-ও মাঝে মাঝে আবার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। কখনো কখনো ভারতীয় বুর্জোয়ারা দেখেছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে একটু ঠেলে সরিয়ে না দিলে যেমন তাদের নিজেদের পক্ষ-বিস্তারের স্থবিধা হচ্ছে না, তেমনি জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ এমন ঘনিয়ে উঠছে যে, তার নেতৃত্ব না

নিলে তাকে সামলানো-ও হবে অসম্ভব। তখনই দেশীয় বুর্জোয়ারা সংগ্রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু দেশীয় জনসাধারণের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও আতংকটা এতোই প্রবল যে, এই সংগ্রামকে তারা কখনো উপসংহারে পৌঁছতে দেয় নি, পাছে দেশীয় দরিদ্র জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা চলে যায়, কেবলই এই ভয়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবী জনসাধারণের ভয়ে ফরাসী বুর্জোয়ারা যে ভাবে সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সংগে মিতালি করেছিল, ভারতীয় আন্দোলনগুলির কালে-ও ভারতীয় বুর্জোয়ারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে বারে বারে সন্ধি করেছে সেই ভাবে।

আপন পক্ষ বিস্তারের প্রয়োজনেই হোক, কিম্বা দরিদ্র জনসাধারণের তাড়নাতেই হোক, কংগ্রেসের মধ্যে অচিরে একটি সংগ্রামী অংশের উদয় হোলো এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কংগ্রেস তাদের দাবী পেশ করলো। প্রথমে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই দাবী ছিল অতীব সামান্য, এমন কি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার-ও নয়, কেবলমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিতে দু'চার জন ভারতীয় প্রতিনিধি নিয়োগের আবেদন-নিবেদন মাত্র। এই যুগের ভারতীয় বুর্জোয়ারা বেশ বুঝতো যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মতো শক্তি-সামর্থ্য তাদের নেই। কিন্তু তা সত্ত্বে-ও ভারতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে বৃটিশ সরকার ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় বুর্জোয়ারা নিজেরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন না থাকলে-ও বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা* থেকে বেশ বুঝতো যে, ভারতীয় বুর্জোয়াদের ক্রমপরিণতি এবং তার সংগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। সুতরাং তারা এবার হিন্দু বুর্জোয়াদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একটি মুসলমান বুর্জোয়া সমাজ

* আমেরিকার বুর্জোয়া পরিণতি এবং তার সংগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষ ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক সুদীর্ঘ সকরুণ অধ্যায়।

খাড়া করতে চাইলো। (এই divide et impera-র নীতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহু অভিজ্ঞতার ফসল। আয়াল্যাণ্ডে-ও তারা প্রোটেস্টাণ্ট আইরিশ এবং ক্যাথলিক আইরিশদের মধ্যে এমনি একটি বিবাদ ব্যবধান ঘটাবার চেষ্টা করেছিল।) বৃটিশের এই কাজে প্রধান সহায় হলেন সার সৈয়দ আহমদ খান। তিনি তাঁর অন্যতম বন্ধু কর্ণেল গ্রেহামকে লেখেন: "I have undertaken a heavy task against the so-colled National Congress and founded an association, the Indian United Patriotic Association"…সার সৈয়দের পদাংক অনুসরণ ক'রে আলিগড়পন্থীরাও বৃটিশের প্রতি অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করলো। অবশেষে ১৯০৬ খৃস্টাব্দে বৃটিশের প্রতি রাজভক্তির শপথ নিয়েই প্রতিষ্ঠা হোলো মুসলিম লীগের। এই প্রতিষ্ঠার সংগে প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেকার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার একটি সাদৃশ্য আছে। বলা চলে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে হিন্দু বুর্জোয়ারা সংঘবদ্ধভাবে যা করতে চেয়েচিল, কেবল সেই সূচীরই অনুবর্তন করতে চাইলো মুসলমানরা ১৯০৬ খৃস্টাব্দে। বৃটিশের সংগে সহযোগিতার জন্যে সার সৈয়দকে-ও নিন্দা করা যায় না। কারণ, ইতিহাসের অগ্রগতিতে একটি অতি-প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্যে তিনি মুসলমান সমাজকে সেদিন উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং বৃটিশের সংগে সেজন্যে সহযোগিতা ছিল অনিবার্য। রামমোহনের যুগ থেকে গান্ধীর যুগ পর্যন্ত হিন্দু বুর্জোয়ারাও এমনি একটি সহযোগিতার ধারাকে নিরবধি বহন ক'রে চলেছে, সাময়িক সংগ্রামগুলি তাকে কমা, পূর্ণচ্ছেদের ছন্দায়িত তরংগ দিয়েছে মাত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে সকল হিন্দু বুর্জোয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গোখলে। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে শীঘ্রই একটি সংগ্রামশীল দল-ও গড়ে

উঠলো ; এই দলের পুরোভাগে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গংগাধর তিলক। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং পাঞ্জাবে লালা লজপৎ রায়।

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এসে তার সহযোগিতায় যখন হিন্দু বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তখন তারা খৃস্টান ধর্মের মহত্ত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল, হিন্দু ধর্মের সংগে খৃস্টান ধর্মের বহুল সাদৃশ্যের সন্ধান পেয়েছিল, গড়ে তুলেছিল বুর্জোয়া খৃস্টান ধর্মের বৈদিক সংস্করণ ব্রাহ্ম ধর্ম। কিন্তু এবার যখন হিন্দু বুর্জোয়দের এক অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চাইলো, তখন তারা খৃস্টান সভ্যতাকে হিন্দু সভ্যতার চেয়ে খাঁটো ব'লে প্রচার করতে চাইলো, * খৃস্টান ধর্মের মহত্ব অস্বীকার ক'রে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব করলো ঘোষণা। দেশময় শুরু-হোলো গণেশের পূজা, কালীর অর্চনা, স্থাপিত হোলো গো-রক্ষা সমিতি। সকল দিক থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতা ও খৃস্টান ধর্মকে হিন্দু ধর্মের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ক্রমেই প্রবলতর এবং ব্যাপকতর হ'য়ে উঠলো, এবং এই ভাবে সেদিন হিন্দু বুর্জোয়ার সংগ্রামী অভ্যুত্থানের মধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল, সংকীর্ণ, সামন্ততান্ত্রিক একটি শক্তির বীজ অংকুরিত হোতে লাগলো,—যা পরবর্তীকালে ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করলো হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে। ঐ সময় আবার অন্যদিকে মুসলমান বুর্জোয়ারা

* বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হিন্দু বুর্জোয়া সংগ্রামী অভ্যুত্থানের যিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, সেই লোকমান্য তিলক ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বাল্যবিবাহের উৎকট প্রচারক হয়ে ওঠেন এবং 'এজ অব কনসেন্ট' বিলের প্রবলতম বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সংগ্রামের ঝোঁকে তিনি হিন্দু বুর্জোয়াদেরকে সামন্ততান্ত্রিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। এদিক থেকে রাজনীতির ক্ষেত্রে লোকমান্য তিলককেই সাভারকরের জন্মদাতা বলা যায়।

সার সৈয়দের নেতৃত্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করায় হিন্দু বুর্জোয়াদের সংগ্রামী অংশ তাদের বিদ্বেষের চোখে দেখতে লাগলো, তাদের হিন্দুয়ানীর প্রচারে অনেক ক্ষেত্রে ম্লেচ্ছ ইংরেজ এবং ম্লেচ্ছ মুসলমান এক হ'য়ে গেলো। এই ঐতিহাসিক প্রমাণটি সর্বাপেক্ষা সুন্দর-ভাবে ধরা পড়েছে, তদানীন্তন মুসলিম বিদ্বেষী বাংলা সাহিত্যে—বংকিম চন্দ্রের কিছু কিছু রচনা যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে একটি সংগ্রামী শক্তির জন্ম হ'লেও তার ভিত্তি কিন্তু মোটেই গভীর বা বিস্তৃত ছিল না। কারণ, সমাজের তলাকার অসংখ্য জনসাধারণের সংগে তা ছিল প্রায় সম্পর্কবিহীন। গরীব ছাত্র, মধ্যবিত্ত বেকার বা অল্প উপার্জনে ব্যাপৃত বুদ্ধিজীবীরাই ছিল এই সংগ্রামশীল অংশের মূল আশ্রয়। সুতরাং, দেশে কোনো বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। ফলে, সংগ্রামশীল হিন্দু বুর্জোয়ারা তখন প্রধানত সাম্রাজ্যবিরোধী ব্যক্তিগত রচনা, বক্তৃতা, প্রচার—এবং কোনো কোনো চরমপন্থী ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

যাই হোক, ক্রমেই কিন্তু এই সংগ্রামী শক্তি বিন্দু বিন্দু ক'রে সঞ্চিত হ'তে থাকলো, এবং তা সংগ্রামের প্রায় উপযোগী একটি অবস্থা প্রাপ্ত হোলো ১৯০৫ খৃস্টাব্দে। ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিণতির সংগে বাইরের ঘটনা এসে-ও যোগ দিলো। ঐ সময় জারশাসিত সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া জাপানের কাছে হোলো পরাজিত। বহু শতাব্দীর জন্য কোনো এশীয় শক্তির কাছে ইউরোপীয় শক্তির পরাজয় এই সর্বপ্রথম। ফলে ভারতীয় বুর্জোয়ারা ইউরোপীয় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত করার সাহস পেলো। কেবল তাই নয়, প্রথম রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক জয়গুলির ফলে-ও ঐ সময়ে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অবয়বে-ও গুরুতর ভাঙন ধরেছিল। এই সুযোগে

হিন্দু বুর্জোয়ারা সংগ্রামের আশু কারণ হিসাবে গ্রহণ করলো বংগ-ভংগকে। সংগ্রাম হোলো শুরু। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখে বিদেশী দ্রব্যবর্জনের স্থচী ঘোষিত হোলো! আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। ১৯০৫ সালে কংগ্রেস চরমপন্থী বুর্জোয়াদের এই বৃটিশ-বিরোধী ব্যবস্থাকে বিনা সর্তে সমর্থন না করলেও পর বৎসর, ১৯০৬ সালে, কংগ্রেসে যখন চরমপন্থীদের প্রাধান্য ঘটলো, তখন কংগ্রেস কেবল বিদেশী বর্জনকেই সমর্থন করলো না, সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যের মধ্যেই ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করলো। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী বর্জনের সংগে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি এবং জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা-ও হোলো প্রবর্তিত। কংগ্রেসে সাময়িক-ভাবে সংগ্রামশীল বুর্জোয়াদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেলে-ও তাঁদের এই স্থচীতে কংগ্রেসের অপর অংশ—যাঁরা বৃটিশের সংগে সহযোগিতা চান—সুখী হলেন না। ফলে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে স্থরাট কংগ্রেসে গোখলের নেতৃত্বে নরমপন্থীদের সংগে তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের ঘটলো বিচ্ছেদ। হিন্দু বুর্জোয়া শিবিরের এই আত্মকলহের স্থযোগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সতর্কতার সংগেই গ্রহণ করলো। ফলে সংগ্রামশীলদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হোলো। সংবাদপত্রে রাজদ্রোহী প্রবন্ধ লেখার অজুহাতে তিলকের হোলো ছয় বৎসরের কারাদণ্ড। অন্যান্য নেতাদের হোলো কঠিন শাস্তি। চারি-দিকে নির্যাতন চললো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এক হাতে যখন কঠোর দমন কার্য চালিয়েছে, ঠিক তখনই তারা অন্য হাতে দিতে চেয়েছে কিছু কিছু স্থযোগ স্থবিধা। কারণ, তারা বেশ জানতো যে, কেবল অত্যাচার দিয়ে কোন সংগ্রামকে রোধ করা যায় না, তাই এবারে-ও তারা তাদের স্থপরীক্ষিত নীতির প্রয়োগ করলো। তারা এক হাতে যখন কঠোরভাবে চরমপন্থীদের দমন করতে লাগলো, তখনই অন্যহাতে নরমপন্থীদের সংগে মৈত্রী-মীমাংসার

আলাপ আলোচনা চালালো। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হোলো মর্লে-মিণ্টো রিফর্ম। অধিকাংশ চরমপন্থী কারাগারে বা দ্বীপান্তরে থাকায় নরমপন্থীদেরই কর্তৃত্ব ছিল কংগ্রেসে। সুতরাং তারা অচিরে বৃটিশ সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করলো। ১৯১১খৃস্টাব্দে সংশোধিত হোলো বংগভংগ। নরমপন্থী-কবলিত কংগ্রেস প্রচার করলো, বংগভংগ রদ হওয়ায় বৃটিশের সদাশয়তায় দেশে আনন্দের আর সীমা নেই, বৃটিশ রাজনীতিকদের প্রতি বিশ্বাসে ও কৃতজ্ঞতায় জনসাধারণের বক্ষ উদ্বেল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে···।

বস্তুত, বৃটিশ রাজনীতিকদের করুণায় যে বংগভংগ রদ হয় নি, হয়েছিল চরমপন্থীদের বিদেশী বর্জনের আন্দোলনের ফলে, তা বলা-ই বাহুল্য। এমনি ভাবে-ই সেদিন তিলকের নেতৃত্বে হিন্দু বুর্জোয়াদের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দিতে শিখলো।

এদিকে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারাও কিন্তু বেশি দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে মিতালি রাখতে পারলো না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংস্পর্শে এবং সাহায্যে ক্রমেই মুসলমানদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত সমাজ বিস্তার লাভ করেছিল। এবার তাদের মধ্যে-ও মধ্যবিত্তের সমস্যা প্রবল হ'য়ে উঠলো। বেকার যুবক, গরীব অসহায় ছাত্র এবং স্বল্প বেতনের কর্মচারীদের সংখ্যা যেমন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তেমনি তাদের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই তীব্রতর আকার ধারণ করলো। ১৯১২ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তাদের মধ্যে সংগ্রামী শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটলো— ১৯০৫ সালে যেমনটি ঘটেছিল হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে। ১৯০৫ সালেও যেমন বহির্জগতের ঘটনা ভারতীয় সংগ্রামী স্রোতকে ফেনিল ক'রে তুলেছিল, এবার-ও আবার হোলো তেমনিটি। ইটালি-তুরস্কের যুদ্ধ এবং বল্কান যুদ্ধের মধ্যেই ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দেওয়ার

সুযোগ পেলো। মওলানা মহম্মদ আলির উদ্যোগে ডাক্তার আনসারীর অধীনে ১৯১২ খৃস্টাব্দে ভারত থেকে তুরস্কে Red Crescent Missson প্রেরিত হোলো। আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'আল হিলাল' পত্রিকায়, জাফর আলি খাঁ তাঁর 'জমিন্দার' পত্রিকায় এবং মওলানা মহম্মদ আলি তাঁর 'কমরেড' ও 'হামদরদ' পত্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তুমুলভাবে প্রচারকার্য শুরু করলেন।

হিন্দু বুর্জোয়াদের মধ্যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সূচনার সংগে সংগে আমরা লক্ষ্য করেছি, হিন্দু বুর্জোয়াদের সংগ্রামশীল অংশ সংকীর্ণ সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির মধ্যেই ফিরে গিয়েছিলেন। এখানে-ও আমরা পুনরায় অনুরূপ একটি অবস্থাই লক্ষ্য করি। মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ সাম্রাজ্য-বিরোধিতা আবার খৃস্টান ধর্ম-বিরোধিতায় পরিণত হোলো, ভারতীয় মুসলমানরা খৃস্টান ধর্মের অপেক্ষা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারেই অত্যন্ত উৎসাহী হ'য়ে উঠলেন। আরব-সভ্যতা কিভাবে অন্ধকার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দীপ-বতিকাকে বাইরের বর্বরতার বিপদ-ব্যাত্যা থেকে সযত্নে সাগ্রহে রক্ষা করেছিল, কিভাবে সক্রেতিস, প্লেতো, এরিস্টটলকে তারাই একদা স্পেনের পথে অন্ধ হৃতসর্বস্ব ইউরোপকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, কিভাবে তারা অংকশাস্ত্র, বস্তুবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে একদা মৌলিক গবেষণা এবং প্রয়োগ-চেষ্টার দ্বারা পৃথিবীর জ্ঞান সম্পদকে সমৃদ্ধতর করেছিল, তারই উচ্ছ্বসিত ইতিহাস কেবলই প্রচারিত হ'তে লাগলো। প্রচারিত হ'তে লাগলো যে, বহু শতাব্দী পূর্বেই খৃস্টান ধর্মের অপমৃত্যু ঘটেছিল, সে যে পুনর্জীবিত হ'য়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ, প্রাণ-শক্তিতে উচ্ছল সারাসেন সভ্যতার জীবন-প্রাচুর্যের সংস্পর্শে সেদিন ইউরোপ এসেছিল। এইভাবে

ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ-সাম্রাজ্য-বিরোধিতা খৃস্টান-ধর্ম-বিরোধী ইসলাম-স্তুতিতে এবং বিগত কীর্তির আত্মম্ভরিতায় প্রকাশ লাভ করলো এবং আকার ধারণ করলো প্যান-ইসলামের। বিগত হেজাজী সভ্যতার পুনরভ্যুত্থানের প্রভাতী গাইতে লাগলেন তাঁরা। তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হোলো: "শুনা হায় কদসিয়োঁসে ময়নে উও শের ফির হুঁসিয়ার হোগা।" (দেবদূতদের কাছ থেকে শুনেছি ওই (আরব) ব্যাঘ্র আবার জেগে উঠবে।) সার মহম্মদ ইকবাল আরব সভ্যতার বিগত দিনগুলি স্মরণ ক'রে-ও ক্রন্দন ধ্বনিত করলেন। সিসিলি-দ্বীপে আরব সভ্যতার এক সৌধের ধ্বংসাবশেষ দেখে ফুকরে উঠলেন তিনি, 'কাঁদো, চক্ষু থেকে রক্ত ঝরিয়ে কাঁদো, আরব সভ্যতার ওই কবর দেখা যাচ্ছে।'*

এখানে স্মরণীয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়াদের অভ্যুত্থানের অংগরূপেই সেদিন ইসলাম সভ্যতার স্তুতি এবং প্যান-ইসলামের প্রচার শুরু হয়েছিল। খিলাফৎ সমস্যা এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযানের বিরুদ্ধে-ও ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলন-ও ছিল বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার প্রকাশ মাত্র। আমরা লক্ষ্য করি, ভারতে মুসলমান বুর্জোয়া শক্তি যখন সহযোগিতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল, যখন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার মতো শক্তি বা সাহস তারা সঞ্চয় করে নি, তখন ভারতীয় মুসলমানরা খিলাফৎ বা তুরস্কের সমস্যা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র-ও মাথা ঘামাচ্ছে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তুরস্কের প্রতিক্রিয়াশীল সুলতান আব্‌দুল হামিদ

---

* "রোয়ে আয়ে লাখ দিলকর আয় দিদাখুন বহানা কর,
উও নজর আতা হায় তহজিব হেজাজীকা মজার।"

তাঁর প্যান-ইসলামের স্থচী গ্রহণ করেন। তুরস্কের আভ্যন্তরীণ সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক অবয়বের বিরুদ্ধে যে তরুণ বুর্জোয়া শক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তারই প্রচণ্ড আঘাতের হাত থেকে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে কোনোক্রমে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই সেদিন স্থলতান আবদুল হামিদ এই প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু 'তরুণ তুর্কের' অভ্যুত্থানকে রোধ করা ছিল অসম্ভব। তাই ১৯০৮ খৃস্টাব্দে তরুণ তুর্কী তার পুরাতন খলিফা এবং তার শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করলো এবং প্যান ইসলামের প্রচার সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেলো। কিন্তু ঐ সময়ে-ও ভারতীয় মুসলমানরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সহযোগিতায় ব্যাপৃত থাকায় খিলাফৎ বা প্যান-ইসলামের সমস্যা তাঁদের আদৌ ব্যস্ত করলো না। ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারা বৃটিশ-বিরোধী শক্তিসঞ্চয় করার সংগে সংগেই তারা খলিফা-প্রীতি এবং প্যান-ইসলামের সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করলো—যদি-ও তুরস্কের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক পরিণতির পক্ষে-ও তা ছিল সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। এইভাবে কয়েক বৎসর পূর্বে হিন্দু বুর্জোয়ারা যেমন বৃটিশ বিরোধিতার উদ্দেশ্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু-ধর্ম-দর্পের পথ গ্রহণ করেছিল, তেমনি ভারতের মুসলমান বুর্জোয়ারা-ও গ্রহণ করলো সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল খিলাফৎ এবং প্যান-ইসলামের পথ। ফলে, হিন্দু ও মুসলমান বুর্জোয়াদের মধ্যে একদা যে বৃটিশ-বিরোধিতা প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল, তা-ই পরবর্তী কালে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের উপযোগী ঘোরতর সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হোলো।

এই সময়ে শুরু হোলো প্রথম মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধে বৃটেন তুরস্কের বিপক্ষে থাকায়, মুসলমান বুর্জোয়াদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার

প্রকাশ রূপে তুরস্ক-প্রীতি প্রবল হ'য়ে উঠলো। মুসলমান সংবাদপত্রগুলি বৃটেনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালাতে লাগলো। ফলে মওলানা আজাদ, মওলানা মহম্মদ আলি প্রভৃতি বৃটিশ-বিরোধী মসলেম নেতারা দীর্ঘকালের জন্যে বিনা বিচারে হলেন অন্তরীণ।

এমন সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রথম দিকে গান্ধীজি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করলে-ও, তিনি শীঘ্রই হিন্দু ও ভারতীয় মসলেম বুর্জোয়া শক্তির মধ্যে সাময়িক মিলন ঘটালেন। কেবল তাই নয়, হিন্দু বুর্জোয়া সমাজের মধ্যে-ও যে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে ব্যবধান ও বিরুদ্ধতা ঘটেছিল, তিনি তারও ঘটালেন অবসান। (অবশ্য, একদল নরমপন্থী ১৯১৮ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের বাইরে চলে যান। তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সহযোগিতার ধ্বজা আরো দীর্ঘকাল নির্লজ্জভাবেই বয়ে বেড়াতে থাকেন।)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-ও গান্ধীজির মধ্যে এমন একজন মানুষের সন্ধান পেলো, যাঁর জীবন-দর্শন পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের সহায়ক হ'য়ে উঠবে। গান্ধীজির জীবন-দর্শনে দারিদ্র্যের স্তুতি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা এবং অহিংসাই ছিল প্রধান। বৃটিশ শোষণের ফলে দেশে দারিদ্র্য ছিল অনিবার্য, স্থতরাং দারিদ্র্যকে ত্যাগের মহিমা দিলে শোষক সাম্রাজ্যবাদীরই যে ছিল স্থবিধা, একথা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজি যে সহনশীলতা এবং অহিংসার প্রচার করছিলেন, তাই দেশের বিপ্লবী শক্তিকে পরোক্ষভাবে বিরত বিভ্রান্ত করছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচারে, কথাবার্তায় non-violenceএর উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায়। কেবল তাই নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছিল, ভারতবর্ষকে বিশাল কৃষিক্ষেত্র-রূপে ব্যবহার করতে। স্থতরাং ভারতবর্ষে কলকাখানার

যাতে উন্নতি না হয়, তাই ছিল তাদের একান্ত কাম্য। গান্ধীজি যখন ভারতবর্ষকে কলকারখানার বিরোধী * হ'তে এবং কৃষিক্ষেত্রে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন, তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতেই ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদেরই দীর্ঘ জীবন কামনা ক'রে বসলেন। বস্তুতপক্ষে, বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদী সংস্কৃতি ও শিক্ষার পূর্ণতম প্রকাশ ঘটেছিল গান্ধীজির মধ্যে। দারিদ্র্যের স্তুতি, ত্যাগ, ক্ষমা, সহনশীলতা এবং অহিংসা ছিল সেই সংস্কৃতি ও শিক্ষার মূল-কথা। মানুষগুলো পাভ্‌লভের কুকুরের মতো। তাই গান্ধীজি মানুষের সেরা মানুষ হ'য়ে-ও তাঁর আবাল্য শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক পরিপার্শ্বকে কখনো উত্তীর্ণ হ'তে পারলেন না।

---

* গান্ধীজির এই যন্ত্রবিরোধিতা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা স্পষ্ট বোঝা যায় একটি কৌতুককর ঘটনা থেকে। (অবশ্য পরবর্তীকালে বহু রচনায় ও ভাষণে গান্ধীজি নিজেকে যন্ত্রবিরোধী ব'লে স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হয়েছেন!) দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম শেষে দেশে ফেরার সময় গান্ধীজির সংগে ছিলেন মিঃ কলেনবেক। কলেনবেকের একটা দূরবীণ ছিল। গান্ধীজির যন্ত্রবিরোধী যুক্তি অনুসারে কলেনবেক ঐ দূরবীণটিকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন।

বারো

মহাযুদ্ধের শুরু হয় ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট তারিখে। গান্ধীজি তার দুদিন বাদে বিলাতে পৌছেন। ঐ সময় ভারতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থীদের প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং যুদ্ধ শুরু হওয়ার সংগে সংগে ভারতীয়দের নামে কংগ্রেস বৃটিশকে সাহায্য করতে চাইলো। লণ্ডনে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে লালা লজপৎ রায়, জিন্না * এবং অন্যান্য নেতারা বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেসের সংকল্প জ্ঞাপন করেন। অহিংসাপন্থী হওয়া সত্বে-ও গোখলের ছাত্র গান্ধীর পক্ষে এই সহিংস যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা সম্ভব ছিল না। গান্ধীজি হোটেল সেসিলে তাঁর অভ্যর্থনা সভায় ভারতীয় তরুণদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে নিজেদের ভাবেন এবং সেই হিসাবে কর্তব্য করেন। গান্ধীবাদীরা অনেকেই গান্ধীজির সহিংস যুদ্ধের সমর্থনে বিস্মিত হ'লেন। তাঁদের জবাবে গান্ধীজি যা জানালেন, তাকে হিংসার প্রশস্তি বলা চলে : "হিংসা ব্যাপক বস্তু। আমাদের এই প্রাণ হিংসার বহ্নি শিখায় উৎসৃজিত।

* এখানে লক্ষণীয়, মিঃ এম, এ, জিন্না তখনো মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করছেন না। তিনি অপেক্ষাকৃত পরিণত হিন্দু বুর্জোয়াদের সহযোগী শিবিরেই রয়েছেন এবং কংগ্রেস নেতা ও নেত্রীদের দ্বারা বর্ণিত হ'চ্ছেন "মিলনের বাণীবাহক" রূপে। তিনি মুসলিম গোখলে। তিনি বৃটিশের সংগে চূড়ান্ত সহযোগী। পরবর্তী কালে মুসলিম বুর্জোয়া সম্প্রদায় যখন হিন্দু বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধতা করছে এবং সেই বিরুদ্ধতায় সাফল্যের লোভে বৃটিশের সংগে করছে হীন প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগিতা, তখন-ই তিনি বৃটিশ সহযোগিতার নেতা হিসাবে তিনি মুসলিম বুর্জোয়াদের সারথ্য গ্রহণ করেছেন।

…মানুষ বাহিক ভাবে হিংসা না ক'রে ক্ষণমাত্র-ও থাকতে পারে না।… কোনও দেহধারীই বাহ্য হিংসা থেকে মুক্ত হ'তে পারে না।"* লণ্ডনে যে সব ভারতীয় ছিলেন, তাঁদের অনেককে নিয়ে তিনি একটি সেবাদল গ'ড়ে তুললেন। এখানে এই কাজের সংস্পর্শে এসেই তাঁর সংগে মিসেস সরোজিনী নাইডুর প্রথম পরিচয় ঘটে। অহিংস সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে যখন সহিংস যুদ্ধের সাহায্য করা হয়, তখন সেই অহিংসা-ও যে হিংসারই সহায়ক হ'য়ে ওঠে, সে বিষয়ে গান্ধীজি অবশ্য যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। "বন্দুক নিয়ে যে যুদ্ধ করে, আর যে তার সাহায্য করে, অহিংসার দৃষ্টিতে আমি সে দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। যে ব্যক্তি লুণ্ঠনকারীর দলে চাকরী করে, সে লুণ্ঠন-ই করুক, বা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করুক, বা তাদের সেবাই করুক, দস্যুতার অপরাধে সে-ও লুণ্ঠনকারীদের সংগে একই অপরাধে অপরাধী।"†

কিন্তু এবার তিনি কেবল সেবাকার্যেই সন্তুষ্ট রইলেন না। তিনি ভারতে এসে ব্যক্তিগত চেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্য থেকে সৈন্য সংগ্রহ-ও করতে লাগলেন। বৃটিশকে সাহায্য করার অত্যুৎসাহে ভেসে গেলো তাঁর অহিংসার ধর্ম, তত্ত্ব-দর্শনের মহিমা! অথচ ভারতের স্বার্থে যখন সামান্যতম দাংগাহাংগামা-ও ঘটেছে, তখনই তিনি ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন, তখনই তাঁর অহিংসা ও সত্যের সকল আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা ভারতবাসীর বৃটিশ-বিরোধী বিপ্লবী শক্তির বুকে জগদ্দল পাথরের মতো এসে চ'ড়ে বসেছে—এর অর্থ কি? গান্ধীজি যে সামাজিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তার স্বরূপ সন্ধানের মধ্যেই এর যথার্থ অর্থ মিলবে, অন্যত্র নয়। গান্ধীজি

* গান্ধীজির 'আত্মকথা' থেকে।

† ঐ একই গ্রন্থ থেকে।

ছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বার্থের পূর্ণতম প্রকাশ এবং ভারতীয় বুর্জোয়ারা ছিলেন মূলত বৃটিশের সহযোগী।* তলাকার অসংখ্য মানুষের বিক্ষোভের উত্তাপ মাঝে মাঝে তাঁদের তরল অস্তিত্বের উপর বিপ্লবের বুদ্বুদ তুলেছে, এইমাত্র।

এই সময় গান্ধীজির প্লিউরিসি হয়। তিনি ঈষৎ সুস্থ হ'লেই দেশে রওনা হন। ভারতবর্ষে ফিরে গান্ধীজি প্রায় সেরে ওঠেন এবং ভারতবর্ষ ভ্রমণে বার হন। এবারে ভারতের তীর্থস্থানগুলির প্রতিই তাঁর বিশেষ মনোযোগ দেখা যায়। তীর্থভ্রমণ শেষে তিনি আমেদাবাদে ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। এই সময় ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিরমিটিয়া পাঠাবার যে প্রথা ছিল, তাকে আইন ক'রে বন্ধ করার জন্যে গান্ধীজি অনেক চেষ্টা করেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ৩১শে জুলাই থেকে এই প্রথা লোপ পায়।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজি যখন একটি মূলত ধনিক আন্দোলনের নেতৃত্ব করছিলেন, ঠিক তার পূর্বক্ষণেই তিনি সেখানে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের সংগে করেছিলেন মিতালি। কারণ, গণতন্ত্রের নামে কোনো আন্দোলন করতে হ'লে গণতন্ত্রের মূল অধিকারী কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য না নিলে চলে না। বিশেষত, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো হিন্দু বাড়ির পূজা-পার্বণের মতো। নৈবদ্য ঠাকুর নিজে খান না, আর খান না ব'লেই সম্ভবত নৈবদ্যের সমারোহটা তাঁর

* অবশ্য পরবর্তী কালে ১৯২২ সালে বিচারের সময় গান্ধীজি তাঁর এই সহযোগিতা সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দেন : "In these efforts at service I was actuated by the belief that it was possible by such services to gain a status of full equality for my countrymen."

নামে করাই নিরাপদ। কি দক্ষিণ আফ্রিকায়, কি ভারতবর্ষে, বুর্জোয়া আন্দোলনগুলো গণ-দেবতার নামে-ই হয়েছিল এবং নৈবদ্যের সম্ভার-ও ছিল পুরুত-ঠাকুরদের নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু গণ-দেবতা ঠাকুরটি আবার জাগ্রত কিনা, তাই তাঁর নামে নৈবদ্য সাজিয়ে তাঁকে বঞ্চিত করা সহজ নয়। সুতরাং গণ-দেবতার বুর্জোয়া সেবাইৎ এবং পুরোহিতদের সর্বদা-ই ভয় যে, গণ-দেবতার কোটি কোটি হস্ত কখন তাঁর প্রাপ্য নৈবদ্যকে এসে গ্রাস ক'রে বসেন! তখন তাদের কাছে গণ-দেবতা মুহূর্তে আবার গণ-দৈত্যে পরিণত হন। তাদের নির্লজ্জ সুবিধাবাদী প্রচার চলতে থাকে।* ভারতীয় 'স্বাধীনতা' আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রাক্কালে-ও তাই গান্ধীজিকে আমরা কৃষক ও শ্রমিক নেতারূপেই দেখি। সেগুলির মধ্যে চম্পারণ ও খেড়ার কৃষক আন্দোলন এবং আমেদাবাদের শ্রমিক আন্দোলনই শ্রেষ্ঠ।

নীলকরদের অত্যাচার বাংলার ইতিহাসের এক বীভৎস অধ্যায়। বাংলার কৃষাণদের সমবেত চেষ্টায় ১৮৬০ খৃস্টাব্দ থেকে নীলকরদের অত্যাচার বাংলাদেশে লোপ পায়। কিন্তু সুবে বাংলার অপরাংশ বিহারে তা যথাপূর্ব চলতে থাকে। সেখানে-ও কৃষাণ-বিদ্রোহ যে হয় নি, এমন নয়। ১৮৬৭ সাল থেকে বারে বারে সেখানে কৃষকদের অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং নীলকর ও সরকার সেগুলিকে প্রতিবারেই যেমন দমন করেছে কঠিন হস্তে, তেমনি কৃষকদের এক-আধটুকু সুযোগ সুবিধাও দিয়েছে। বর্তমান নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের প্রধান অভিযোগ ছিল তিনকাঠিয়া

* "তিনি (গান্ধীজি) তীব্রভাবে 'জনতাতন্ত্রের' নিন্দা করিলেন। এই জনতা-তন্ত্রকে তিনি সর্বাপেক্ষা বিপদ বলিয়া ভাবেন। যুদ্ধকে তিনি যেমন ঘৃণা করেন, তেমন আর কেহই করেন না। তবু যদি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে বলা হয়, তবে তিনি এই জনতাদৈত্যকে বন্ধনমুক্ত করিবার অপেক্ষা যুদ্ধকেই শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

"মহাত্মা গান্ধী"—রোমাঁ। রোলাঁ।

প্রথা। দেশে আহারের উপযোগী ফসল থাক আর না থাক, কৃষকদের নীলের চাষ করতেই হবে বিঘা প্রতি তিন কাঠা। কেবল তাই নয়, চাষীকে নিজের খরচে গাড়ি ক'রে নীলের গাছগুলিকে ক্ষেত থেকে নীলকুঠিদের খামারে পৌঁছে দিতে হোতো। বিনা মজুরিতে সেগুলিকে পচাতে ও তৈরী করতে-ও তারা বাধ্য থাকতো। জেলা চম্পারণে কৃষকরা এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আবার একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলো। সেজন্যে তারা সাহায্য চাইলো গান্ধীজির। কৃষকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে গান্ধীজি চম্পারণ রওনা হলেন, প্রথমে এলেন পাটনায়। সেখানে মওলানা মজহ্‌রুল হক, ব্রজকিশোর প্রসাদ এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতির সংগে তাঁর পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হোলো। স্থানীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও গান্ধীজিকে এ-বিষয়ে পূর্ণ সহানুভূতি এবং সমর্থন জানালেন। চম্পারণে পদার্পণ করলেন গান্ধীজি। চম্পকের অরণ্য আর ছিল না সেখানে, ছিল সমৃদ্ধিহীন মাঠের হতশ্রী দিগন্তবিস্তার। নীলকরের অত্যাচারে নিপীড়িত নির্যাতিত চম্পারণ তার রিক্ত বেদনা দিয়েই সেদিন গান্ধীজিকে অভিনন্দিত করলো।

শীঘ্রই গান্ধীজির উপর নীলকরদের পড়লো রোষদৃষ্টি। তাই অবিলম্বে তাঁর চম্পারণ ত্যাগের জন্যে এলো সরকারী আদেশ। কিন্তু এই অন্যায় আদেশ নির্বিবাদে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না গান্ধীজির পক্ষে। গান্ধীজি আদেশ অমান্য করলেন। এবার তাঁর ওপর আদালতে হাজির হবার হুকুম হোলো। এই হুকুমের সংবাদ তড়িৎ বেগে ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে। হাজারে হাজারে ভীড় ক'রে এলো মানুষ। এতো সংখ্যাতীত মানুষের সমাগম চম্পারণ বহুদিন দেখে নি। বিক্ষুব্ধ জনতার এই বিপুল দুরন্ত উচ্ছ্বাসকে উপেক্ষা করার মতো স্পর্ধা ছিল না সরকারের। মামলা প্রত্যাহৃত হোলো।

চম্পারণের দরিদ্র কৃষকদের সংগে গান্ধীজি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন, তাদের শিক্ষা ও সেবার নানা ব্যবস্থা করতে চাইলেন। এইভাবে যে গান্ধীজি দিনে দিনে চম্পারণের কৃষকদের সংঘবদ্ধ ক'রে তুলছিলেন, সে বিষয়ে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। সুতরাং গান্ধীজির ওপর কেবলই তাড়া আসতে লাগলো, আর তাঁকে সময় দেওয়া চলে না, অনুসন্ধানের কাজ তাঁকে শীঘ্রই শেষ করতে হবে। জবাবে গান্ধীজি জানালেন, কেবল অনুসন্ধান নয়, অন্যায়ের শেষ না ক'রে এখান থেকে এক পা-ও তিনি নড়বেন না। চম্পারণের কৃষক-শক্তি সম্পর্কে সরকারের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তা যদি এবার গান্ধীজির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হ'য়ে ওঠে, তবে তার আলোড়ন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে তরংগায়িত ক'রে তুলবে, সে বিষয়ে সরকারের কোনো সন্দেহ ছিল না। কাজেই সরকার হঠাৎ সদাশয় হ'য়ে উঠলো, বসালো সরকারী কমিশন। তিন কাঠিয়া প্রথার ঘটলো বিলোপ। এমনি ভাবে সেদিন উত্তর ভারতের সহস্র সহস্র কৃষকের প্রীতি ও ধন্যবাদ গান্ধীজির ভারতীয় নেতৃত্বের পথকে প্রশস্ত ক'রে দিলো।

অবিলম্বেই গান্ধীজির ডাক এলো বোম্বাই থেকে। খেড়ায় কৃষাণরা উঠেছে জেগে, আমেদাবাদে শ্রমিকরা চেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার। গান্ধীজি খেড়া এবং আমেদাবাদের আহ্বানকে সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষ দেখলো আইন অমান্য, অনশন, সত্যাগ্রহ।

এই সময় নরমপন্থী-কবলিত ভারতীয় কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে বৃটিশের তাঁবে চ'লে এসেছিল। কারণ, কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে বৃটিশ শাসকদের নিয়মিত দেখা যাচ্ছিল সম্মানিত অতিথি রূপে।* ভারতীয় সহযোগী

* ১৯১৪ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড পেটল্যাণ্ড, ১৯১৬ খৃস্টাব্দে বোম্বাইএর

হিন্দু বুর্জোয়াদের এই ভূমিকায় গান্ধীজি-ও সানন্দে অবতীর্ণ হলেন। খেড়ার অহিংস সত্যাগ্রহের অনতিকাল বাদেই বড়লাটের অনুরোধ ক্রমে তিনি সহিংস যুদ্ধের জন্যে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

প্লিউরিসির পর গান্ধীজির স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি, সৈন্য সংগ্রহের কঠোর পরিশ্রমের ফলে তা আবার ভেঙে পড়লো। গান্ধীজি কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হোলেন।

গান্ধীজি যখন রোগে শয্যাশায়ী, তখনই সংবাদ এলো যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটেছে। গান্ধীজি আনন্দিত হলেন। কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হোলো না। গান্ধীজি তখনো রোগ শয্যায়, তাঁর হাতে এলো কুখ্যাত রাউলাট কমিটির এক কপি রিপোর্ট। গান্ধীজি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। এ কী কৃতঘ্নতা! এই জন্যেই কি অহিংসার আদর্শ থেকে তিনি বিচ্যুত হ'য়েছিলেন?*

গভর্ণর লর্ড উইলিংডন, ১৯১৬ খৃস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার জেম্‌স্ মেস্টন কংগ্রেস অধিবেশনগুলিকে 'অলংকৃত' করেন।

* এতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁর আস্থা যে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছিল, একথা ভাববার অবশ্য কোনো কারণ নেই। কারণ, রাউলাট আইন এবং অমৃতশহরের হত্যাকাণ্ডের পর-ও তিনি বৃটিশের সংগে সহযোগিতাকে ধ্রুব অভ্রান্ত পথ ব'লে আঁকড়ে ছিলেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকেও মণ্টফোর্ড সংস্কারকে গ্রহণ ক'রে বৃটিশের সংগে সহযোগিতা করার জন্যে দেশবাসীর কাছে তিনি আবেদন করেন :

"The Reforms Act coupled with the Proclamation is an earnest of the intention of the British people to do justice to India and it ought to remove suspicion on that score....Our duty therefore is not to subject the Reforms to carping criticism, but to settle down quietly to work so as to make them success" (Young India, Dec. 31, 1919.)

যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যে-সমস্ত দমননীতিক আইন প্রবর্তিত করা হয়েছিল, যুদ্ধ শেষেও সেগুলিকে অক্ষুণ্ণভাবে চালু রাখার পরিকল্পনায় এই রাউলাট বিলের উৎপত্তি। বৃটিশের সংগে উচ্চ মধ্য শ্রেণীর লোকেরা সহযোগিতা করলেও সমাজের তলায় অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল। যুদ্ধকালেই পাঞ্জাবের গাদর আন্দোলনের মধ্যে তার যথেষ্ট প্রকাশ ঘটে। সরকার সেই আন্দোলন কঠিন হস্তে দমন করেছিল। যুদ্ধের পরেই কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিক অবয়বে একটা দোলা লাগলো। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট বিপ্লবের আঘাতে পৃথিবীর পুঁজিতন্ত্রের একাংশ ধ্বসে পড়েছিল। তার তরংগ ভারতবর্ষে এসে-ও লাগলো। ১৯১৮ খৃস্টাব্দের শেষাশেষি এবং ১৯১৯ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে এমন ব্যাপকভাবে শ্রমিক ধর্মঘট দেশময় দেখা দিলো, যা ভারতবর্ষে এর পূর্বে কখনো আর হয় নি। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই মিলে ধর্মঘট শুরু হোলো। ক্রমেই এই ধর্মঘট ব্যাপকতর হ'য়ে ১৯১৯ সালের জানুয়ারির দিকে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্রমিকের মধ্যে পড়লো ছড়িয়ে। যুদ্ধের সময়েই সৈন্যদের মধ্যে কোথাও কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। বর্তমানে, যুদ্ধশেষে, অর্থনীতিক অবয়বটা যখন রাতারাতি চুপসে গেলো, তখন সেখানে-ও বিক্ষোভ প্রবলতর হ'তে লাগলো। নিম্ন মধ্য শ্রেণীর-ও ছিল ওই একই অবস্থা। ক্রমেই তারা অধিক পরিমাণে কর্মহীন, সম্বলহীন হয়ে পড়ছিল। স্থতরাং বৃটিশ সরকার লক্ষ্য করলো, সমগ্র দেশে একটা প্রচ্ছন্ন বিপ্লব ক্রমেই ধূমায়িত হ'য়ে উঠছে। তাই তারা গ্রহণ করলো দমন-নীতি। স্থতরাং এই দমন-নীতির প্রতিবাদ না ক'রে কংগ্রেসের উপায় ছিল না।

কিন্তু প্রায় দীর্ঘ বিগত দশ বৎসর ধ'রে কংগ্রেস নিতান্ত নরমপন্থীদের

কবলে পড়েছিল। মুসলমান মধ্য শ্রেণীর বিপ্লবী অংশ-টিও কারাগারে রুদ্ধ ছিল। সুতরাং ১৯১৬ খৃস্টাব্দে নরমপন্থী মুসলিম প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের সংগে নরমপন্থী কংগ্রেসের মিলন সম্ভব হোলো।* এই মিলনের ফলে কংগ্রেস ও মুসলেম লীগ নিতান্ত অমায়িকভাবে বৃটিশ সরকারের কাছে সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে ভারতবর্ষের আংশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করলেন। কিন্তু তলায় বিপ্লবী শক্তি যতোই জমতে লাগলো, তার উত্তাপে নরমপন্থীদের-ও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠতে হোলো। ভারতের জনসাধারণের এই অসন্তোষকে সাময়িকভাবে ক্ষান্ত করার জন্যে বৃটিশ সরকার ঘোষণা করলো যে, ভারতবর্ষকে যথাসম্ভব সত্বর স্বায়ত্তশাসনশীল ক'রে তোলার জন্যেই তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার প্রবর্তনের লোভ দেখানো হোলো। একদিকে সরকার নরমপন্থীদের যেমন মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের লোভ দেখাতে লাগলো, অন্যদিকে তেমনি চরমপন্থীদের দমনের জন্যে তারা প্রবর্তিত করতে চাইলো রাউলাট আইন। তোষণ ও শোষণের বিপরীত দুই নীতিকে একই সংগে বৃটিশ সরকার কাজে লাগাতে লাগলো। এই দ্বৈত-নীতির প্রতিফলন হিসাবেই পরিকল্পিত হোতো দ্বৈত শাসনের রীতি।

কিন্তু বৃটিশের এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল হোলো না। দেশের অর্থনীতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হ'য়ে উঠেছিল। সুতরাং দেশের জনমতকে একেবারে উপেক্ষা করা কংগ্রেসের নেতাদের পক্ষে ছিল অসম্ভব। গান্ধীজি স্থির করলেন, রাউলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যদি সত্যই আইন পাশ-হয়, তবে তিনি সত্যাগ্রহ করবেন। এই উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার অনু

---

* লখ্‌নৌ প্যাক্‌ট্।

করণে এখানেও তিনি একটি সত্যাগ্রহ কমিটি গ'ড়ে তুললেন। এমনিভাবে রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে একটি সত্যাগ্রহ বাহিনী গ'ড়ে উঠতে লাগলো।

রাউলাট কমিটির বিরুদ্ধে দেশময় আন্দোলন যেমন একদিকে তীব্র হ'য়ে উঠলো, আইন পাশ করার জন্যে সরকারের জেদ-ও যেন ততোই প্রবল হ'য়ে উঠলো। বড়লাটকে গান্ধীজি পত্র লিখে জানালেন, এ-অবস্থায় তাঁর সত্যাগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সংগঠনের জন্যে গান্ধীজি তাঁর দুর্বল শরীর নিয়েই ভারত ভ্রমণে বহির্গত হলেন। প্রথমে গেলেন মাদ্রাজ। সেখানে শ্রীবিজয় রাঘবাচারী এবং রাজাগোপালাচারীর সংগে তাঁর বহু আলাপ-আলোচনা হোলো। স্থির হোলো, দেশব্যাপী হর-তালের মধ্য দিয়েই রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালানো হবে। গান্ধীজি বলেন: "সত্যাগ্রহের সংগ্রাম আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম—ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ শুদ্ধির দ্বারাই আরম্ভ করা উচিত মনে হয়। সুতরাং ঐ দিনে সকলে উপবাস করবেন এবং নিজ নিজ কাজ কারবার বন্ধ রাখবেন।"

সমস্ত ভারতবর্ষেই এই কর্মসূচী গ্রহণের কথা স্থির হোলো। হরতালের দিন প্রথমে ধার্য হয়েছিল ১৯১০ সালের ৩০শে মার্চ। পরে ওই তারিখ এক সপ্তাহ পেছিয়ে দেওয়া হয়, ধর্মঘটের দিন স্থির হয় ৬ই এপ্রিল। ৬ই তারিখের ধর্মঘট পরিচালনার জন্যে গান্ধীজি বোম্বাই-এ ফিরে গেলেন। হরতালের তারিখ পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে দিল্লীতে গিয়ে পৌছল না। তাই ৩০শে মার্চ তারিখেই সেখানে পূর্ণ হরতাল পালিত হোলো। হিন্দু-মুসলমান অভিন্ন হ'য়ে উঠলো। শ্রদ্ধানন্দজি জুম্মা মসজিদ থেকে হিন্দু-মসলেম জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেন। কেবল রাউলাট বিলের প্রতিবাদ নয়, হিন্দু-মুসলমানের এই অভূতপূর্ব মিলন সরকারকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুললো। রেলস্টেশনে যাওয়ার পথে পুলিশে শোভাযাত্রীদের পথ আটকালো,

গুলী চালালো। নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের মধ্যে নিহত এবং আহতের সংখ্যা অল্প হোলো না। দিল্লীতে ব্যাপকভাবে শুরু হোলো পুলিশী জুলুম, সরকারী অত্যাচার। লাহোর এবং অমৃতশহরেও অনুরূপ কাণ্ড ঘটলো। চারিদিক থেকে তার আসতে লাগলো; গান্ধীজির আগমন কামনা ক'রে। ৬ই এপ্রিল গান্ধীজির নেতৃত্বে বোম্বাইএ-ও হরতাল পালিত হোলো। দেশের সর্বত্রই ধর্মানুষ্ঠানের প্রশান্ত গম্ভীর স্তব্ধতা বিরাজিত ছিল। কেবল দিল্লীতে কিছু গোলযোগ ঘটলো, তাও পুলিশের উশ্‌কানিতে। গান্ধীজি অবিলম্বে দিল্লী রওনা হলেন। কিন্তু সরকার তাঁকে পথে গ্রেফতার ক'রে বোম্বাই পাঠিয়ে দিলো। গান্ধীজির গ্রেফতারের সংবাদে ভারতীয় জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো। বোম্বাই পায়ুধুনীতে সশস্ত্র পুলিশ জনতাকে সংগীনের গুঁতোয় ছত্রভংগ করে দিলো। আমেদাবাদে শ্রমিকরা হ'য়ে উঠলো ক্ষিপ্ত। একজন সার্জেণ্টকে তারা খুন-ও ক'রে বসলো। নড়িয়াতে রেল লাইন তুলে ফেলার চেষ্টা-ও হোলো। আমেদাবাদে জারী হোলো সামরিক আইন। সরকারের নিরংকুশ জুলুম নিষ্করুণভাবে চলতে লাগলো। পাঞ্জাবে-ও দাংগা-হাংগামা শুরু হোলো, অমৃতশহরে হোলো কিছু লুটপাট, কিছু বা খুনখারাপি।

১১-ই এপ্রিল রাত্রিতে জেনারেল ডায়ার তাঁর সৈন্য সামন্ত দিয়ে অমৃত-শহর ঘেরাও করলে। ১৩ই তারিখে ছিল স্থানীয় পরব। তাই নরনারী শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে এসে জড়ো হলো জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঠে। জনতার মধ্যে কোনো প্রকার অশান্ত বিক্ষুব্ধ ভাব ছিল না। আগের দিন রাত্রিতে জেনারেল ডায়ার সভাসমিতি ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ক'রে নাকি এক হুকুম দিয়েছিল। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারেই এই নিষেধাজ্ঞা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয় নি। পুণ্য উৎসবে সমবেত জনতা আইন অমান্য করছে,

এই অজুহাতে জেনারেল ডায়ার তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে এসে পৌছলো, তারপর কোনোপ্রকার সতর্ক না ক'রেই নিরুপায় জনতার ওপর গুলী চালাতে লাগলো। দশ মিনিট কাল অবিশ্রাম গুলী চললো। জালিয়ানওয়ালাবাগের চারিদিকেই ছিল উঁচু প্রাচীর, বাইরে পালাবার পথ ছিল না। দশ মিনিটে পাঁচশত লোক নিহত হোলো, আহত হোলো আরো অনেক বেশি। এমনি ভাবেই সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের বদ্ধ প্রান্তরে হিন্দু, মুসলমান ও শিখের রক্তধারা এক জাতীয় জাগরণের ত্রিবেণী সংগমে এসে মিলিত হোলো।

কিন্তু তবু-ও সরকার ক্ষান্ত হোলো না। জারী হোলো সামরিক আইন। নিরস্ত্র জনতার উপর বিমান থেকে বর্ষিত হোতে লাগলো বোমা। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সামরিক আদালতে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অপমান ও লাঞ্ছনা করা হোলো। সংবাদ-সেবকের লৌহ পর্দা সমস্ত পাঞ্জাবের কণ্ঠ চেপে ধরলো। পাঞ্জাবের এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ নেতাদের কাছে গিয়ে পৌছতে-ও লাগলো প্রায় চার মাস। জেনারেল ডায়ারকে সরকার পুরস্কৃত করলো বিশ হাজার পাউণ্ডের একটি তোড়া দিয়ে। এমন কি হাউস অব্ লর্ডসে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডকে সরকারীভাবে সমর্থন করা হোলো। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই স্পর্ধায় সেদিন সমগ্র ভারতের মর্মস্থল ক্রুদ্ধ আক্রোশে কম্পিত হ'য়ে উঠেছিল। গান্ধীজি বিপ্লবের সংকেত দেখলেন দেশের আকাশে-বাতাসে। তখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি গান্ধীজির প্রীতি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাই জাতীয় জীবনের মহামুহূর্তেও অকস্মাৎ তাঁর অহিংসার আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হ'য়ে উঠলো। (মাত্র একবৎসর আগে পর্যন্ত তিনি তাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন!) তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর একটি বিরাট

ভুল হ'য়ে গেছে—"a blunder of Himalayan dimensions which had enabled ill-disposed persons, not true passive registers at all, to perpetrate disorders." দেশের গণ-জাগরণকে কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই নয়, দেশের পুঁজিবাদীরাও ভয় করতো। এবার তারা-ও ভীত হ'য়ে উঠলো। তাদেরই মর্মবাণী গান্ধীজির মুখে ধ্বনিত হোলো মাত্র। বৃটিশ সরকার তার রক্তাক্ত হাতখানা কংগ্রেসী নেতাদের দিকে এগিয়ে দিলো। কংগ্রেসী নেতারা সাগ্রহে তা জাপটে ধরলেন। ১৯১৯ এর ডিসেম্বর মাসে-ও তাই গান্ধী-প্রমুখ নেতাদের আমরা মণ্টফোর্ড সংস্কার গ্রহণের জন্যে উপদেশ দিতে দেখি। দেশকে, বিপ্লবের পথে নয়, শান্তি ও সহযোগিতার পথেই স্বায়ত্তশাসন আয়ত্ত করতে হবে, এই কথা বলা হয়।

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ সেদিন জেগেছিল, কেবল স্বাধীনতা-তত্ত্বের দায়ে নয়, অভাব-অনটনের দায়ে। তাই বুর্জোয়া রাজনীতিকদের তত্ত্বকথা তারা শুনলো না। ১৯১৯ সালে শ্রমিকদের যে দেশব্যাপী অসন্তোষ শুরু হয়েছিল, তা ১৯২০ এবং ২১ সালে-ও ক্রমেই তীব্রতর ব্যাপকতর হ'তে লাগলো। ১৯২০র শেষের দিকে যে অর্থ-নীতিক সংকট শুরু হোলো, তা শ্রমিক অসন্তোষে দিলো আহুতি। ১৯২০-র প্রথম ছয় মাসে শ্রমিক বিক্ষোভ চূড়ান্ত অবস্থায় এসেছিল। ঐ সময় প্রায় দুইশত ধর্মঘট হয় এবং প্রায় পনের লক্ষ শ্রমিক এই ধর্মঘটগুলিতে যোগ দেয়। এই সময়ের বিক্ষুব্ধ দেশের অবস্থা এবং তার বুর্জোয়া নেতৃত্বের মধ্যে ব্যবধানটি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ১৯২০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতে লজপৎ রায় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বলেন :

"It is no use blinking the fact that we are passing through a revolutionary period . (But) we are by instinct and tradition averse to revolutions."

এখানে দেশের বুর্জোয়া নেতৃত্ব এক উভয় সংকটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার সম্মুখে যে-পথ বিস্তারিত তা ছিল ক্ষুরধারের মতো সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক। একদিকে গণবিক্ষোভের উত্তাল তরংগ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের শ্বাপদসংকুল অরণ্য। গান্ধীজি-ই দেশীয় বুর্জোয়াদেরকে তাদের এই ক্ষুরধার পথ দিয়ে সন্তর্পণে নিয়ে চললেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদের শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে গিয়ে উঠলেন না, চললেন সমুদ্রপথে, সমুদ্রের একান্ত প্রান্তভাগ দিয়ে,—এমন একটা অবস্থায়, যদি উত্তাল তংরগ ধেয়ে আসে, তবে যেন একলাফে গিয়ে তাঁদের পক্ষে সাময়িক ভাবেও অরণ্যের আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়। তাই আমরা দেখি, গান্ধীজি জনসাধারণের নেতৃত্ব নিয়ে সেদিন যে সংগ্রাম শুরু করলেন, তার মধ্যে যেমন সংগ্রামের ভাব রইলো, তেমনি রইলো সহযোগিতার,—তা যেমন হোলো অসহযোগী, তেমনি হোলো অহিংস্মক। এই বৈপরীত্যের সংযোগ ও সামঞ্জস্য-সাধনই ছিল ভারতীয় বুর্জোয়াদের উভয় সংকট থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়। গান্ধীজির অসামান্য প্রতিভা-ই তাকে সেদিন সম্ভব করেছিল। একদিকে তিনি যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বারে বারে ঘা দিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে বারে বারে ঘা দিলেন ভারতীয় জনসাধারণকে। এবং এই উভয় প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই ভারতীয় বুর্জোয়ারা তাদের ভারসাম্য বজায় রাখলো।

এদিকে মুসলমান বুর্জোয়ারা-ও সহযোগিতার পথ থেকে সংগ্রামের পথের দিকে আসতে বাধ্য হোলো। মুসলমান বুর্জোয়াদের সংগ্রামশীল

অংশ যুদ্ধকালে কারাগারে ছিলেন। এবং সেই সুযোগে নরমপন্থী মুসলমান বুর্জোয়ারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করছিল এবং সংগ্রামী জনসাধারণকে বোঝাচ্ছিল যে, ধর্মের জন্যে—খিলাফৎ স্বার্থ-রক্ষার খাতিরেই তারা বৃটিশের সংগে সহযোগিতা করছে। কিন্তু বৃটিশ সরকার খিলাফৎ সংক্রান্ত শর্তগুলি মানতে চাইলো না। যুদ্ধশেষে চরমপন্থী মুসলমান বুর্জোয়া নেতারা-ও একে একে বাইরে আসতে লাগলেন। এদিকে হিন্দু জনসাধারণের মতোই মুসলমান জনসাধারণের-ও আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌছেছিল। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা ছাড়া মুসলমান বুর্জোয়াদের-ও আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। কাজেই হিন্দু ও মুসলমান বুর্জোয়ারা হাতে হাত মেলালেন। খিলাফৎ আন্দোলনকে হিন্দুরা তাদের নিজেদের আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করলো। (এ প্রসংগে স্মরণীয়, খিলাফতের বিষয়টি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্ততান্ত্রিক। তুরস্কের স্থানীয় জনসাধারণ একদিন স্বহস্তে খিলাফতের উচ্ছেদ করেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে প্রাচীন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ তুরস্কের জনসাধারণ তাদের সুযোগ্য নেতা মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং তুরস্কের সুলতান ও খলিফা ষষ্ঠ মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে আবদুল মজিদকে কেবল খলিফা হিসাবে রাখেন। অব্দুল মজিদের রাষ্ট্রীয় অধিকার আর কিছুই থাকে না। অবশেষে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে তুরস্কের জনসাধারণ আব্দুল মজিদকে-ও বিতাড়িত করেন এবং খিলাফতের পরিপূর্ণ উচ্ছেদ ঘটে।) ইতিপূর্বে ১৯২০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আলি ভাইএরা* তাঁদের খিলাফৎ ইস্তাহার জারী

* ১৯১৯ খৃস্টাব্দে তারা কারামুক্ত হন। তাঁরা দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক থাকায় ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তাঁদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রচুর হয়। এমন

করেছিলেন। এই ফতোয়া অনুযায়ী আলি ভাইরা এই বিষয়ে বৃটিশ সরকারের সংগে আলাপ আলোচনার জন্যে ইউরোপ যাত্রা করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে খিলাফৎ কমিটি ক্রমেই গান্ধীজি এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রভাবে আসে। ১৯২০ খৃস্টাব্দে আবুল কালাম আজাদ কারাগার থেকে মুক্ত হন। তিনি-ও অকৃপণ অকুণ্ঠিতভাবে এই খিলাফৎ এবং জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। আজকের ক্ষীণ, কর্মক্লান্ত, ভগ্নপ্রায় মানুষটিকে দেখে সেদিনের সেই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের অগ্নিদৃপ্ত যুবককে কল্পনা করা যায় না। ১৯২০-র মে মাসে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির যে সম্মেলন হোলো, তাতে গান্ধী প্রস্তাবিত অসহযোগ স্থচী গৃহীত হয়। পরের মাসেই এলাহাবাদে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নেতাদের একটি মিলিত সভায় এই প্রস্তাবকে করা হোলো সমর্থন। সমগ্র ভারতবর্ষ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমাসন্ন সংগ্রামের জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

এই সময় এলো ভারতীয় মুসলমানদের উপর চূড়ান্ত আঘাত। ১৯২০ খৃস্টাব্দের ১০ আগস্ট তারিখে খিলাফৎ-বিরোধী সেভরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হোলো। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাতে-ও অসহযোগের নীতি গৃহীত হোলো এবং উদ্দেশ্যরূপে ঘোষিত হোলো ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা এবং খিলাফতের দাবী-পূরণ।

মওলানা মহম্মদ আলি এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ ভগ্নমনোরথ হ'য়ে ১৯২০-র অক্টোবর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। বোম্বাই-এ নেমেই তিনি হিন্দু-

কি হিন্দু জনসাধারণ অনেক সময় গান্ধীজিকে কৃষ্ণের এবং আলি ভাই-দের ভীম ও অর্জুনের অবতার ব'লে বর্ণনা করতেন।

মুসলমানের মৈত্রী এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন।

১৯১৯-এর নয়া শাসনতন্ত্র অনুসারে নভেম্বর মাসে ছিল আইন সভার নির্বাচন। জনসাধারণের একটি সুবৃহৎ অংশ এই নির্বাচন বর্জন করলো। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির বয়কট-ও যথেষ্ট পরিমাণে সফল হোলো। তবে আইন-ব্যবসায়ীদের আদালত-বয়কট আশানুরূপ সফল হোলো না—মতিলাল নেহেরু এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মতো মাত্র কয়েকজন লোকই আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করলেন।

১৯২০-র ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হোলো, তাতে সংগ্রামের এই নূতন সূচী প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হোলো। কংগ্রেসের আদর্শে-ও এলো পরিবর্তন। গঠনতান্ত্রিক উপায়ে সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের স্থলে এবার লক্ষ্য হোলো শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ পথে স্বরাজ লাভ। ইতিপূর্বে কংগ্রেসের সংগঠনে যে শৈথিল্য ছিল, এবার তা সম্পূর্ণরূপে দূর ক'রে তাকে সুদৃঢ় সংঘবদ্ধ ক'রে আধুনিক দলীয় যন্ত্রের আকার দেওয়া হোলো। একটি স্থায়ী পরিচালক কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির হোলো উদ্ভব। কংগ্রেসের সভ্যরা সুদূর গ্রামে গ্রামান্তরে সর্বত্র ছড়িয়ে রইলো। কংগ্রেসের নূতন কর্মসূচীর প্রবর্তন করলেন গান্ধীজি স্বয়ং। এইরূপে তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তিভূমিতে পরিণত হোলো।

কিন্তু এই সংগ্রামের স্বরূপ কি, কর্মসূচী কি, তা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হোলো না। আইন অমান্যের মধ্যে জাতির ক্ষিপ্ত অসন্তোষ কেবলমাত্র খানিকটা ছাড়া পেলো। জাতীয় নেতারাও তার বেশি কিছু করলেন না। গান্ধীজি তাঁর শিশু-সুলভ সারল্যের সংগে ঘোষণা করলেন যে, এক বৎসর

বাদে অর্থাৎ ১৯২১ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতবর্ষ নিশ্চয় স্বরাজ পাবে। জনসাধারণ নিঃসংশয়ে তাঁর কথাগুলিকে গ্রহণ ক'রে সেই পবিত্র দিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু তরুণ নেতাদের মন থেকে সংশয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হোলো না। তখনকার রাজনীতির তরুণ উৎসাহী ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজির সংগে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকারে পুংখানুপুংখ-রূপে জানতে চাইলেন, গান্ধীজির যুদ্ধের কর্মসূচী কি, কি সুস্পষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে বিদেশী আমলাতন্ত্রের হাত থেকে ভারতবর্ষ তার স্বাধিকার লাভ করবে। কিন্তু গান্ধীজির তেমন কোনো সুচিন্তিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তাই সুভাবচন্দ্র হতাশ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'The Indian Struggle' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ

"What his real expectation was I was unable to understand. Either he did not want to give out all his secrets prematurely or he did not have a clear conception of the tactics whereby the hands of the Government could be forced."

গান্ধীজি তাঁর পরিকল্পনা গোপন রেখেছিলেন, একথা কল্পনা করাও অন্যায়। কারণ, গান্ধীজির সত্যাগ্রহী জীবনে গোপনতার—অর্থাৎ মিথ্যা-শ্রয়ের বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না। তাঁর যুদ্ধের সকল পরিকল্পনাই তিনি শত্রুপক্ষকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন। এবারেও যদি তাঁর সুনির্দিষ্ট কোন সূচী থাকতো, তবে তিনি তা দেশের জনসাধারণকে তো জানাতেন-ই এবং সরকার-ও সে বিজ্ঞপ্তি থেকে বাদ পড়তো না। তাই বুঝি গান্ধীজি বলেন, সত্যাগ্রহ 'সার্চলাইটের' মতো। সত্যাগ্রহী সত্যাগ্রহের পথে যেমন অগ্রসর হন, তাঁর আত্মার আলোতে তাঁর সম্মুখের পথটুকু তেমনি আলোকিত হ'য়ে

উঠতে থাকে। সংগ্রামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গান্ধীজির "উৎফুল্ল অস্পষ্টতার" কথা জহরলাল নেহরু-ও তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন :

"It was obvious that to most of our leaders Swaraj meant something much less than independence. Gandhiji was delightfully vague on the subject, and he did not encourage clear thinking about it either."

যাই হোক, জনগণের বিক্ষোভের বাষ্পে জাতীয় আন্দোলন গতিশীল হ'য়ে উঠলো এবং তা দুরন্ত বেগে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলো। আমরা শীঘ্রই লক্ষ্য করবো, এই বেগবান আন্দোলন-যন্ত্রকে কোন পথে চালিত করতে হবে, দেশীয় নেতাদের সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায়, বা যে ধারণা ছিল তার মধ্যে স্বত-বিরুদ্ধতা অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, আন্দোলন আপনার প্রচণ্ড গতিবেগে এমন একটি স্থানে এসে পৌছলো, যেখানে ভয়ার্ত চালক অকস্মাৎ আর্তনাদ ক'রে সমস্ত শক্তিতে ব্রেক কশে' ধরলেন। ফলে, জাতীয় আন্দোলনের বাষ্পীয় শকট কেবল থমকে থেমে দাঁড়াল না, তা আকস্মিক আঘাতে গেলো থেৎলে, হোলো খণ্ড-বিখণ্ড, বহু সম্প্রদায়ে, বহু দলে, শতধা-বিভক্ত।

১৯২১ সালে আন্দোলন ক্রমেই এগিয়ে চললো। তা কেবল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই প্রকাশ পেলো না। তার পদক্ষেপের সংগে সংগে দেশে কৃষাণ এবং শ্রমিক আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হ'য়ে উঠলো। আসাম-বেংগল রেলওয়ের শ্রমিকরা করলো ধর্মঘট, মেদিনীপুরে শুরু হোলো 'No-Tax' অভিযান, দক্ষিণ ভারতে ও মালাবারে ঘটলো মোপলা বিদ্রোহ। পাঞ্জাবে ধনী-মোহান্ত-শাসিত সরকার সমর্থিত ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিকে পবিত্র ক'রে তোলার জন্যে-ও শুরু হোলো আকালি আন্দালন।

এমনিভাবে আন্দোলন ১৯২১ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে এক অপূর্ব পরিণতির দিকে অগ্রসর হোলো। সাম্রাজ্যবাদী সরকার গেলো ঘাবড়ে; প্রথমটা তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে গেলো। তারপর স্থির করলো, ইংল্যাণ্ডের রাজাকে বা কোনো রাজবংশীয়কে দেখলে ইংরেজরা যেমনভাবে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ভারতীয়রা-ও তেমনি ওই মনুষ্যবিগ্রহদের সম্মুখে নতজানু হ'য়ে পড়বে। তাই ব্যবস্থা হোলো, ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতবর্ষে আসবেন এবং মহাসমারোহে ভারত-প্রদক্ষিণ করবেন। কিন্তু তার ফলটা হোলো সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৭-ই নভেম্বর তারিখে প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে ভারতবর্ষ অভ্যর্থনা জানালো দেশময় ব্যাপক হরতালের মধ্য দিয়ে। গভর্ণমেণ্ট এতোটা আশা করে নি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জীবন্ত প্রতীকের এই লাঞ্ছনায় তারা অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো, ভারতীয়রা-ও সরকারের নির্যাতনকে নির্বিবাদে নীরবে সর্বত্র সহ্য করলো না। অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রাম শোণিতাক্ত হ'য়ে উঠলো।

দেশে গ'ড়ে উঠলো জাতীয় সেচ্ছাসেবক বাহিনী। এই স্বেচ্ছাসেবক দলগুলি কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের অহিংস অসহযোগের ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠলে-ও, সেগুলির অধিকাংশই সামরিক কায়দায় সংঘবদ্ধ হোলো। ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর এই বিপুল দুর্দম সংঘবদ্ধতা সরকারকে আতংকগ্রস্ত ক'রে তুলেছিলো। নির্যাতনের সমস্ত অস্ত্র দিয়ে সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির বিরোধিতা করলো। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হোলো, হাজারে হাজারে মানুষ গ্রেফ্‌তার হোলো, কিন্তু আবার হাজারে হাজারে নূতন মানুষ এসে বন্দীদের শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ ক'রে স্বাধীনতা সংগ্রামের পতাকা নিয়ে দাঁড়ালো। আতংকগ্রস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর্তনাদ ক'রে উঠলো। সে আর্তনাদ ধ্বনিত হোলো স্টেটসম্যান এবং ইংলিশম্যান

পত্রিকার পাতায়। ঐ পত্রিকাগুলি চেঁচাতে লাগলো, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কলিকাতা দখল ক'রে নিয়েছে, সরকার সেখানে সিংহাসনচ্যুত, চাই আশু সাহায্য, চাই অনমনীয় সংরক্ষণ-ব্যবস্থা।

প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের কালে যে দুই-একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটেছিল, গান্ধীজি তীব্র ভাষায় সেগুলির নিন্দা করেছিলেন। বলেছিলেন, স্বরাজের দুর্গন্ধ তিনি পাচ্ছেন। তাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এখন একমাত্র আশা ছিলেন তিনিঃ হয়তো এই অহিংসার দার্শনিক ভারতের বিপুল স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীকে চূড়ান্ত সংগ্রামের পথে অগ্রসর হ'তে দেবেন না,—কারণ, সংগ্রাম শুরু হোলে হিংসাত্মক কার্য যে কিছু পরিমাণে ঘটবে-ই, তা ছিল সম্পূর্ণ অবধারিত, ইতিপূর্বেই তার নমুনা পাওয়া যাচ্ছিল। তাই সরকার সতর্কভাবে গ্রেফ্‌তার চালাতে লাগলো। চরমপন্থী নেতাদের সবাইকে একে একে ধরা হোলো। কিন্তু সরকার সাবধানে সন্তর্পণে গান্ধীজিকে এড়িয়ে গেলো। গান্ধীজিই একমাত্র মানুষ, যিনি এই বিপুল জনতার যন্ত্রকে সংযত রাখতে পারেন। তাঁর অবর্তমানে দেশের সর্বত্র এই বিপুল বিক্ষুব্ধ বাহিনীকে স্থির রাখা ছিল সরকারের পক্ষে অসম্ভব।

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই দেশের প্রায় সকল চরমপন্থী নেতাদের গ্রেফতার করা হোলো। সরকারী জেলগুলি উপছে পড়ছিল। ১৯২২-এর গোড়ার দিকে বন্দীর সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ালো। দেশময় একটা স্তম্ভিত তীব্র উত্তেজনা স্পন্দিত হ'তে লাগলো। অবরুদ্ধ শ্বাসে দেশ প্রতীক্ষা করতে লাগলো গান্ধীজির অংগুলি সংকেতের। স্পন্দনের প্রতিটি তরংগ গান্ধীজির অনুভূতিশীল অস্তিত্বে এসে ঘা দিচ্ছিল। বৃটিশ সরকারের মতোই গান্ধীজি-ও ভীত হ'য়ে উঠলেন। তিনি দেখলেন, ঈশাণের আকাশে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছে কাল বৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ মেঘ।

বর্ষণ আসবে। কিন্তু কেবল বর্ষণ তো নয়, সেই সংগে আছে ঝটিকার হাহা শ্বাস, বজ্রের-হুংকার, বিদ্যুতের অগ্ন্যুদ্গার, করকার সম্পাত। দুরু দুরু বক্ষে সে-দিন গান্ধীজি যেন মনে মনে ব'লে উঠলেন, না না, বর্ষণের প্রয়োজন নেই; ঈশানের পুঞ্জীভূত ঐ মেঘ আকাশে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাক, তৃষিত শস্যহীন রিক্ত ধরিত্রী শুকিয়ে মরুক, শুকিয়ে মরুক। সত্যই, এ সংগ্রাম তো তিনি কল্পনা করেন নি! তিনি স্বপ্ন চক্ষে যে-সংগ্রাম কল্পনা করেছিলেন, সেই দার্শনিক, কাব্যিক সংগ্রামের সংগে এর সাদৃশ্য কই? এ তো সত্যাগ্রহীর বাহিনী নয়, এ-যে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ক্ষুধিত করের কংকাল অযুত নখর বিস্তার ক'রে রয়েছে,—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নিষ্করুণভাবে ছিন্নভিন্ন ক'রে হাওয়া উড়িয়ে দেবে, আর সেই সংগে গান্ধীজির ত্যাগ, ক্ষমা ও অহিংসার মন্ত্রকে-ও! কম্পিত পদে গান্ধীজি পেছনে স'রে গেলেন। তাঁর সঞ্জীবন-মন্ত্র আজ যাকে জাগিয়েছে, তাকে তো তিনি চান নি! তাকে যে তিনি দানব ব'লে চিরদিন ভয় ক'রে এসেছেন!···

গান্ধীজির এই পশ্চাতে পদক্ষেপ প্রথম সূচিত হোলো আমেদাবাদ কংগ্রেসে। আমেদাবাদ কংগ্রেস সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার কথা বাক্যত ঘোষণা করলেও, চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশ দিলো না। চরমপন্থী নেতারা কারাগারে থাকায় কংগ্রেসের সংগ্রামশীলতা প্রচুর পরিমাণে ব্যাহত হোলো। রিপাবলিকান মুসলমান নেতা হজরৎ মোহানী যখন 'স্বরাজ'কে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি ব'লে ঘোষণা করলেন, গান্ধীজি তখন করলেন তার প্রতিবাদ। ১৯২০-র সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তাতে পরিকল্পনা ছিল চূড়ান্ত সংগ্রামের সময়ে ট্যাক্স-বন্ধের অভিযান-ও চলবে। কিন্তু আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন ট্যাক্স বন্ধের এই বিষয়টিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলো।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এবার আশার ক্ষীণ আলোক দেখতে পেলো। আমেদাবাদ কংগ্রেসের ফলাফল সম্পর্কে বড়লাট ভারত সচিবের কাছে ঐ সময় তার ক'রেছিলেন : ......"Gandhi had been deeply impressed by the rioting at Bombay as statements made by him at the time had indicated, and the rioting had brought home to him the dangers of mass civil disobedience ;" ...খিলাফত দলের এক অংশ অহিংসার পথ ত্যাগ করতে বলেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজী হন নি, সে-সংবাদ-ও ঐ তারে সানন্দে বড়লাট ভারত সচিবকে জানালেন। আরো জানালেন যে, আমেদাবাদ কংগ্রেস তাঁদের প্রস্তাবে ট্যাক্স বন্ধের কোনো উল্লেখ করেন নি। (..."ommited any reference to the non-payment of taxes .")

কিন্তু বিপ্লবের উত্তেজনায় মানুষ অধীর হ'য়ে উঠেছিল। যুদ্ধকে এখন আর কেবল মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্তের মধ্যে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ক'রে রাখা সম্ভব ছিল না। ভারতের কোটি কোটি কৃষাণ-ও এবার সাম্রাজ্যবাদের সংগে সম্মুখ সংগ্রামে এসে দাঁড়াতে চাইলো। বিভিন্ন জেলা থেকে গান্ধীজির কাছে কেবলই আবেদন অনুরোধ আসতে লাগলো, অবিলম্বে ট্যাক্স্ বন্ধের অভিযান শুরু হোক। দেশময় ট্যাক্স-বন্ধ অভিযানের অর্থ কি, গান্ধীজি বেশ বুঝলেন। দেশের জমিদার ও ধনিকদেরও স্পষ্ট বুঝতে বাকী রইলো না যে, এই অভিযানের ফলে কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে না, সারা দেশে কৃষাণ-শক্তি হ'য়ে উঠবে সংঘবদ্ধ, ট্যাক্স-বন্ধের অংশ রূপে বন্ধ হবে ভূমি-রাজস্ব, জমিদারী প্রথার হবে উচ্ছেদ—যা দেশের ধনিক শ্রেণী কোনো মতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। কিন্তু ট্যাক্স-বন্ধের অভিযানে

অনুমতি না দেওয়ার বিপদ-ও তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন। কংগ্রেসের বিনা অনুমতিতেই গুন্টুর জেলায় ট্যাক্স-বন্ধের অভিযান শুরু হ'য়ে গেলো। সংগ্রামের নেতৃত্ব যে বুর্জোয়াদের আঙুলের ফাঁকে কৃষাণ ও শ্রমিকদের হাতে চ'লে যাচ্ছে, এ-কথা বুর্জোয়া নেতারা আতংকের সংগে অনুভব করলেন। গুন্টুর জেলার উপর অবিলম্বে উপরওয়ালা কংগ্রেসের হুকুম হোলো, আইনত সমস্ত ট্যাক্স মিটিয়ে দিতে। কিন্তু কংগ্রেস এবং গান্ধীজি ভয় পেলেন যে, দেশের এই উত্তেজিত অবস্থায় তাদের বৈপ্লবিক গতিকে কঠিন হস্তে প্রতিরোধ করা-ও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাঁরা আবিষ্কার করতে চাইলেন একটা সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্, একটা ভ্যাকুয়ম ব্রেক—যার পথে দেশের বিপ্লবের প্রচণ্ড পুঞ্জীভূত বাষ্পকে ধীরে ধীরে সন্তর্পণে শিথিল এবং শূন্য করা সম্ভব হবে। অহিংসার নামেই এই মহৎ কার্যটি সম্পন্ন হ'তে চললো। স্থির হোলো, বারদৌলি জেলাতেই এই ট্যাক্সবন্ধের অভিযান প্রথমে শুরু হবে। ঐ সময় বারদৌলির জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৮৭,০০০—অর্থাৎ ঐ সময়ের ভারতীয় জনসংখ্যার হাজার ভাগের চার ভাগ!

পরিকল্পিত বারদৌলি সত্যাগ্রহের কথা ভারতীয় বিপ্লবী জনসাধারণকে জানানো হোলো। প্রতারিত জনসাধারণ তাদের নেতাদের উপর স্থির নির্ভরে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। ১৯২২-এর ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে গান্ধীজি বড়লাটের কাছে তাঁর সত্যাগ্রহী কায়দায় চরমপত্র পাঠালেন। কিন্তু এর মাত্র কয়েকদিন পরে-ই দেশীয় নরমপন্থী বুর্জোয়া নেতাদের একটা সুযোগ মিলে গেলো। যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামে জনসাধারণের সংগে পুলিশের বাধলো সংঘর্ষ। ফলে, জনতা পুলিশের ফাঁড়ি পুড়িয়ে দিলো এবং বাইশ জন পুলিশ নিহত হোলো। এর মধ্যে জনতার জয়ই সূচিত হয়েছিল। এই সংবাদ ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার সংগে

সংগে গান্ধীজি অনুভব করলেন, আশু ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দেশের সর্বত্রই হাজার হাজার চৌরিচৌরা অনুষ্ঠিত হবে, গান্ধীজির অহিংসা যাবে ভেসে, সহযোগী বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব হবে লুপ্ত, বিপ্লবের নিষ্করুণ রক্তাক্ত পথে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জন করবে। ১২-ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হন্তদন্তভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি মিটিং ডাকা হোলো, তাতে "চৌরিচৌরায় জনতার অমানুষিক কার্যাবলীর"-র করা হোলো তীব্র নিন্দা। গান্ধীজি কঠিন হস্তে বিপ্লবের ব্রেক ক'শে ধরলেন। কেবল ব্যাপক আইন অমান্য নয়, অবিলম্বে সকল প্রকার আইন অমান্যই বন্ধ ক'রে দেওয়া হোলো, অজুহাত দেখানো হোলো, অহিংস সংগ্রামের জন্যে দেশ প্রস্তুত নয়।

সমস্ত ভারতবর্ষ হতবাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো। মতিলাল নেহরু, লজপৎ রায় প্রভৃতি নেতারা কারাগার থেকে গান্ধী এবং গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। গান্ধীজি তাঁদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করলেন না, জানালেন, কারারুদ্ধ নেতাদের কোনো নাগরিক অধিকার নেই, তাঁদের উপদেশ শ্রোতব্য নয়—তাঁরা 'civilly dead.'

এমনিভাবেই সেদিন নিতান্ত খাপছাড়াভাবে ভারতীয় সংগ্রামের এক অধ্যায় সমাপ্ত হোলো। রজনী পাম দত্তের ভাষায় "The battle was over. The whole campaign was over. The mountain had indeed borne a mouse."

সংগ্রামকে এমনি আকস্মিকভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ায় দেশময় প্রচুর বাকবিতণ্ডা, অসন্তোষ, বিক্ষোভ দেখা গেলো। গান্ধীজি নিজের এই কাজে যে সহজে খুশী হ'য়েছিলেন, তা-ও বলা যায় না। কারণ, এর

পরেই আমরা গান্ধীজির মধ্যে কারাবরণের জন্যে একটি উদগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করি। গান্ধীবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও সমর্থক রোম্যাঁ রোলাঁ-ও গান্ধীজির ঐ সময়কার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করেন: "তিনি কাতরভাবে বন্দীত্বই কামনা করিতেছিলেন।...তিনি বলেন, কারাগার তাঁহাকে 'শান্তি' ও 'বিশ্রাম' দিবে। সম্ভবত, এই বিশ্রামেও তাঁহার প্রয়োজন ছিল।" কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ সময় তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন ছিল শহীদত্বের। তিনি আকস্মিকভাবে বেগবান যুদ্ধাশ্বের বল্গা আকর্ষণ ক'রে দেশবাসীকে যে আঘাত দিয়েছিলেন, তাকে মহিমান্বিত ক'রে তোলার জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল আত্ম-নির্যাতনের। কারাবরণের মধ্যেই ছিল এই আত্ম-নির্যাতনের সুযোগ। এবার সরকারও তার সুবিধামতো গান্ধীজিকে সে সুযোগ দিলো। ১০ই মার্চ তারিখে গান্ধীজি বন্দী হলেন। বিচারে তাঁর ছয় বৎসরের কারাদণ্ড হোলো।

গান্ধীজি দুই বৎসরের কম কারাগারে ছিলেন। তিনি কারাগারের বাইরে এসে দেখলেন, ভারতের বিশাল প্রান্তরে বিপ্লবের যে মহাসৌধ তিনি নির্মাণ ক'রেছিলেন, সারা দেশে আজ তার ভগ্নস্তূপ প'ড়ে রয়েছে— সেখানে অজস্র অবাঞ্ছিত লতাগুল্ম জন্মেছে, তা হয়েছে অসংখ্য শ্বাপদ-সর্পের বাসা!

জানি না, দেশব্যাপী বিপ্লবের মর্মান্তিক ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গান্ধীজির সেদিন কী মনে হয়েছিল, সেদিন আবার ঐ মহাসৌধকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন কিনা! তবে, ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে তাঁকে অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল, তা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

তেরো

আগেই আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় বুর্জোয়াদের বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তা খৃস্টান ধর্মবিরোধী গোঁড়ামিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এখন গান্ধীজি এবং সহযোগী বুর্জোয়ারা যখন একান্ত আকস্মিক ভাবেই সংগ্রামের বল্গা আকর্ষণ করলেন, তখন বৃটিশ-বিরোধ এবং স্ব স্ব ধর্মপ্রীতির ভারসাম্য আর রইলো না। হিন্দু এবং মুসলমান বুর্জোয়াদের বিরাট দুই অংশ সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিলো। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু মহাসভার ঘটলো উত্থান।* মুসলিম লীগ-ও নিজেকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করলো। দেশে প্রবল হ'য়ে উঠলো সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা। দেশের জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তিকে অকস্মাৎ অবরুদ্ধ করায় তা আত্মকলহে পরিণত হোলো। বৃটিশ-বিরোধী হিংসার দমন-ই সাম্প্রদায়িক আত্মঘাতী হিংসার রূপ গ্রহণ করলো। কেবল এই একবারই নয়, বর্তমান কালে যতোবার সাম্প্রদায়িক দাংগা-হাংগামা ঘটেছে, প্রতিবারই তার পশ্চাতে ছিল জনসাধারণের এই বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তি এবং বুর্জোয়া নেতৃত্বের কাপুরুষ স্বার্থান্ধ সহযোগিতা। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু-ও সাম্প্রদায়িক কলহের এই কারণকে তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে একরকম স্বীকার ক'রে নিয়েছেন :

"The drift to sporadic and futile violence in the political struggle was stopped, but the suppressed violence had to find a way out, and in the follow-

* এই প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানটি যে একদা গান্ধীজির মৃত্যুর জন্যে দায়ী হয়েছিল, এ প্রসংগে তা স্মরণীয়। এ-ও স্মরণীয় যে, জনসাধারণের সংগ্রামী শক্তি প্রতিরোধ করতে গিয়ে একদা গান্ধীজিই পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছিলেন।

ing years this perhaps aggravated the communal trouble."

ইতিমধ্যে ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে নবজাগ্রত তুরস্ক আব্দুল মজিদকে দূর ক'রে খিলাফতের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়েছিল। ফলে ভারতীয় মুসলমান বুর্জোয়ারা যে-সামন্ততান্ত্রিক কারণটিকে তাঁদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার কারণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা আর রইলো না। খিলাফতের প্রতি নবজাগ্রত তুরস্কের ঘৃণা এবং ভারতীয় মুসলমানদের প্রীতি এমন একটা বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, যাতে মোসলেম বুর্জোয়া নেতৃত্বের হাস্যস্পদ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং মুসলমান নেতারা জনসাধারণের কাছ থেকে নিজেদের এই প্রতিক্রিয়াশীল হাস্যাস্পদ রূপটিকে গোপন করার জন্যে জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে লাগলেন যে, হিন্দুরাই মুসলমান জনসাধারণকে প্রতারিত করেছে। প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিন্দুমহাসভা-ও ঠিক ওই এক-ই কৌশল অবলম্বন করলো। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের অনেকেই, বিশেষত জমিদার শ্রেণী,—রাজস্ব বন্ধের অভিযান বন্ধ করা যাঁদের জন্যে একান্ত প্রয়োজন ছিল,—তাঁরা-ও কংগ্রেসকে তিরস্কৃত করলেন। তিরস্কারের কারণ অবশ্য আসলে ছিল বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম নয়,—বৃটিশ-বিরোধী মোসলেম-বিরোধী সংগ্রামের ছদ্মবেশে হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করা।

কংগ্রেসের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল অংশ, যাঁরা বৃটিশের সংগে সহযোগিতা চান, অথচ হিন্দুমহাসভা বা মুসলেম লীগের মতো সামন্ততান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে চান না, তাঁরা-ও দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে গেলেন। একদল গান্ধীজির নেতৃত্বে বা তাঁর অবর্তমানে তাঁর প্রিয় শিষ্য রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্র প্রসাদ, বল্লভভাই প্রভৃতির পরিচালনায়

সংস্কারমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করতে চাইলেন। সংস্কারমূলক কার্যের মধ্যে প্রধান ছিল 'গ্রামোন্নয়ন,' চরকায় সূতা কাটা, পাননিরোধ, অস্পৃশ্যতাবর্জন ইত্যাদি। পূর্বে বৃটিশের সংগে প্রত্যক্ষ সহযোগিতার যে নীতিকে কংগ্রেস বর্জন করেছিল, এঁরা এখনো সেই নীতিকে বর্জন করতে চাইলেন, অর্থাৎ আইন সভায় বা শাসনকার্যে যোগদানের বিরোধিতা করতে লাগলেন। তাই এঁদের নাম হোলো No-changers. অন্যপক্ষে, চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল নেহরু প্রভৃতির নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসী আইন সভায় যোগ দিতে চাইলেন। কারণ হিসাবে তাঁরা দেখালেন "uniform and consistent obstruction." এই দলের নাম হোলো Pro-changers. Pro-changers বা পরিবর্তনপন্থীরা কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজ্য-দল গঠন করলেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে স্বরাজ্যদলের কাছে কংগ্রেস আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হোলো। সাময়িকভাবে গান্ধীজি রাজনীতির পুরোভাগ থেকে পশ্চাতে স'রে এলেন।

স্বরাজ্যপন্থীরা-ও আবার গণদেবতার নাম নিতে লাগলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ ঘোষণা করলেন, "শতকরা ৯৮ জনের জন্যে স্বাধীনতা" চাই। অবশ্য সেই সংগে তিনি একথা-ও ঘোষণা করলেন যে, জমিদারদের প্রতি যদি অবিচার হয়, তবে সে ন্যায়বিচারের কোনো মূল্যই নেই—"...poor indeed will be the quality of that justice, if it involves any injustice to the landlord."

অবিরাম প্রতিরোধের উচ্চাদর্শ প্রচার ক'রে স্বরাজ্যদল জনসাধারণের ভোটের জোরে আইন সভায় ঢুকে পড়লো। অবশ্য, আইন সভায় ঢুকেই তাদের কণ্ঠে বাজলো বেসুরো। দলের নেতা হিসাবে চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করলেন: "His party has come there to offer their co-

operation." নরমপন্থী উদারনীতিকরা, যাঁরা সংগ্রামের সূচনায় কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা-ও এবার স্মিতহাস্যে কর প্রসারিত ক'রে এগিয়ে এলেন, জানালেন, তাঁদের সংগে, স্বরাজ্যদলের সংগে আর কোনো মতান্তর নেই। এইভাবে কংগ্রেসের এই অংশটি-ও সংগ্রামের প্রশস্ত রাজপথ ত্যাগ করলো।

ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন এইভাবে খণ্ডবিখণ্ড, দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, তখন বৃটিশ তার শোষণ ও শাসনের রজ্জুটিকে কঠিন হস্তে কসে ধরলো। এলো কারেন্সি বিল, যার ফলে টাকার দাম হোলো এক শিলিং ছ পেন্স। এলো ১৯২৭-এর নয়া স্টীল প্রটেক্শন বিল। সংগ্রামের অব্যবহিত পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি কৃপাকটাক্ষের যে ভাণ ক'রেছিল, তার ফলরূপে ১৯২৪ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত হ'য়েছিল স্টীল প্রটেকশন আইন। এই আইন অনুসারে ভারতীয় লৌহ-শিল্পকে বাইরের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা ক'রে গ'ড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছিল। এখন বৃটিশ ইস্পাতকে সেই সংরক্ষণ থেকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা হোলো। বৃটিশের এই অকৃতজ্ঞতায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা হোলো ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝেছিল, ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই ছিন্নভিন্ন অবস্থাতেই তাকে হীনবল করা প্রয়োজন। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে ঘোষিত হোলো যে, ভারতের নয়া গঠনতন্ত্রের ভাগ্যবিধাতা হ'য়ে আসছেন সাইমন কমিশন। ভারতীয় বুর্জোয়াদের অপমান এবার দুঃসহ হ'য়ে উঠলো, কারণ, অকৃতজ্ঞ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই কমিশনে ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোনো প্রতিনিধিই গ্রহণ করলো না। সুতরাং, ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে সহযোগিতা করা অসম্ভব হ'য়ে উঠলো, কাজেই আবার তারা একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে-ও জনগণের দোরে ধর্ণা দিলো।

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে জনগণের মধ্যে অনেকখানি প্রকৃতিগত পরিবর্তন এসেছিল। দেশের কৃষাণ ও মজুররা নিজেদের নেতৃত্বে সংগ্রাম করার জন্যে হ'য়ে উঠছিল সংঘবদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-ও সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল। সুতরাং অসন্ন শ্রমিক বিপ্লবকে প্রতিরোধ করার জন্যে তারা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তার প্রমাণ মিলেছিলো ১৯২৪ খৃস্টাব্দের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায়। ১৯২৬-২৭ খৃস্টাব্দে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস্ পার্টির কর্মতৎপরতার মধ্যে দেশের সংগ্রামী শক্তি আত্মপ্রকাশ করলো। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে দেশময় গণ-বিক্ষোভ দেখা দিলো বিপুলায়তন শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে এই শ্রমিক শ্রেণী-ই সকলের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বামপন্থীদেরই হোলো জয়। সমাসন্ন গণবিপ্লবের এই উত্তপ্ত চেতনা তরুণ বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে-ও সংক্রামিত হোলো। ইউরোপ থেকে সদ্য-প্রত্যাগত পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সোস্যালিস্ট হ'য়ে উঠলেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন সুভাষ চন্দ্র বসু। তরুণ বুর্জোয়া নেতারা অকস্মাৎ কৃষাণ-শ্রমিকের আন্দোলনে মেতে উঠলে-ও তন্দ্রাত্যাগী ভারতীয় গণশক্তিকে শ্রমিক-বিপ্লবের পথ থেকে বুর্জোয়া-আন্দোলনের পথে ফিরিয়ে আনার শক্তি তাঁদের মধ্যে-ই যে নিহিত আছে, তা প্রধান বুর্জোয়া নেতারা-ও অনুভব করলেন। এবং এই অনুভূতি ও দূরদৃষ্টি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলো স্বয়ং গান্ধীজির মধ্যে—যখন ১৯২৯ সালে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন প্রত্যাখ্যান ক'রে সেখানে সাদরে স্থাপিত করলেন পণ্ডিত জহরলালকে, এবং ঘোষণা করলেন :

"He is modest and practical enough not to turn to

extremes. In his hands the nation is perfectly secure." নেশন, অর্থাৎ ভারতীয় বুর্জোয়ারা।

এইভাবে জাগ্রত গণ-শক্তিকে বুর্জোয়া নেতারা যেমন একদিকে নিজেদের করায়ত্ত রেখে সংযত করতে চাইলেন, তেমনি অন্যপক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ শ্রমিক আন্দোলনকে পংগু ও নেতৃত্বহীন ক'রে দেওয়ার জন্যে ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক নেতাদের-ও করলো গ্রেপ্তার।* (তরুণ বুর্জোয়া সোস্যালিস্টদের তারা অংগস্পর্শ করলো না, কারণ, এঁরা যে গণ-শক্তির সেফ্‌টি ভাল্‌ভ মাত্র, তা ভারত সরকার ভালো ভাবেই বুঝতো।) মীরাটে ধৃত শ্রমিক নেতাদের বিনা বিচারে দীর্ঘ চার বৎসর কাল অবরুদ্ধ রাখা হোলো। এঁদের বিচার-ই ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা রূপে বিখ্যাত হয়েছে।

এই সময় নরমপন্থীদের পরিচালনায় ভারতীয় বুর্জোয়ারা বৃটিশের সংগে সহযোগিতার চেষ্টা-ও চালাতে লাগলেন। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হোলো। ১৯২৯ খৃস্টাব্দে পৃথিবীর সমগ্র অর্থনীতিক অবয়বে যে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, তার দোলা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে যেমন ঘা দিয়েছিল, তেমনি ব্যস্ত ক'রেছিল ভারতীয় বুর্জোয়াদের। সুতরাং ভারতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আবার একবার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। ভারতীয় গণশক্তি নেতৃত্বহীন অবস্থায় (শ্রমিক নেতারা তখন কারাগারে) তরুণ বুর্জোয়া সোস্যালিস্টদের পরিচালনায় আবার একবার বুর্জোয়া সংগ্রামের বোঝা বইতে এগিয়ে এলো। সুযোগ বুঝে কংগ্রেস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। কংগ্রেসের দাবী

* ১৯২৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে।

রূপে ঘোষিত হোলো পূর্ণ স্বাধীনতা। ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারী তারিখে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত অক্লান্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষিত হোলো দেশের সর্বত্র। কিন্তু এই স্বাধীনতা সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা কখনো ভারতীয় বুর্জোয়া নেতাদের ছিল না। তখনো গান্ধীজিকে সহযোগী সংস্কারপন্থী হিসাবে-ই আমরা দেখি।

দেশে গণশক্তির অভ্যুদয়ের সংগে সংগে গান্ধীজিকে আবার একবার সংগ্রামের ক্ষেত্রে ছুটে আসতে হোলো। দেশীয় বুর্জোয়া নেতারা স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন, এবার ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে যে গণশক্তি প্রস্তুত হয়েছে, তা বিপুল আক্রোশে ফেটে পড়বে এবং সেই বিস্ফোরণে কেবল বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারত থেকে নিশ্চিহ্ন হবে না, ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ-ও সেই আলোড়নে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হ'য়ে যাবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় বুর্জোয়াদের কোণ-ঠাসা করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। সেজন্যে ভারতীয় বুর্জোয়া নেতাদের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে মিতালি করা-ও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বকে এবার এমন পথে অগ্রসর হ'তে হোলো, যেখানে ভারতীয় গণশক্তি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এই উভয় যুধ্যমান বাহিনীকে-ই শক্তিহীন ও সংযত করা সম্ভব হবে। এজন্যে বুর্জোয়া নেতারা আবার গণশক্তির প্রতি তাঁদের অবারিত বন্ধুত্বের ছদ্মবেশ গ্রহণ করলেন, যদি-ও আসলে তাঁদের প্রীতিটা রইলো বৃটিশ বুর্জোয়াদের প্রতি-ই উন্মুখ হ'য়ে। কিন্তু ভারতীয় বুর্জোয়াদের সেই উদ্‌গ্রীব উন্মুখ প্রীতির আগ্রহকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে গ্রহণ করতে পারলো না। কারণ, সমগ্র পৃথিবীর পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিক অবয়বে তখন এমন একটা ভাঙন এসেছে, যাকে রোধ করার জন্যে সর্বত্র পুঁজিবাদ

করেছে আপ্রাণ চেষ্টা। ইতালিতে মুসোলিনির হয়েছে জন্ম, জার্মানীতে হিটলার হয়েছেন গর্ভস্থ, জাপান সাম্রাজ্যবিস্তার ক'রে তার পুঁজিবাদকে জীইয়ে রাখার সংকল্প করছে। বৃটেনের পুঁজিতান্ত্রিক তরী-ও তখন টলায়মান, তাই রক্ষণশীল দল সহজে আসন্ন গণ-বিপ্লবের ঘনঘোর দুর্যোগে বৃটিশ শাসনযন্ত্রের হাল ছদ্মবেশী বুর্জোয়া নেতৃত্বের—শ্রমিক দলের—হাতেই ছেড়ে দিয়েছে এবং 'পরম সোস্যালিস্ট' শ্রমিক দলের নেতা ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রধান মন্ত্রীর আসন থেকে ভারতবর্ষে শ্রমিক দলনের সুব্যবস্থা করছেন। ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের এই দ্বিমুখী অভিযান বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে গান্ধীজির কেবল কার্যকলাপেই নয়, লেখনী-মুখেও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি বড়লাটকে যে পত্র লেখেন, তাতে তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি জানান :

"The party of violence is gaining ground and making itself felt..."

"It is my purpose to set in motion that force (non-violence) as well against the organised violence force of the British rule as the unorganised violence force of the growing party of violence."

ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাকে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বে-ই গ্রহণ করেছিল। কারণ, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে বিদেশী বুর্জোয়াদের প্রতি বৈরিতা যতোই প্রবল হোক না কেন, তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, গোত্র এবং রক্তের একটা নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তারা একই বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আর গণশক্তি তাদের বিপরীত শক্তি, তাদের আসল শত্রুতা ওদের সংগেই। তাই সাম্রাজ্যবাদের জলোচ্ছ্বাসের

ভয়ে ভারতীয় বুর্জোয়ারা যখন গণ-অভ্যুত্থানের অত্যুংগ শিখরে এসে আশ্রয় নিলো, তখন তারা মোটেই নিশ্চিন্ত হোলো না। কারণ, প্রতি মুহূর্তে তারা অনুভব করছিল এই শিখরের অভ্যন্তরে বিপুল-বিস্তৃত সুদূর-শায়িত এক আগ্নেয়গিরির নিহিত স্পন্দন—যে-আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের আলোড়নে কেবল সমুদ্রই সুদূরে বিক্ষিপ্ত হবে না, এই আশ্রয়ী মানুষগুলো-ও হবে নিশ্চিহ্ন। তাই ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব সাময়িকভাবে গণ-অভ্যুত্থানের আগ্নেয়গিরির শিখরে এসে আশ্রয় নিলে-ও কেবলই তারা প্রতীক্ষা করতে লাগলো সেই শুভ মুহূর্তের, কখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমুদ্র শান্ত হবে, সদয় হবে, কখন আবার ওরা নির্ভয়ে তার চিরবাঞ্ছিত ক্রোড়ে ফিরে যেতে পাবে!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা গান্ধীজি গোড়া থেকেই করতে লাগলেন। যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তিনি সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন, তাঁর এগারো দফা শর্ত—যে শর্তগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে—ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামের কথা কংগ্রেস মুখে বললে-ও বস্তুত সেরকম কোনো সদিচ্ছা তাদের নেই। রজনী পাম দত্তের ভাষায়, এ ছিল কংগ্রেসের "A kind of conventional maximum at the opening of a traditional bazar haggling...."

কিন্তু দেশের শ্রমিক ও কৃষাণ জনসাধারণ সত্য-সত্যই স্বাধীনতার জন্যে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল, যদি-ও তারা ছিল নেতৃত্ববিহীন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অতি সতর্কতার সংগেই তার এই অকরুণ শত্রুদের মীরাট ষড়যন্ত্রের নামে বিনা বিচারে পূর্ব থেকে আটক রেখেছিল। সুতরাং দেশের নবজাগ্রত শ্রমিক, কৃষাণ, মধ্যবিত্ত বিপ্লবী জনসাধারণ কংগ্রেসের অবিশ্বস্ত নেতৃত্বকেই গ্রহণ করলো। গান্ধীজি তাঁর আশ্রম-কুঞ্জ থেকে আবার সমর প্রাংগনে এসে দাঁড়ালেন। দশ বৎসর পূর্বে যেমনটি ঘটেছিল আবার ঘটলো তেমনিটি—

গান্ধীজি এবং তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের হাতেই যুদ্ধ চালনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হোলো।

গণ-শক্তিতে বুর্জোয়াদের যে-ভয়, সেই ভয় গান্ধীজির মধ্যে-ও সম্পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল, কেবল তা মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছিল ধর্ম এবং দার্শনিকতার নামে। গণ-শক্তির প্রতি এই ভীতির নাম হয়েছিল অহিংসা। অনধিক দশ বৎসর পূর্বে গান্ধীজি গণ-বিক্ষোভের পুঞ্জীভূত বাষ্পকে ধীরে ধীরে ক্ষয় ক'রে বিস্ফোরণ এড়াতে চেয়েছিলেন, এবার-ও করলেন ঠিক তাই। বারদৌলির ঘটনার প্রকারান্তরে পুনরাবৃত্তি হোলো। আন্দোলনে দেশের জনসাধারণকে সহজে অংশ গ্রহণ করতে তিনি দিলেন না। তিনি লবণ আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে ডাণ্ডী অভিযান করলেন, সংগে নিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শিষ্য। কেবল তাই নয়, দেশের গণ-বিক্ষোভকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করার উদ্দেশ্যে তাঁর এই 'অভিযান' তিন সপ্তাহ ধ'রে চললো। এই ভাবে আসন্ন বিপ্লবের প্রতীক্ষায় সমগ্র ভারত যখন উত্তেজনার আবেগে অধীর হ'য়ে উঠেছে, গান্ধীজি তখন তাঁর মুষ্টিমেয় শিষ্যসমভিব্যহারে তাঁর 'ডাণ্ডী-যাত্রা'-র দার্শনিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন! অবশেষে ৬ই এপ্রিল তারিখে লবণ আইন আরো সমারোহের সংগে অনুষ্ঠিত হোলো। বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে গান্ধীজিকে বাধা দিলেন না। দশ বৎসর পূর্বে তাঁরা যেমনটি করেছিলেন, এবার-ও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রথমে চরমপন্থী নেতাদের গ্রেফ্‌তার ক'রে নিলেন। এমন কি, স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই বামপন্থী জাতীয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসুকে সরকার কারারুদ্ধ ক'রেছিলেন। অথচ আইন অমান্যের জন্যে গান্ধীজিকে তাঁরা গ্রেফ্‌তার করলেন না, বরং ডাণ্ডী অভিযানকে সংবাদপত্রে ও সিনেমায় বিজ্ঞাপিত করার সম্পূর্ণ সুযোগ দিলেন। কেউ যদি মনে করেন, গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের জন্যেই তাঁকে

গ্রেফ্‌তার করতে সরকার ভয় করছিলেন, তবে ভুল করবেন। এখনো দেশের বিক্ষুব্ধ গণ-শক্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাকে সংযত নিয়ন্ত্রিত রাখার সামর্থ্য ছিল এই একটিমাত্র মানুষের, একথা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভালো ক'রেই জানতো। আমরা পরে লক্ষ্য করবো, সরকার যখনই দেখেছে যে, দেশের বিক্ষুব্ধ গণশক্তি গান্ধীজির আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখনই বিনা দ্বিধায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় এই মানুষটিকে তারা গ্রেফ্‌তার করেছে।

গান্ধীজি কেবল যে দার্শনিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাল হরণ করলেন তা নয়, তিনি সংগ্রামের জন্যে এমন একটি স্থূচী গ্রহণ করলেন, যা বিপ্লবী জনসাধারণকে হতাশ করলো : লবণ আইন অমান্য করা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা, বিলাতী বস্ত্রের এবং বিলাতী মদের দোকানে পিকেটিং করা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা, স্কুল-কলেজ ও আদালত বয়কট করা। কৃষাণ ও শ্রমিকদের তিনি এই আন্দোলন থেকে সতর্কতার সংগে দূরে রাখতে চাইলেন। কিন্তু এই সংকীর্ণ সংগ্রাম-সূচীর পথ বয়ে বিপ্লবের প্লাবন আসা, হোক তা যতোই অহিংস্রক, সম্ভব ছিল না। সুতরাং দেশে অশান্ত উত্তেজনা ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠতে লাগলো। শ্রমিকরা ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করলো, কৃষাণরা বহু স্থলে স্বতস্ফূর্তভাবে শুরু করলো রাজস্ব বন্ধ আন্দোলন, বাংলা দেশে ঘটলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, সীমান্ত প্রদেশে জনসাধারণ কয়েক দিনের জন্যে পেশোয়ার শহর অধিকার ক'রে রইলো। ফলে, বৃটিশ সরকার স্পষ্টই বুঝলো, দেশের আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং গান্ধীজিকে মুক্ত রাখার আর কোনো প্রয়োজন তাদের কাছে রইলো না। ৫ই মে তারিখে গান্ধীজি গ্রেফ্‌তার হলেন।

গান্ধীজির গ্রেফ্‌তারের সংবাদ দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লো। ধর্মঘট, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভপ্রদর্শনের তরংগ উত্তাল হ'য়ে উঠলো সর্বত্র। বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর শহরের ১ লক্ষ ৪০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ছিলেন কাপড়ের কলের শ্রমিক। তাঁরা তিন সপ্তাহ কালের জন্যে শোলাপুর সম্পূর্ণ অবরোধ ক'রে রাখলেন।

গভর্ণমেন্টের দমননীতি-ও চূড়ান্ত অবস্থায় এলো। অর্ডিন্যান্সের পর পাশ হোলো অর্ডিন্যান্স, জারী হোলো সামরিক আইন, কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হোলো অবৈধ। দেশে গ্রেফ্‌তারের সংখ্যা ৯০ হাজারে গিয়ে পৌছলো। কিন্তু কারাগারে-ও তিল ধারণের ঠাঁই রইলো না, সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্যে অনেকগুলি জেল তৈরী ক'রে নেওয়া হোলো, কিন্তু তাতে-ও স্থান সংকুলান হয় না। সরকার এবার গ্রেফ্‌তারের চেয়ে দৈহিক নির্যাতনের উপরই বেশি জোর দিলো। চললো লাঠি, বেত, চাবুক, গুলী। হত ও আহতের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চললো। কিন্তু ভারতের বিপ্লবী শক্তি তাতে-ও বিন্দুমাত্র টললো না; তার অগ্রগতি অব্যাহত রইলো। এবং তা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করলো শ্রমিক-কেন্দ্র বোম্বাইএ। এখানে পুলিশের হিংস্র তৎপরতা-ও যেমন ছিল, জনসাধারণের শক্তি-ও ছিল তেমনি দুর্বার। বোম্বাই-এর কয়েকটি রাস্তা জনসাধারণ বার বার কয়েক বার অধিকার ক'রে নিলো। কংগ্রেস নেতারা জনসাধারণকে শান্তিপূর্ণভাবে চ'লে যাবার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ মানুষের তরংগ ক্রমেই উত্তাল উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো। কংগ্রেস পতাকার পাশে দেখা যেতে লাগলো, শ্রমিকদের বিপ্লবী রক্ত পতাকা। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের ভীতি-বিহ্বল আর্তনাদ ধ্বনিত হোলো। গণ-শক্তির এই

অভ্যুত্থান বৃটিশ বুর্জোয়াদের সংগে সংগে ভারতীয় বুর্জোয়াদের-ও আতংকিত ক'রে তুললো। বৃটিশ এবং ভারতীয় বুর্জোয়ারা একযোগে মিল ওনার্স এসোসিয়েশন এবং চেম্বার অব কমার্সের মারফৎ ভারতকে অবিলম্বে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন-প্রদানের দাবী জানালো। ভারতীয় বুর্জোয়াদের সংগে বৃটিশ বুর্জোয়াদের ঐক্যতানের প্রতিধ্বনি শীঘ্রই পাওয়া গেল রাজনীতিক মহলে-ও। ভারত সরকার গান্ধীজির সংগে আপোষ-মীমাংসার আলাপ-আলোচনা চালাতে লাগলো। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আলাপ-আলোচনার জন্যে গান্ধীজি এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। নেতাদের সংগে সন্ধির আলোচনায় এবং তাঁদের প্ররোচনায় গণ-বিক্ষোভ অনেকখানি প্রশমিত হোলো। তখনো ভারতীয় জনসাধারণ কংগ্রেসী নেতৃত্বের স্বরূপ বুঝতো না, তার ওপর তাদের ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস, অটল নির্ভর। ৪ঠা মার্চ তারিখে গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হোলো। সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্থগিত রইলো।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করলো। এমন কি লবন-আইনটি পর্যন্ত বাতিল হোলো না। অথচ কংগ্রেসকে তার আইন অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হোলো। যে-গোল টেবিল বৈঠক কংগ্রেস একদা বর্জন করেছিলেন, এই চুক্তির ফলে তাতেই তাঁরা সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করতে ছুটলেন। এই চুক্তির ফলে ভারত বস্তুত স্বায়ত্ত-শাসনের বিন্দুমাত্র কিছুই পেলো না।

চুক্তির মধ্যে দুর্বলতা এবং পরাজয় যে ছিল, কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তাড়াহুড়া ক'রে করাচীতে কংগ্রেসের এক

অধিবেশন হোলো, এই চুক্তিকে সর্বসম্মতির মধ্য দিয়ে শুদ্ধ গ্রহণীয় ক'রে তোলার উদ্দেশ্যে। বুর্জোয়া নেতৃত্বের তরুণ চরমপন্থী অংশ থেকে-ও প্রতিবাদ আসার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং সে সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ক'রে তোলার জন্যেই কংগ্রেসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির সমর্থনে প্রস্তাব আনার ভার পড়লো স্বয়ং পণ্ডিত জহরলালের ওপর। দ্বিধাগ্রস্ত জহরলাল প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, যদি-ও বারে বারে তাঁর মনে হোলো,—"এই জন্যেই কি দেশের জনসাধারণ একবৎসর ধ'রে এমন বিক্রমের সংগে যুদ্ধ করেছিলো? এতো তেজ-দৃপ্ত কাজ আর কথার কি সমাপ্তি ঘটলো এর মধ্যে?" ভারতে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী ত্যাগ ক'রে যাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করেছিলেন এবং সে জন্যে দেশে আন্দোলন চালিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র-ও মনে মনে এই চুক্তিকে স্বীকার করতে না পারলে-ও, ঐক্যের খাতিরে নাকি মেনে নিলেন। এইভাবে রজনী পাম দত্তের ভাষায়—"This collapse of left nationalism at the Karachi Congress underlined the strength of Gandhi's position."

কংগ্রেসের বাইরে কিন্তু শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচুর পরিমাণে দেখা গেলো। বিভিন্ন ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি এই চুক্তির সমালোচনা ক'রে বিরুদ্ধ প্রস্তাব গ্রহণ করলো। গান্ধীজি যখন গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্যে বিলাতে রওনা হলেন, তখন বোম্বাই-এ শ্রমিকরা এই যাত্রার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। দেশের শ্রমিক ও কিষাণদের বিপুল দেহের সংগে কংগ্রেসের মস্তিষ্কের ব্যবধান ঘটলো। ছিন্নমস্তার বীভৎস রূপ ধারণ করলো কংগ্রেস। দেহ থেকে মস্তক কেবল ছিন্ন হোলো না, ছিন্ন মস্তক দেহের রক্ত পান করতে লাগলো!

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বকে জনসাধারণের যে অংশ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে-ও শীঘ্রই সংশয় ও হতাশা দেখা দিলো। ১৯৩১ খৃস্টাব্দে ভারতীয় সহযোগী বুর্জোয়াদের পক্ষ থেকে গান্ধীজি গোল টেবিল বৈঠকে যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তা হাস্যকর হ'য়ে দাঁড়ালো। গান্ধীজি বিলাতে গিয়ে তাঁর 'ধার্মিক' এবং আত্মিক বাণী দিয়ে এলেন বটে, কিন্তু বিনিময়ে বিলাত তাঁকে কিছুই দিলো না। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের শেষের দিকে রিক্ত হস্তে গান্ধীজি দেশে ফিরলেন। পথে ধ্বংসমান পুঁজিতন্ত্রের অন্যতম তন্ত্রধারক সিনিয়র মুসোলিনির সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হোলো।

তবু ভারতবাসীকে গান্ধীজি আশার বাণী শোনাতে লাগলেন!

কিন্তু তিনি যখন দেশের জনসাধারণকে স্থির রেখেছিলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন ভারতবর্ষে বিন্দুমাত্র স্থির ছিল না। তথাকথিত 'সন্ধির' নামে বিপন্ন সাম্রাজ্যবাদ এই দীর্ঘ নয় মাস কাল ধ'রে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিল মাত্র। প্রস্তুতি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল, তাই ১৯৩২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখেই আকস্মিকরূপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সংগ্রাম ঘোষণা করলো। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন। অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স হোলো জারী। কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সম্পর্কিত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষিত হোলো বেআইনী। দেশের সর্বত্র কংগ্রেসের সংগঠক, প্রচারক এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের করা হোলো গ্রেপ্তার। এমনি ভাবে অতর্কিতে চকিতে দ্রুত আঘাত হেনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেদিন জয়ী হোলো। ১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দের নির্যাতনের অপেক্ষা এবারে নির্যাতন কঠিনতর আকার ধারণ করলো। প্রথম চার মাসেই গ্রেপ্তারের সংখ্যা হোলো আশী হাজার। মাত্র পনেরো মাস বাদে ১৯৩৩-এর মার্চে গ্রেপ্তারের সংখ্যা গিয়ে পৌছলো এক লক্ষ বিশ হাজারে। দৈহিক অত্যাচার-ও চরমে এলো। চললো

প্রহার, লাঠি-চার্জ, গুলী। গ্রামে গ্রামে হোলো পাইকারী জরিমানা। বহু অর্থ, ভূসম্পত্তি হোলো বাজেয়াপ্ত। সরকার ভেবেছিল, সংগঠনশক্তি এবং নিষ্করুণ নিপীড়ন দিয়ে তারা ভারতীয় সংগ্রামকে ছয়মাসের মধ্যেই পংগু ও অসাড় ক'রে দেবে। কিন্তু এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হোলো, চললো দীর্ঘ উনত্রিশ মাস ধ'রে। নেতাহীন, সংগঠনহীন অবস্থায় আকস্মিকভাবে ভারতীয় জনসাধারণ আক্রান্ত হয়েছিল, এবং সেজন্যে দায়ী ছিলেন কংগ্রেসের আপোষকামী বুর্জোয়া নেতৃত্ব এবং সাম্রাজ্যবাদের সংগে তাঁদের নির্লজ্জ সহযোগিতা। তবু ছত্রভংগ, বিভ্রান্ত জনবাহিনী যে অসীম প্রতিরোধ শক্তি দেখালো, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তা অতুলনীয়, অবিস্মরণীয়। কিন্তু গণশক্তিতে বুর্জোয়া নেতৃত্বের অবিরল ভীতি এই সংগ্রামকে-ও পদে পদে ব্যাহত করতে লাগলো। গান্ধী তথা কংগ্রেস হুকুমৎ কেবলই আদেশ দিতে লাগলেন যে, আন্দোলনের মধ্যে গোপনীয়তা যেন বিন্দুমাত্র না থাকে—অথচ বেআইনী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ্য আন্দোলন করা-ও ছিল একপ্রকার অসম্ভব। পাছে রাজস্ব বন্ধ হয়, সেদিক থেকে-ও তাঁরা বারে বারে জমিদারদের ভরসা এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তাঁরা গণশক্তির এই তুমুল জাগরণের বন্যা-স্রোতকে কেবলই অন্যপথে চালিত ক'রে দিতে চাইলেন। ১৯৩২-এর গ্রীষ্মকালেই গান্ধীজি জাতীয় সংগ্রামের সূচী ত্যাগ ক'রে অস্পৃশ্যতা বর্জনের দিকে মন দিলেন। ১৯৩২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজি 'আমরণ' অনশন করলেন। এই অনশন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে হোলো না, হোলো না স্বাধীনতা-সংগ্রামের অংশরূপে। গান্ধীজি অনশন করলেন 'তপশীলভুক্ত' হিন্দুদের পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদে। এইভাবে দেশের জনসাধারণের লক্ষ্য বিভক্ত হোলো, সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্য-

বাদের বিরুদ্ধে থেকে অন্তরিত হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ একটা কাজের দিকে। হোলো পুণা চুক্তি। এই চুক্তির ফলে "তপশীলভুক্ত শ্রেণীর" জন্যে সংরক্ষিত আসন হোলো দ্বিগুণিত।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজি নূতন ক'রে আবার অনশন করলেন। এখন তিনি আরো এক ধাপ নেমে এলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ কোনো কাজের বিরুদ্ধে-ও তিনি এখন লড়ছেন না, লড়ছেন দেশের গণশক্তির বিরুদ্ধে। দেশের গণ-শক্তিকে 'হিংসার' পথ থেকে—অর্থাৎ দেশীয় ও বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে মাথা তোলার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। সেদিন তাঁর অনশন হোলো যেন সেই সুদক্ষ সাপুড়ের বাঁশী—যে-বাঁশীর সুরে জাগ্রত জন-ভূজংগ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তার উদ্যত ফণা নত ক'রে তার ঝাঁপির বন্দীত্বে ফিরে যেতে পারে।

গান্ধীজির এই কাজে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আনন্দের আর সীমা রইলো না। বিনা শর্তে গান্ধীজি মুক্তি পেলেন। গান্ধীজির পরামর্শ অনুসারে কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট দেড় মাসের জন্যে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিলেন—কারণ হিসাবে দেখানো হোলো, গান্ধীজির অনশন কালে দেশের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকবে, তাই। গান্ধীজি এবার নিজেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অকৃত্রিম বন্ধু ব'লে প্রমাণিত ক'রে বড়লাটের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হ'লেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লক্ষ্য করছিল, ভারতীয় জনসাধারণ ছত্রভংগ হ'য়ে পড়েছে, কংগ্রেসী নেতাদের কার্যকলাপে তারা হয়েছে বিভ্রান্ত, সুতরাং সরকার এবার শেষ আঘাত হানতে চাইলো। গান্ধীজির সংগে বড়লাট সাধারণ সৌজন্যের খাতিরে-ও সাক্ষাৎ করলেন না। সাক্ষাতের শর্ত হ'লো কংগ্রেসকে আইন অমান্য সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করতে হবে। সুতরাং সহযোগ-প্রত্যাশী

কংগ্রেস অবিলম্বে ব্যাপক আইন-অমান্য প্রত্যাহার করলেন এবং প্রবর্তিত হোলো ব্যক্তিগত আইন অমান্যের রীতি। কেবল তাই নয়, শীঘ্রই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে ভেঙে দিলেন। এবার কয়েক দিন চললো ব্যক্তিগত আইন অমান্যের প্রহসন। সরকারের মধ্যে অনমনীয়তা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অগাস্ট মাসে গান্ধীজি পুনরায় গ্রেপ্তার হলেন। কারাগারে গান্ধীজি এবার আবার রাজনীতি পরিত্যাগ ক'রে ধর্মানুশীলন করতে লাগলেন, এবং পরে হরিজনদের উন্নতি কল্পে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করলেন। এমনিভাবে ধীরে ধীরে নেতাহীন, সংগঠনহীন, ম্রিয়মান সংগ্রাম নিঃশেষের দিকে এগিয়ে চললো।

গান্ধীজি গণ-আন্দোলনের 'এপিটাফ্' লিখতে বসলেন। আন্দোলনের অসাফল্যের জন্যে তিনি জনসাধারণকেই দায়ী করলেন: "I feel that the masses have not yet received the message of Satyagraha" etc.

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে পাটনায় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে বিনা শর্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হোলো। স্থির হোলো, কংগ্রেস আগামী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। কংগ্রেসের এই সহযোগিতার ইচ্ছায় গভর্ণমেণ্ট খুসী হয়ে জুন মাসে কংগ্রেসকে বৈধ এবং জুলাই মাসেই কমিনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়াকে বেআইনী ঘোষণা করলো।

এমনি ভাবে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ থেকে-ই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হোলো, যে অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এখনো ঘটে নি।

চৌদ্দ

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন গণ-বিপ্লবকে এমনি ভাবে বিধ্বস্ত ক'রে দিলো, তখন গণশক্তি তার নিজের নেতৃত্ব খুঁজতে লাগলো। এই নেতৃত্ব প্রধানত দেশের শ্রমিক সংঘবদ্ধতার মধ্যেই আত্ম প্রকাশ করলো। ১৯২৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিকদের সংগ্রামে যে-অংশ গ্রহণ করতো, তা ছিল নিতান্ত সংকীর্ণ। এর সদস্য সংখ্যা ছিল এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত পঞ্চান্ন। পৃথিবীব্যাপী পুঁজিতন্ত্রের যে সংকট শুরু হ'য়েছিল এবং পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ শ্রমিকদের করায়ত্ত হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে যে অভাবনীয় আশা ও উৎসাহের সঞ্চার ঘটেছিল, ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তার তরংগাঘাত ছিল অনিবার্য। পৃথিবীর গণজাগরণের অংশ হিসাবে ভারতীয় শ্রমিকরা ১৯০৮ খৃস্টাব্দেই তাদের নবজাগ্রত রাজনীতিক চেতনার প্রথম পরিচয় .দিয়েছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন লোকমান্য তিলককে দীর্ঘ ছয় বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলো, তখন বোম্বাইএর বস্ত্রশিল্প শ্রমিকরা স্বতপ্রবৃত্ত হ'য়ে ব্যাপক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং লেনিন সেদিন ভারতীয় শ্রমিকদের এই রাজনীতিক চেতনাকে ভবিষ্যতের সংকেত হিসাবে করেছিলেন অভিনন্দিত। * ভারতীয় গণশক্তির

---

* "The Indian proletariat has already matured sufficiently to wage a class-conscious and Political mass struggle—and that being the case, Anglo-Russian methods in India are played out." Lenin in 1908.

এই রাজনীতিক জাগৃতি সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পূর্ণ সচেতন ছিল এবং এই গণশক্তিকে প্রতিরোধ প্রতারিত করার জন্যে তাদের একমাত্র ভরসা ছিল সহযোগী ভারতীয় বুর্জোয়ারা। তাই শ্রমিকরা যখনই বুর্জোয়া নেতৃত্ব ত্যাগ ক'রে নিজেদের নেতৃত্ব গ'ড়ে তুলতে চেয়েছে, তখনই কঠোর হস্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাকে দমন করেছে। এই উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ১৯২৬ খৃস্টাব্দে যে ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট্ পাশ করেছিল, তার ফলে শ্রমিকদের রাজনীতিক কার্যকলাপ হয়েছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে-ও শ্রমিক সংঘবদ্ধতাকে চেপে রাখা সম্ভব হয় নি। সাম্যবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তার ওপর ভিত্তি ক'রে শ্রমিক ও কৃষাণ সংগঠনগুলি দেশে ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। প্রথমে বাংলায় এবং পরে যুক্ত-প্রদেশে ও পাঞ্জাবে শ্রমিক-কৃষক পার্টি উঠলো গ'ড়ে এবং ১৯২৮ খৃস্টাব্দে সেগুলি সম্মিলিত হ'য়ে গঠিত হোলো নিখিল ভারত শ্রমিক-কৃষক পার্টি। এই নবজাগ্রত সংঘবদ্ধ গণশক্তিকে একদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দালাল হিসাবে বুর্জোয়া 'শ্রমিক নেতারা' যেমন বিভ্রান্ত ক'রে দিতে চাইলো, তেমনি বৃটিশ সরকারও চালালো তার দমন নীতি। ১৯২৯এর মার্চ মাসে ভারতবর্ষের সর্বত্র থেকে সংগ্রামশীল শ্রেষ্ঠ নেতাদের গ্রেপ্তার ক'রে শ্রমিক আন্দোলনের শিরচ্ছেদের চেষ্টা হোলো। ভারতীয় গণশক্তি যখন ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দে স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে বুর্জোয়া নেতৃত্বে বিভ্রান্ত, দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশেষ পারদর্শিতার সংগে তখন সুপরীক্ষিত শ্রমিক নেতাদের বিচারের নামে বিনা বিচারে কারাপ্রাকারের অন্তরালে আটকে রেখেছিল। সুদীর্ঘ চার বৎসর ব্যাপী এই বিচারের নামে অবিচারের নাম হয়েছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রমিক নেতারা-ও নীতির নামে শ্রমিক সংঘবদ্ধতাকে প্রচণ্ডরূপে

আঘাত করলেন। ১৯২৯ এর শেষে নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন দক্ষিণপন্থী শ্রমিক নেতারা সংখ্যালঘু হ'য়ে পড়লেন, তখনই তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ত্যাগ ক'রে বাইরে এলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অপর একটি শ্রমিক সংঘ গড়ে তুললেন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যেও আবার বুর্জোয়া বামপন্থী শ্রমিক নেতাদের কার্যকলাপ শ্রমিক আন্দোলনকে পদে পদে ব্যাহত করতে লাগলো। ফলে, কমিউনিস্টরা রেড্ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করতে বাধ্য হলেন। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে বহু দল ও মতবিরোধ থাকায় তার শক্তির হ্রাস হোলো বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠতে লাগলো। প্রতি বৎসর ইউনিয়নের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বাড়লো। ১৯৩০-৩৪এর জাতীয় আন্দোলনের কালে শ্রমিকদের সংগ্রামশীলতা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কংগ্রেসের সহযোগী বুর্জোয়া নেতৃত্ব যখন গণ-আন্দোলনকে বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত ক'রে দিলো, তখন জাগ্রত উন্মুখ গণ-শক্তি তার নেতৃত্বের সন্ধান করতে লাগলো নিজেদের মধ্যে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা লক্ষ্য ক'রে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষিত করলো। ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স অর্ডিন্যান্সের বলে তারা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের গ্রেফ্তার ও আটক রাখতে লাগলো। শ্রমিকরা এই সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের জবাব দিল তাদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সংগে মিলিত হোলো। পর বৎসর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ঐক্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে এলো এবং ১৯৩৮ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়নের সংগে যুক্ত হোলো। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বাইরে রইলো কেবল মাত্র আমেদাবাদের গান্ধীপন্থী টেক্স-

টাইল লেবার এসোসিয়েশন। কারণ তারা নাকি শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করতো না।

কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ১৯৩৪-এ শ্রমিক শক্তির বিশ্বাস হারিয়েছিল।* সেই বিশ্বাস পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হলেন একদল বামপন্থী। কমিউনিস্ট পার্টির অবর্তমানে একদল তথাকথিত শ্রমিক নেতা ১৯৩৪ সালে গ'ড়ে তুললেন কংগ্রেস সোস্থালিস্ট পার্টি। এই পার্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই রইলো, কারণ, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হবার জন্যে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের-ও সদস্য হওয়া। কেবল তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যে একদল বামপন্থী-ও কৃষাণ ও শ্রমিকের নাম নিতে লাগলেন। ১৯৩৬-এর লখ্‌নৌ কংগ্রেস অধিবেশনে জহরলাল শ্রমিক ও কৃষাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে সংঘগতভাবে অনুমোদন দানের প্রস্তাব এনেছিলেন, দক্ষিণপন্থী-শাসিত কংগ্রেস কমিটি তা ৩৫-১৬ ভোটে বাতিল ক'রে দেন। কিন্তু দেশে শ্রমিক ও কিষাণ শক্তির জাগরণ এমন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল যে, দক্ষিণপন্থী নেতারা-ও নরম হ'তে বাধ্য হলেন। ফৈজপুর কংগ্রেস অধিবেশনে কৃষকদের অবস্থার উন্নতি কল্পে ১৩ দফা একটি কর্মসূচী-ও গৃহীত হোলো। এবং জনসাধারণকে কংগ্রেসের আওতায় আনার যথেষ্ট চেষ্টা চলতে লাগলো। এইভাবে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময়ে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে গিয়ে পৌঁছলো। আবার একবার ভারতের শ্রমিক ও কিষাণ জনসাধারণ বুর্জোয়া নেতৃত্বের মুখ চেয়ে রইলো।

---

* ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকের কথা, লখ্‌নৌ কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে জহরলাল নেহেরু বলেন: "We have largely lost touch with masses."

১৯৩৫ খৃস্টাব্দে বৃটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণকে সাময়িকভাবে শান্ত রাখার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে নয়া গঠনতন্ত্রের প্রবর্তন করলো। দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরেই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেওয়ার যে ভোয়া প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দিয়ে এসেছিল, তার সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্য-ও এর পেছনে নিহিত ছিল। কিন্তু এই ধরণের কোনো গঠনতন্ত্রে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল না। ভারতবর্ষ চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি। তাই ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে ফৈজপুরে যে কংগ্রেস অধিবেশন হোলো, তাতে কংগ্রেস ঘোষণা করলো, "In the opinion of the Congress any co-operation with the constitution is a betrayal of India's struggle for freedom and the strengthening of the hold of British Imperialism and a further exploitation of the Indian masses who have already been reduced to direst poverty under the imperialist domination."

কিন্তু কংগ্রেস একথা বাক্যত ঘোষণা করলে-ও এর মধ্যে তার যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মাত্র দুই বৎসর পূর্বে যে ভাবে তারা বিনষ্ট ক'রেছিল, তাকে গোপন করার জন্যেই স্বাধীনতা প্রীতি ও জনগণের দরদকে তারা উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করছিল মাত্র। তাই এই কংগ্রেস-বিনিন্দিত নয়া গঠনতন্ত্র অনুসারে শাসনব্যবস্থায় কংগ্রেস অংশ গ্রহণ করবে কিনা, এই প্রশ্ন যখন উঠলো, তখন কংগ্রেস office acceptance-কেই অধিক ভোটে গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ কাগজী প্রস্তাব পাশ ক'রে নয়া গঠনতন্ত্রকে কংগ্রেস বাক্যত নিন্দা করলেও কার্যত

তাকে, আংশিক ভাবে হ'লে-ও,* মেনে নিলেন। অবশ্য ফৈজপুর কংগ্রেসে office-acceptance-এর প্রশ্ন যখন উঠলো, তখন অনেকে ওই প্রশ্নটাকে আপাতত কিছুদিন তুলতে লজ্জা পেলেন। কারণ, একই অধিবেশনে নয়া-গঠনতন্ত্রের নিন্দা, স্বাধীনতা-প্রীতি, জনগণের প্রতি দরদ ইত্যাদি কাগজে ঘোষণা ক'রে, আবার সংগে সংগে সুড়সুড় ক'রে গঠনতন্ত্রের খিড়কি পথে সরকারী গদীতে গিয়ে বসাটা নিতান্তই বেমানান লাগে। ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে শ্রমিক নেতা এস, এ, ডাংগে (মীরাট মামলার বন্দী এবং কমিউনিস্ট) এক প্রস্তাবে ভারতীয় গঠনতন্ত্ররচনাকারী পরিষদ লাভের উদ্দেশ্যে গণ-আন্দোলনের জন্যে দেশকে প্রস্তুত করতে বললেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব ৮৩-৪৫ ভোটে বাতিল হ'য়ে যায়। শাসনকার্যে সরকারের সংগে সহ-যোগিতার সম্পূর্ণ বিরোধিতা ক'রে অপর একটি প্রস্তাব-ও আসে। সেটি-ও ৮৭-৪৮ ভোটে বাতিল হয়। এই ভাবে কংগ্রেস মুখে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের গঠনতন্ত্রের নিন্দা করলে-ও কার্যত তাকে গ্রহণ করলো এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সংগে, সংগ্রামের পথে নয়, সহযোগিতার পথেই অগ্রসর হ'তে লাগলেন।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দের গোড়াতে কংগ্রেস নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। নির্বাচনী ইস্তাহারে তাঁদের স্বাধীনতা-প্রীতি এবং জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দের সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রইলো। কংগ্রেস ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা আইন সভায় প্রবেশ করছেন, নয়া গঠনতন্ত্রের সংগে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে নয়, তার প্রতিরোধ এবং উচ্ছেদ করতে—"not

* বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে নয়া গঠনতন্ত্রের দুইটি অংশ ছিল : একটি Federal বা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং অপরটি Provincial বা প্রাদেশিক। কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটিকে বাদ দিয়ে প্রাদেশিক অংশটিকে গ্রহণ করলো।

to co-operate in any way with the Act, but to combat it and seek to end it."*

সুতরাং এই উদ্দেশ্যগুলি সম্মুখে রেখেই কংগ্রেস সেদিন জনসাধারণের বিপুল ভোটে আইন সভাগুলিতে নির্বাচিত হ'লেন। এখন কংগ্রেসের সম্মুখে এলো নূতন প্রশ্ন—আইন সভাগুলিতে উপস্থিত থেকে তাঁরা সরকারী শাসনকার্যের বাধা দিবেন, না নিজেরাই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবেন। কংগ্রেসের সহযোগী বুর্জোয়া নেতৃত্ব সহযোগের এমন সুযোগ সহজে ছাড়তে চাইলেন না। ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রিসভা গঠনের অর্থাৎ শাসন-কার্যে অংশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। তবে, শর্ত রইলো যে গভর্ণররা তাঁদের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। গান্ধীজি কংগ্রেসের বাইরে থাকলে-ও কংগ্রেসে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনিই কংগ্রেসকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরামর্শ দিলেন।† অবশ্য, কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, এবং অন্যান্য বামপন্থীরা কংগ্রেসের এইভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু

* চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল যখন আইন সভায় প্রবেশ করেছিল, তখন প্রবেশের পূর্বে ঘোষণা করেছিল যে, সরকারী কার্যের প্রতিরোধের জন্যেই তাঁরা সেখানে যাচ্ছেন। কিন্তু আইন সভায় ঢুকেই তাঁরা সরকারের সংগে সহযোগিতার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছিলেন, আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। বর্তমানে কংগ্রেস আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলেন।

† গান্ধীজি তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে একটী প্রবন্ধে মন্ত্রিত্বগ্রহণের স্বরূপ সম্পর্কে যদিও বলেন, "The Ministers are mere puppets so far as the real control is concerned. The Collectors and Police may at a mere command from the Governors unseat the Ministers, arrest them and put them in a lock-up."

দক্ষিণপন্থী-শাসিত কংগ্রেসে তাঁদের প্রতিবাদ ১৩৫-৭৮ ভোটে অগ্রাহ্য হ'য়ে গেলো।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে-ও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে আরো তিনমাস দেরী হোলো। কারণ, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে কংগ্রেস চেয়েছিলেন, গভর্ণররা যে তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না তা বৃটিশ সরকার ঘোষণা করুক। কিন্তু সে-রকম কোনো ঘোষণা করার পূর্বেই ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষে নয়া গঠনতন্ত্রের উদ্বোধন হোলো। সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ হরতালের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানালো। কংগ্রেসের সংগে গভর্ণমেণ্টের আলাপ-আলোচনা অচল অবস্থায় এসেছিল, তাই আপাতত প্রদেশগুলিতে সংখ্যালঘু দল নিয়েই গঠিত হোলো মন্ত্রিসভা। অবশেষে অচল অবস্থার অবসান হোলো। ২২শে জুন তারিখে বড়লাট এক ঘোষণায় কংগ্রেসকে অনেকখানি ভরসা দিলেন। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হোলো। কিছুদিন বাদে হোলো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পরে আসাম এবং সিন্ধুতে-ও কংগ্রেস 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা গঠন করলেন।

প্রথমে কিছুদিন কংগ্রেস কিছু কিছু গণতান্ত্রিক কাজ করার পরে ক্রমেই তাঁরা তাদের মুখোস খুলতে লাগলেন এবং নির্লজ্জভাবে কৃষাণ, শ্রমিক ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে সাম্রজ্যবাদী সরকারের সংগে সহযোগিতা শুরু করলেন। মাদ্রাজে সোস্থালিস্ট নেতা গ্রেফতার হলেন, বিহারে জমিদারের সংগে কংগ্রেস হাত মেলালেন, বোম্বাই-এ পাশ হোলো ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিস্‌পিউট বিল। এমনিভাবে কংগ্রেস ফৈজপুর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বা নির্বাচনী ইস্তাহারে যে-সকল আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাক্‌আড়ম্বর করেছিলেন, সে-সবগুলিই তাঁরা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিলেন। সহযোগী বুর্জোয়া শাসিত কংগ্রেস

এইভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের নামে সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম ঘাঁটিতে পরিণত হোলেন—তাঁরা গণসংগ্রামের সকল প্রকার প্রকাশকে দমন করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো। নির্বাচনের পূর্বে যে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছায়ামাত্র ছিল, তা ধীরে ধীরে দানবীয় আকার ধারণ করলো, যার ভয়াবহ রক্তাক্ত ফসল উঠলো ১৯৪৬-৪৭-এর ভারতবর্ষে। এই ক্রম-বর্ধমান ভ্রান্ত সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করার জন্যে একমাত্র প্রয়োজন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব বর্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত হওয়ায় এবং গণাতংক তাঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তাঁরা সংগ্রামের পথে কোনো মতেই অগ্রসর হ'তে চাইলেন না। কংগ্রেসের সহযোগিতা সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ছিল। সুতরাং এই অনুকূল অবস্থায় তারা ভারতবর্ষে ১৯৩৫ খৃস্টাব্দে প্রবর্তিত গঠনতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটির-ও প্রবর্তন করতে চাইলো। বস্তুত, ১৯৩৫-এর প্রাদেশিক অংশের ক্ষতিপূরণ হিসাবেই ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটি। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তিত ক'রে স্থানীয় বুর্জোয়াদের হাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে ক্ষমতাটুকু দিয়েছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তন ক'রে তা ফিরিয়ে নিতে চাইলো বহুগুণে। কারণ, এই পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় সামন্ত রাজাদের-ও প্রতিনিধিত্বের সমান অধিকার ছিল। এবং সামন্ত রাজ্যগুলি ছিল বা আছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ বন্দর। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দেই হরিপুরায় জাতীয় কংগ্রেস একবাক্যে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সরকারী চেষ্টার নিন্দা করলেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগ্রামশীল বামপন্থীরা কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতাদের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, সংগ্রামবিরোধী সহযোগী দক্ষিণপন্থী নেতারা যে-কোন মুহূর্তে যে-সাম্রাজ্য-

বাদের সংগে হাত মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাকে গ্রহণ ক'রে বসতে পারেন, এমন একটি ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। কেবল তাই নয়, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ তীব্র হ'য়ে উঠছিল, তারই দোলা এসে লেগেছিল কংগ্রেসের সংগ্রামশীল বামপন্থী অংশে। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগী সংগ্রামবিমুখ দক্ষিণপন্থীদের সংগে সংগ্রামশীল সহযোগবিরোধী বামপন্থীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। সহযোগী দক্ষিণপন্থীদের পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মা গান্ধী (যদি-ও নামে কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন) এবং সংগ্রামশীল বামপন্থীদের পুরোভাগে ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষ চন্দ্রের পেছনে ছিলেন সমস্ত বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা, সোস্যালিস্টরা এবং কমিউনিস্টরা। ১৯৩৯-এ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন দ্বন্দ্বরূপেই সংঘর্ষটি প্রকাশ পেলো। এ পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন বিনা দ্বন্দ্বে সর্ব-সম্মতি ক্রমেই সম্পন্ন হোতো, আগের বৎসরেও সুভাষচন্দ্র বিনা দ্বন্দ্বে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু এবার সর্বপ্রথম নির্বাচন দ্বন্দ্ব ঘটলো। কংগ্রেস সভাপতিত্বের নির্বাচন দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্রের অবতীর্ণ হবার একমাত্র কারণ ছিল, কংগ্রেস কমিটিকে, বাস্তবিকপক্ষে যা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করে, বামপন্থীদের সংগ্রামশীল আয়ত্তে আনা। কারণ, কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হন, ভোটে নির্বাচিত হন না। বামপন্থীদের এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে দক্ষিণপন্থীদের কোনো সংশয় ছিল না। সুতরাং তাঁরা সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরূপে একজন গান্ধীপন্থী প্রতিনিধিকে খাড়া করলেন। কিন্তু নির্বাচন দ্বন্দ্বে সুভাষচন্দ্র ১৫৭৫-১৩৭৬ ভোটে হ'লেন জয়ী। সমস্ত সংগ্রামী ভারতবর্ষ সেদিন আনন্দ উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠলো। সুভাষচন্দ্রের এই জয় সেদিন আসন্ন সংগ্রামের সংকেত করলো। তাই সহযোগী দক্ষিণপন্থীদের শ্রেষ্ঠ

ব্যক্তি হিসাবে গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, সুভাষচন্দ্রের জয় তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। "It is plain to me that the delegates do not approve of the principle and policy for which I stand."

গান্ধীজি স্পষ্ট লক্ষ্য করলেন, কংগ্রেস এবার সহযোগিতা এবং অহিংসার পথ ছেড়ে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হচ্চে, তাঁর অহিংসার বাণী ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। গান্ধীজি তৎকালীন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করলেন, এমন কি তিনি গান্ধীবাদী কংগ্রেসীদের কংগ্রেস ত্যাগ করতে-ও পরামর্শ দিলেন।

"Those,···who feel uncomfortable in being in the Congress may come out."

কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের এই সংঘর্ষে গান্ধীজিকে যে-দুর্নাম-কলংক সইতে হোলো, এমনটি এর পূর্বে আর কখনো হয় নি, কারণ, ভারতীয় রাজনীতিতে সংগ্রামশীলদের সংগে অসংগ্রামী সহযোগীদের মতদ্বৈধ ইতিপূর্বে এমন তীব্র প্রচণ্ড আকার কখনো ধারণ করে নি, সমগ্র গান্ধীবাদ যেন কয়েক দিনের মধ্যেই উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে দেখা দিলো।

কিন্তু দক্ষিণপন্থী সহযোগী গান্ধীবাদীরা সহজে আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। পনেরো জন সদস্য নিয়ে গঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে দক্ষিণপন্থী বারো জন সদস্য পদত্যাগ করলেন। জহরলাল নেহরু-ও করলেন তাঁদের পদাংক অনুসরণ। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হ'য়ে উঠলে-ও বাইরেকার গঠনতান্ত্রিক অবয়বটা কিন্তু ছিল অক্ষুণ্ণ। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হোলো। এই অধিবেশনে দক্ষিণপন্থীরা তাঁদের শেষ তাসটি তুরুপ করলেন। তাঁরা খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে চাইলেন

গান্ধীজির বিপুল ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে। কে জাতির অবিসম্বাদী নেতা, এই প্রশ্ন নিয়ে একটি প্রস্তাব উঠলো। গান্ধীজির বিরাট ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতো এসে দাঁড়ালো সংগ্রামী বামপন্থীদের সম্মুখে। বামপন্থীরা-ও অনেকে সসম্ভ্রমে মাথা নত করলেন। যেন মনে হোলো, রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্য-বাহিনী কোনো যাতুকরের অপূর্ব সংগীতে মুগ্ধ হ'য়ে ক্ষণেকের জন্মে অস্ত্রচালনা বন্ধ করলো, এবং সেই সুযোগে জয়ী হ'য়ে গেলো শত্রুরা। দক্ষিণপন্থীদের এই জয় ভারতীয় রাজনীতিকে আবার তার পূর্ব পথে পরিচালিত করলো। স্থির হোলো, গান্ধীজির বিনা অনুমোদনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কোনো সদস্য নেওয়া চলবে না। অর্থাৎ সুভাষ চন্দ্র যে কারণে কংগ্রেস সভাপতির আসন অধিকার করতে চেয়েছিলেন, দক্ষিণপন্থীরা গান্ধীজির ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে থেকে তাকে বানচাল ক'রে দিলো। ১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে সুভাষ চন্দ্র সভাপতিত্বের পদ ত্যাগ করলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। আবার ভারতীয় কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের কবলে গেলো। দক্ষিণপন্থীরা কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হোলেন না। কংগ্রেসকে দক্ষিণপন্থীদের একছত্র ঘাঁটিতে পরিণত করতে চাইলেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাকে নির্দেশ দানের অধিকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি-গুলির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হোলো। কংগ্রেসের অনুমতি না নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের কোনোরূপ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ-ও হোলো নিষিদ্ধ— অর্থাৎ শ্রমিক এবং কৃষাণ আন্দোলনগুলিতে তাঁদের অংশ গ্রহণের উপায় রইলো না। সুভাষ চন্দ্র এই বামপন্থী-বিরোধী কংগ্রেসীপ্রস্তাবের প্রতিবাদে 'Left Consolidation Committee' গঠন করলেন। ৯ই জুলাই তারিখে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হোলো। ফলে সুভাষ চন্দ্র বংগীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ থেকে বিচ্যুত হ'লেন। তাঁকে তিন

বৎসরের জন্যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত কোনো পদে নিযুক্ত হবার অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করা হোলো।

এমনি ভাবে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সেদিন দেশের সংগ্রামী জনসাধারণকে দমন ক'রে যে বিক্ষোভের বাষ্প রুদ্ধ করেছিল, তার একটি প্রধান অংশ নিষ্কৃতি পেলো কংগ্রেস-বিরোধী মুসলিম লীগের মধ্য দিয়ে—মুসলমান জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী শক্তি ভ্রান্ত পথে চালিত হ'য়ে বিস্ফুরিত হোলো সংকীর্ণ বর্বর সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে। এই সাম্প্রদায়িকতার অগ্নিকাণ্ড নির্বাপিত করতে গিয়ে গান্ধীজিকে পরবর্তীকালে প্রাণ দিতে হ'য়েছিল, তাই আমাদের মনে রাখা উচিত, গান্ধীজির সংগ্রামের বিরোধিতাই সাম্প্রদায়িকতার এই বিষবাষ্পকে একদা সযত্নে রুদ্ধ ক'রেছিল। সংগ্রামের প্রশস্ত পথে গণ-বিক্ষোভের বাষ্পকে সেদিন পরিচালিত করলে, কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, গান্ধীজির জীবনের ইতিহাস-ও অন্যরকম হোতো, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

ভারতবর্ষের যখন এমনি অবস্থা, তখন এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। চিরদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং মধ্য প্রাচ্যে তার আধিপত্য এবং প্রভাবের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার ক'রে এসেছে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের যুদ্ধের সময় বৃটেন ভারতে যে নীতির অনুসরণ করেছিল, এবারে-ও সে তাই করতে চাইলো। যুদ্ধ ঘোষণার সংগে সংগেই ভারতীয় জনসাধারণের কোনো মতামত না নিয়েই বড়লাট ভারতবর্ষকে যুদ্ধমান দেশ ব'লে ঘোষণা করলেন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে মাত্র এগারো মিনিটে পাশ করা হোলো ভারত শাসন সংশোধন আইন। এই আইনের বলে বড়লাট প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক গঠনতন্ত্রে-ও হস্তক্ষেপের অধিকার পেলেন।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে পাশ হোলো ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অর্ডিনান্স। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এলো চূড়ান্ত অধিকার। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সকল প্রস্তুতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হোলো ব'লে ঘোষণা করলেন। এইরূপে ভারতবর্ষের শাসনভার নির্লজ্জভাবে একটি মাত্র ব্যক্তির হস্তে নিয়োজিত হোলো, গঠনতন্ত্রের কোনো ছদ্মবেশ-ও আর রইলো না। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা এই যুদ্ধে বিন্দুমাত্র-ও সহযোগিতা করতে পারেন না। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হোলো ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে সাম্রাজ্যবাদকে সুদৃঢ় ও সংঘবদ্ধ করা। সুতরাং ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ সরকারকে গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এই যুদ্ধের লক্ষ্য কি, তা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে অনুরোধ করলেন। "Do they include the elimination of imperialism and the treatment of India as a free nation...?"

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের এই সোজা প্রশ্নের যে বাঁকা জবাব বৃটিশ সরকার দিলো, তা বস্তুত ছিল, 'না'। সুতরাং জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকারের সংগে কূটনৈতিক সংঘর্ষ দেখা দিলো। অবশ্য, এই সংঘর্ষের মূল নিহিত ছিল আরো গভীরে, জনসাধারণের মধ্যে, যারা ইতিমধ্যেই যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। ২রা অক্টোবর তারিখে বোম্বাইএর নব্বই হাজার শ্রমিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে একদিনের জন্যে সাংকেতিক ধর্মঘট পালন করলো। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সংগে সকল সহযোগিতা ত্যাগ করার জন্যে চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে লাগলো। ১৯৩৯-এর অক্টোবর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রসভাগুলি করলো পদত্যাগ।

১৯৪০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে ইউরোপে নাৎসীরা যখন প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে, ফ্রান্সের পতন ঘটেছে এবং যুদ্ধের সংকট-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে, তখন কংগ্রেস স্বত-প্রণোদিত হ'য়ে সহযোগিতার জন্যে আবার অগ্রসর হয়েছেন। ইউরোপে ফাশিজ্‌মের অভ্যুত্থান এবং তার ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কংগ্রেসের এক অংশ সচেতন ছিল। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে ফৈজপুর অধিবেশনে কংগ্রেস স্পেনে ফ্রাংকোর অধীনে ফাশিবাদের অভ্যুত্থান এবং জার্মান-ইতালীর ফাশিস্টদের নৃশংস তাণ্ডবের তীব্র নিন্দা করেন। নিরপেক্ষতার নামে এই বর্বর অভিযানকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যে-ও ইংল্যাণ্ডকে দায়ী করা হয়। বলা হয়, "Fascist aggression has increased, the Fascist Powers forming alliances and grouping themselves together for war with the intention of demanding Europe and the world and crushing political and social freedom." ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে-ও হরিপুরা কংগ্রেস বৃটিশের বিপজ্জনক নিরপেক্ষতার তীব্র নিন্দা করেন। মিউনিকে অনুসৃত বৃটিশ নীতিকে তিরস্কৃত করা হয়: "The Congress records its entire disapproval of the British foreign policy culminating in the Munich Pact, the Anglo-Italian agreement and the recognition of Rebel Spain." অর্থাৎ ফাশীবাদ ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটেন যুদ্ধ ঘোষণা করার বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ফাশীদের বিরুদ্ধে তার প্রবল বিরোধিতা জানিয়ে এসেছে। যুদ্ধ যখন ঘোষিত হোলো, তখন ফাশীবাদ-বিরোধিতার জন্যে ভারতবর্ষ বৃটেনকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল; অবশ্য বৃটেনের ক্রীতদাসরূপে নয়, বন্ধুরূপে। কিন্তু বৃটেন ভারতবর্ষকে চাবুকের

জোরে ব্যবহার করতে চাইলো। বৃটেনের ফাশীবিরোধের রূপ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদিতা, তা যখন অত্যন্ত প্রকট হ'য়ে উঠলো, তখন তার সংগে সহযোগিতা করা ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠলো। অবশ্য, ঐ সময়-ও গান্ধীজি যে বৃটিশপ্রীতি দেখান, তা বুয়ার যুদ্ধ, জুলু যুদ্ধ, বা গত মহাযুদ্ধের সময়কার মনোভাবের অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অন্যতরো নয়। বৃটেন, আমেরিকা, ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া 'গণতন্ত্র' ছিল তাঁর কাছে আদর্শ-বস্তু, সেই আদর্শে অহিংসার পথে ভারতবর্ষ গিয়ে উপনীত হবে, এই ছিল তাঁর সর্বাংগীন সংকল্প। তাই ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে-ও গান্ধীজি বলেন, বৃটেন 'ন্যায়ের' জন্যে যুদ্ধ করছে, ভারতবর্ষের কর্তব্য তাকে বিনা শর্তে সকল সাহায্য দেওয়া। ৯ই সেপ্টেম্বর হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "I am not, therefore, just now thinking of India's deliverance. It will come, but what will be its worth if England and France fall." তাই ফাশিজম্ যখন ইউরোপকে প্রচণ্ড বিক্রমে মথিত ক'রে ফেললো, তখন ভারতবর্ষ আবার সহযোগিতার জন্যে অগ্রসর হোলো। শর্তরূপে দাবী করলো, কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং এই সরকার কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত সদস্যদের কাছেই দায়ী থাকবে। কংগ্রেস এই দাবীর ভিত্তি হিসাবে পুণায় ১৯৪০-এর জুলাই মাসে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা-বিষয়ে গান্ধীজির অহিংসার নীতিকে বিপুল ভোটাধিক্যে বর্জন করলো। গান্ধীজির নিজের-ও এই নীতির বিরোধিতা করার কোনো কারণ ছিল, মনে হয় না। বৃটেনকে রক্ষা করার যখনই প্রয়োজন হয়েছে, কি বুয়ার যুদ্ধে, কি জুলু বিদ্রোহে, কি গত মহাযুদ্ধে, প্রতিবারেই তিনি অহিংসার নীতিকে হেলায় ত্যাগ করেছেন। তবে হিংসার নীতিকে

কংগ্রেস যখন স্বীকার ক'রে নিলো, তখন গান্ধীজি তার মধ্যে আতংকের একটি কারণ-ও লক্ষ্য না ক'রে পারলেন না। এবার যখন ভারতবর্ষ বিদ্রোহ করবে, তখন তাকে অহিংসার দার্শনিকতা দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়তো সম্ভব হবে না। দুই বৎসর বাদে আগস্ট বিদ্রোহের সময় তার প্রচুর প্রমাণ-ও পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের এই শর্তে বৃটিশ সরকার রাজী হোলো না। কারণ দেখালো, কংগ্রেস আজ একাই আর ভারতীয় জাতীয়তার প্রতিনিধিত্ব করে না, দেশে অন্যান্য প্রভাবশালী দল-ও আছে, যথা, মুসলিম লীগ, দেশীয় রাজন্যবর্গ, ইত্যাদি।

কংগ্রেস ভারতবর্ষের গণ-বিক্ষোভকে সহজ সরল পথে পরিচালিত না ক'রে কেবলই তার সম্মুখ-গতি রুদ্ধ করার ফলে তা বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের রাজপথে না গিয়ে বৃটিশের সহযোগী সাম্প্রদায়িকতার অলিগলিতে প্রবেশ করেছিল। এ সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগে তারা যে ভেদ ও শাসনের নীতি অনুসরণ করেছিল, সেই পুরাতন সুপরীক্ষিত নীতিকেই আবার এখন আশ্রয় করতে চাইলো। মিঃ এম. এ. জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম বুর্জোয়া শ্রেণী বৃটিশ সরকারের প্রসাদপ্রার্থী হ'য়ে উঠলো, এবং বৃটিশ সরকার-ও সুবিধামত মুসলিম লীগকেই ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ ও প্রচার করতে লাগলো এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মিলন মীমাংসা যাতে সম্ভবপর না হয়, পরিপূর্ণরূপে তার চেষ্টা করলো। অপরিতৃপ্ত গণবিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম বুর্জোয়ারা ধীরে ধীরে মুসলমান জনসাধারণকে এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-বুর্জোয়া শিবিরে টেনে এনেছিল। তার পরিণত প্রকাশ মিললো ১৯৪০ খৃস্টাব্দের

মার্চ মাসে—মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে। মিঃ জিন্না তাঁর বাক্‌শক্তির চরম প্রয়োগ করলেন, মুসলমান জনসাধারণের ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতিক অবস্থা, স্বাধীনতাস্পৃহা, কিছুই বাদ গেলো না। "We stand unequivocally for the freedom of India. But…" এই 'কিন্তু-টিই' মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির মূল কথা। কিন্তু—হিন্দু শোষক ও মুসলমান শোষিতদের মধ্যে রয়েছে বৃটিশ শাসনের রক্ষা-কবচ। সুতরাং মুসলমানদের যেমন স্বাধীনতা চাই, তেমনি চাই স্বতন্ত্র সত্তা—পাকিস্তান। ঐ সময়ে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর চেষ্টা-ও যে চলে নি, এমন নয়। কিন্তু বৃটিশের উৎসাহে মুসলিম লীগের অনমনীয় ভাব সমস্ত মৈত্রী-মীমাংসার চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিলো। গান্ধীজি নিজে-ও হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহু চেষ্টা-ই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর গণ-আন্দোলনের বিরোধিতা দেশে যে বিভ্রান্ত বিকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল, তাতে তাঁর সমস্ত চেষ্টার তরণী একদা দিশাহারা কূলহারা হ'য়ে ভেসে গেলো।

এদিকে বৃটিশ সরকারের এই অসভ্য এক গুঁয়েমি, নির্লজ্জতা ভারতীয় জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছিল। ইচ্ছা করলে ভারতীয় নেতারা দেশব্যাপী আক্রোশকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু গণ-শক্তির প্রতি তাঁদের আতংক ছিল অপরাজেয়, সমস্ত ক্ষতিই তার বিনিময়ে ছিল অকিঞ্চিৎকর। অথচ দেশব্যাপী অসন্তোষের তরংগকে বিপুল গর্জনে এগিয়ে আসতে-ও গান্ধীজি প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তিনি গণ-শক্তির আসন্ন প্রচণ্ডতাকে প্রশমিত করার জন্যে পুনরায় আশ্রয় করলেন তাঁর সত্যাগ্রহের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ্‌—শুরু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণা করা হোলো, এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের ফলে

ভারতের দাবী ঘোষিত হবে, অথচ বৃটিশ সরকারকে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিব্রত করা হবে না। ১৯৪০-৪১-এর আবহাওয়ায় গান্ধীজি-পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে নিতান্ত হাস্যাপদ মনে হয়। এই সাংকেতিক সত্যাগ্রহ স্বাধীনতার দাবীতে-ও হোলো না, হোলো কিনা কেবলমাত্র বাক্য-স্বাধীনতার দাবীতে! সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বা ফলাফল যাই হোক, তার পশ্চাতে যে দেশব্যাপী অসন্তোষ জাগ্রত ছিল, সে বিষয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারত সরকারের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সুতরাং দেশে গ্রেফ্তার ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো। কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রেফ্তারের সংখ্যা বিশ হাজারে গিয়ে পৌঁছলো। তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভার বহু সদস্য এবং প্রাক্তন মন্ত্রী-ও ছিলেন।

কিন্তু ১৯৪১-এর শেষার্ধে যুদ্ধের চেহারাটা অকস্মাৎ সম্পূর্ণরূপে বদলে গেল। জার্মানির সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ, বৃটিশ-সোভিয়েট চুক্তি, সুদূর প্রাচ্যে জাপানী অভিযান এবং বৃটেন ও আমেরিকার সংগে স্বাধীনতা-রক্ষাপ্রয়াসী চীন এবং সোভিয়েটের মিলনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন, রাতারাতি বিশ্ব যুদ্ধের রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলে দিলো। যুদ্ধের এই আকস্মিক প্রকৃতিগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভারতীয় নেতারাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলেন: "The progressive forces of the world are now aligned with the group represented by Russia, Britain, America and China."

কিন্তু ভারতবর্ষের এই প্রগতিশীল মনোভাবকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা উপেক্ষার সংগে এড়িয়ে গেলো। ১৯৪১ খৃস্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ চার্চিল আটলাণ্টিক সনদের প্রয়োগ-গণ্ডী থেকে ভারতবর্ষকে বাইরেই

রাখেন। * যাই হোক, ভারতীয় নেতাদের ফাশিবিরোধী যুদ্ধে অংশ গ্রহণের উন্মুখতা দেখে গভর্ণমেণ্ট ডিসেম্বর মাসে বন্দী কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেন। ঐ মাসের শেষাশেষি বারদৌলিতে একটি প্রস্তাবে কংগ্রেস এক্সিস শক্তিকে সশস্ত্র প্রতিরোধের সংকল্প ঘোষণা করেন। ফলে, সাময়িকভাবে গান্ধীজি কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন, যদি-ও এই অবসর গ্রহণ ছিল তাঁর নেপথ্যে অপসরণ মাত্র, প্রয়োজন বোধে তিনি আবার যে কোনো মুহূর্তে অবতীর্ণ হবেন।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৮ই মার্চ রেংগুনের পতন হোলো। জাপানীরা প্লাবনের বেগে এগিয়ে আসতে লাগলো। আতংকগ্রস্ত বৃটিশ সরকার ১৮ই মার্চ তারিখে ভারতবর্ষের জন্যে ঘোষণা করলো ক্রিপ্ স্ মিশন। ক্রিপ্ স্ মিশন-ও হোলো বিফল। গান্ধীজি ক্রিপ্ স্ প্রস্তাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, তা ভারতীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকেবে। এই প্রস্তাবকে তিনি বলেছিলেন, "a post-dated cheque."

ক্রিপ্ স্ মিশনের ভোয়া প্রস্তাব কেবল যে সংগ্রামশীল, আধা-সংগ্রামশীল জাতীয় নেতাদের কাছে অসমর্থন পেলো তাই নয়, নরমপন্থী মডারেটরা-ও পর্যন্ত একবাক্যে তার নিন্দা করলেন। কিন্তু ঝুনো রক্ষণশীল-পরিচালিত বৃটিশ সরকার তাদের অনমনীয় ভাবে বিন্দুমাত্র-ও শৈথিল্য দেখালো না। ফলে, দেশে যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা গেলো, কংগ্রেস তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হোলো, যদি-ও এখনো কংগ্রেস সোজাসোজি সংগ্রামের পথে

* প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আটলান্টিক সনদের প্রয়োগ-গণ্ডীকে কিন্তু পরে পৃথিবীব্যাপী করেন। ১৯৪২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ঘোষণা করেন: "The Atlantic charter applies not only to the parts of the world that border the Atlantic, but to the whole world."

অগ্রসর হ'তে চাইলেন না। ১৯৪১-এর ডিসেম্বরে কংগ্রেস যখন হিংসাত্মক প্রতিরোধকে নীতি হিসাবে গ্রহণ ক'রেছিলেন, গান্ধীজি তখন কিছুদিনের জন্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এবার পুনরায় তিনি কংগ্রেসের বল্গা-রজ্জু স্বহস্তে নিয়ে সারথির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অবশ্য এই অবতরণের শর্ত ছিল অহিংসা। গান্ধীজি তাঁর কর্মসূচীকে মূলত চার-ভাগে ভাগ করলেনঃ এক, জাপানকে অহিংস উপায়ে বাধা দান; দুই, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সংগে অসহযোগিতা; তিন, ফাশিবাদীবিরোধী মিত্র-পক্ষের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল মনোভাব; চার, নেহরু-আজাদ-প্রমুখ ফাশিবিরোধী কংগ্রেসী নেতারা যে সশস্ত্র প্রতিরোধের,—গেরিলাবাহিনী গঠন, 'পোড়া মাটির' নীতি অনুসরণ ইত্যাদির—প্রচার করছিলেন, তার সংগে সকল প্রকার সংঘর্ষ এড়ানো। কংগ্রেস গান্ধীজির অহিংস পথকে পূর্বের মতো বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে না পারলে-ও বুর্জোয়াদের এই সংকট-মুহূর্তে তাঁর নেতৃত্ব ছিল একান্ত প্রয়োজন। তাই ফাশিবিরোধী নেহরু এবং আজাদ প্রভৃতির সংগে গান্ধীজির আলাপ আলোচনার ফলে ফাশিবিরোধিতা এবং অহিংসা, এই উভয় নীতির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হোলো। এবং এই চেষ্টা এমন স্বতবিরুদ্ধ ছিল যে, শীঘ্রই দেখা গেল গান্ধীজির অহিংসার পথে ফাশিবিরোধী নেহরু আজাদ প্রমুখ নেতারা-ও এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যার অর্থ হোলো নিষ্ক্রিয়তা—না, কেবল নিষ্ক্রিয়তা নয়, পরোক্ষে ফাশিবাদের সমর্থন। কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে যে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করতে চাইলেন, তা লক্ষ্য ক'রে ফাশিবাদীদের ওষ্ঠাধর প্রফুল্ল হাস্যে আকর্ণ-বিস্তৃত হোলো। যে ফাশিবাদীরা আফ্রিকায়, ইউরোপে, এশিয়ায় স্বাধীন দেশগুলির উপর বর্বর অভিযান চালিয়ে করতল-গত করেছে, তারাই ভারতবর্ষে এই স্বাধীনতা আন্দোলনের উৎসাহে,

আনন্দে অধীর আগ্রহে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো! ফাশিবাদীদের এই উৎকট আনন্দ দেখে ফাশিবিরোধী কংগ্রেসী নেতাদের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা তা হলেন না—যদি-ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এ বিষয়ে ভারতীয় ফাশিবিরোধীদের সতর্ক করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি। তাই ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন অসহযোগের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, তাঁরা তার বিরোধিতা করেন। অবশ্য, একথা-ও স্মরণীয়, গান্ধীজি যে এই অসহযোগ শুরু করতে চেয়েছিলেন, তা নয়। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, নেহরু, আজাদ প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশে যে- ফাশিবিরোধিতা প্রবল হ'য়ে উঠছে, তা যে-কোনো মুহূর্তে সশস্ত্র ফাশি-বিরোধিতায় পরিণত হ'তে পারে। এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে ছিল গান্ধীজির আতংক, এবং তিনি শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া রাজনীতিক হিসাবে বুঝতেন, এই সশস্ত্র ফাশিবিরোধী অভ্যুত্থানের অর্থ কী। এর অর্থ ছিল অতি সুস্পষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে গণবিপ্লব। বাইরের ফাশিস্টদের উচ্ছেদের পরমুহূর্তে দেশীয় ফাশিস্টদের উৎখাৎ — যা ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, হাংগেরি, রুমানিয়া, বালগেরিয়া প্রভৃতি দেশে ঘটেছে এবং এশিয়ার ইন্দো-নেশিয়া, ভিয়েটনাম, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশগুলিতে আজ ঘটছে। গান্ধীজি বুর্জোয়া নেতা হিসাবে সেদিন যে দূরদৃষ্টি দেখিয়েছিলেন, তা তথাকথিত সোস্থালিস্ট ও বহু মার্কসিস্টরা-ও লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু গান্ধীজি বুর্জোয়া নেতা হিসাবেই ঘটনা স্রোতের এই পরিণতিকে আতংকের চোখে দেখেছিলেন, তাই তিনি অহিংস অসহযোগের পথেই ফাশিবিরোধিতাকে সেদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। অন্যপক্ষে, ভারতের কনিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল ইতিহাসের সেই প্রচণ্ড পরিণতি, সশস্ত্র ফাশিবিরোধিতার পথেই দেশীয় ফাশিস্টদের উচ্ছেদ। তাই এই ফাশিবিরোধী যুদ্ধকে তারা

নাম দিয়েছিল জন-যুদ্ধ। এবং এই কারণেই সেদিন গান্ধীজি-পরিচালিত বুর্জোয়া কংগ্রেসের সংগে গণ-আন্দোলনের নেতা হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির ঘটেছিল চূড়ান্ত সংঘর্ষ। গান্ধীজি সেদিন অসহযোগ আন্দোলনের পথে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত দিতে যে চান নি, কেবল সশস্ত্র ফাশিবিরোধিতার পথ থেকে ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর ১৯৪২ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখে বড়লাটের কাছে লিখিত পত্র থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়:

"The Government of India should have waited at least till the time that I inaugurated mass action. I publicly stated that I fully contemplated sending you a letter before taking any concrete action."

কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সে-জন্যে অপেক্ষা করেন নি। (করলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিতো।) ১৯৪২-এর ৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস তাঁদের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাশ করলেন। কিন্তু কেবল প্রস্তাবই পাশ করেছিলেন, আশু সংগ্রাম সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের ছিল না। তাই ৯ই আগস্ট ভোরে যখন কংগ্রেসী নেতারা গ্রেপ্তার হলেন, তখন নেতৃত্বহীন কর্মসূচীহীন অবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণ প্রতীক্ষা করছিল। গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতাদের গ্রেফতারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ দেখা গেলো। এই বিক্ষোভের ফলে গান্ধীজির অহিংসা নীতি যেমন অক্ষুণ্ণ রইলো না, তেমনি ব্যাহত হোলো নেহরু, আজাদ প্রভৃতির ফাশিবিরোধিতা। তবে একটা দিক থেকে অবশ্য এই উভয় দলই উপকৃত হলেন: ভারতীয় জনসাধারণের অসন্তোষ অনেকখানি প্রশমিত হোলো, এবং সশস্ত্র ফাশিবিরোধের পথে দেশে সশস্ত্র গণ-বিপ্লব সহজে সম্ভব হোলো না।

নেতৃত্বহীন আগস্ট আন্দোলনকে বৃটিশ সরকার কঠিন হস্তে দমন করলেন। মিঃ চার্চিল পার্লামেণ্টে পরে বড়াই ক'রে বলেছিলেন, এই আন্দোলনটাকে খুব সহজেই দমন করা গেছে—"with remarkable ease." আগস্ট আন্দোলনের পরাজয় ছিল অনিবার্য। কারণ, এর ভিত ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ—কয়েক দশক পূর্বে যে এনার্কিস্ট-টেররিস্ট আন্দোলনগুলি হয়েছিল, এ ছিল সেগুলিরই বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র।

গ্রেপ্তার ক'রে গান্ধীজিকে আগা খাঁ প্রাসাদে রাখা হয়, এবং অন্যান্য নেতাদের রাখা হয় আমেদাবাদ ফোর্টে। ১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজি অসুস্থ হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন। গান্ধীজি কারাগারের বাইরে এসেই ঘোষণা করেন যে, ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্টের প্রস্তাবের আইন অমান্য আন্দোলনের অংশটি আপনা থেকেই বাতিল হ'য়ে গেছে, কারণ, ১৯৪৪ সাল আর ১৯৪২ সাল নয়।

কিন্তু অবস্থা তখনো অচল হ'য়ে রইলো। আগস্ট প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ভারত সরকার কোনো আলাপ-আলোচনার সুযোগ দিলো না। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার বা পরিবর্তিত করার একমাত্র অধিকারী ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের জুন মাসে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা মুক্তি পেলেন। কিন্তু অচল অবস্থার সমাধান হোলো না। বৃটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার নামে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করছিল এবং প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম বুর্জোয়া পরিচালিত মুসলিম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদলোভী হ'য়ে সেগুলিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সম্মুখে তুলে ধরেছিল। (কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর বক্র নীতির ফলে বিক্ষুব্ধ মুসলমান জনসাধারণ-ও ক্রমেই অধিক সংখ্যায় মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরে আশ্রয় নিচ্ছিল এবং ইসলামের নামে

দাবী করছিল পাকিস্তান।) তাই গান্ধীজির পর্শমার অনুসারে হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য দূর করার চেষ্টায় ভুলাভাই দেশাই মুসলিম লীগের পার্লামেণ্টারি লীডার লিয়াকৎ আলি খানের সংগে আলাপ-নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে আলাপ করেন। অবশেষে একটা আপোষ নিষ্পত্তির পরিকল্পনা-ও হয়: অস্থায়ীভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হবে, তাতে সদস্য সংখ্যা শতকরা কংগ্রেসের চল্লিশ, মুসলিম লীগের চল্লিশ এবং অন্যান্য দলের বিশ থাকবে। এই প্রস্তাব বৃটিশ সরকারের কাছে উত্থাপিত করার জন্যে তদানীন্তন বড় লাট লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন গেলেন। কিন্তু বৃটিশ কূটনীতিকরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান এতো সহজে হ'তে দিতে চাইলেন না। তারা যে নূতন ফরমূলা দিলেন, তাতে কংগ্রেসের স্থানে বর্ণ হিন্দু শতকরা চল্লিশ, মুসলিম লীগের স্থানে মুসলমান শতকরা চল্লিশ, এই ব্যবস্থা রইলো। কিন্তু বর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে স্বীকার করা কংগ্রেসের পক্ষে ছিল অসম্ভব। মুসলমান বা অন্য জাতির প্রতিনিধি নিয়োগের অধিকার তাঁদের সম্পূর্ণ ছিল। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোনো সমাধানই হোলো না। এমনিভাবে ওয়াভেল প্রস্তাব সিমলার পাহাড়ে ঠেকে বানচাল হ'য়ে গেলো।

কিন্তু শীঘ্রই পৃথিবীর অর্থনীতিক অবয়বটা প্রচুর রূপে বদলে গেলো। যুদ্ধে ফাশিস্টদের পরাজয়ের সংগে সংগে জগৎময় পুঁজিতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা হ'য়ে পড়েছিল শিথিল, দুর্বল। কেবল যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশৃংখল থেকে জার্মান, ইতালি এবং জাপান বিদায় নিয়েছিল তাই নয়, ইংল্যাণ্ডের জয়লাভ সত্ত্বে-ও সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড-ও হীনবল, ধ্বংসপ্রায় হ'য়ে পড়েছিল। তাছাড়া, এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে গণ-জাগৃতি ঘটেছিল, তাতে-ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ আরো কাহিল হ'য়ে উঠলো। ভারতবর্ষের

জনসাধারণ-ও অহিংসাপন্থী গান্ধীজি এবং গান্ধীবাদীদের শত প্রতিবাদ সত্ত্বে-ও মাথা তুলে দাঁড়ালো, চাইলো অচিরে ভারতের স্বাধীনতা। কলিকাতায় একযোগে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের আন্দোলন এবং বোম্বাই-এ হিন্দুমুসলমান নৌসৈন্যদের একযোগে ধর্মঘট এবং বিদ্রোহ আসন্ন ভবিষ্যতের সূচনা করলো—যে ভবিষ্যতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ আপনার শক্তিতে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করবে। কিন্তু গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতারা দেশকে সেপথে অগ্রসর হ'তে দিলেন না। কারণ, ভারতীয় বুর্জোয়াদের পক্ষে সে-পথ ছিল যেমন পিচ্ছিল, তেমনি ভয়ানক। সুতরাং তাঁরা মন্ত্রিত্বের মসনদে ব'সে গঠনতান্ত্রিকতার পথেই অগ্রসর হ'তে চাইলেন। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মিলিত অভিযান প্রত্যক্ষ ক'রে গান্ধীজি আতংকিত হ'য়ে উঠলেন। ১৯৪৬-এর হরিজন পত্রিকায় তিনি ঘোষণা করলেন, জনতার এই 'হিংসাত্মক' কার্যের পরিণতি দেখতে তিনি বেঁচে থাকতে চান না। তার চেয়ে তিনি বরং অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে মরবেন। "I would not want to live upto 125 to witness that consummation. I would rather perish in the flames." কে জানতো যে, গান্ধীজি সেদিন একটি মর্মান্তিক ভবিষ্যৎ বাণী মাত্র করেছিলেন। গান্ধীজি-ও নিজে জানতেন না যে, তাঁকে হয় একদিকে ভারতের বিপ্লবী জনগণকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে, নয় বরণ করতে হ'বে একদা ঘৃণ্য আততায়ীর হস্তে মৃত্যুকে!

ভারতের জনশক্তির এই জাগরণ সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট পরিমাণে অবিহিত ছিল। যুদ্ধের পরে পৃথিবীর সর্বত্র গণশক্তি এমন প্রবল এবং সাম্রাজ্যবাদ এমন দুর্বল হ'য়ে পড়ছিল যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে দমন নীতির পথে আর অগ্রসর হতে চাইলো না। তারা বুর্জোয়াদের

সাহায্যেই ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যকে বজায় রাখতে ইচ্ছা করলো। স্বতরাং ভারতবর্ষে এলো কেবিনেট মিশন।

১৯৪৬-এর গোড়ার দিকে যে নির্বাচন হোলো, তাতে দেখা গেলো, মুসলিম লীগ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে প্রতিপত্তিশালী হ'য়ে উঠেছে। মসলেম লীগ সর্বশুদ্ধ ৫০৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪২৭টি দখল করেছে। অথচ ১৯৩৭ সালে তারা মাত্র পেয়েছিল ১০৮টি। স্বতরাং মুসলিম লীগকে কেন্দ্র ক'রে বৃটিশ কূটনীতি এবার নিঃসংকোচে ঘূর্ণিত হ'তে লাগলো। এবং বৃটিশের উশ্‌কানী সহযোগে ভারতের একছত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবীটা ক্রমেই উগ্র হ'তে উগ্রতর হ'য়ে উঠলো।

১৬ই মে তারিখে বড় লাটের সংগে একযোগে বৃটিশ কেবিনেট মিশন তাঁদের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। এই প্রস্তাবে পাকিস্তানকে বস্তুত স্বীকার ক'রে না নিলে-ও কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত এবং মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্ন ভারতের সমস্যাকে কূটনীতির পথে আরো জটিলতর ক'রে তোলা হোলো। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যদি একযোগে ঘোষণা করতেন যে, আগে ভারতের স্বাধীনতা চাই, তারপর খণ্ডিত বা অখণ্ডিত ভারতের প্রশ্ন উঠবে, তবে বৃটিশ কেবিনেটের কূটনীতিকরা ভারতীয় সমস্যাকে এমন জটিল ক'রে তুলতে কখনো সমর্থ হতেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টি না ক'রে কেবলই পৃথক ভাবে কেবিনেট মিশনকে তোষণ করতে লাগলেন। ফলে, ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সমস্যাকে কুষ্ণতর ক'রে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জগতের কাছে আর এক বার জাহির করলো।

১৬ই মে তারিখে কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব ঘোষণার পর কংগ্রেস এবং

মুসলিম লীগের সংঘর্ষ ক্রমেই বাড়তে লাগলো। অবশেষে তা চূড়ান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হ'লো যখন আগস্ট মাসে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবীতে শুরু করলো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে দাংগা বেধে গেলো। একমাত্র কলিকাতাতেই বহু সহস্র লোক নিহত হোলো। সমস্ত বুর্জোয়া রাজনীতি যে এক অক্ষম দেউলিয়া অবস্থায় এসে পৌছেছিল, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হোলো না। বৎসরের পর বৎসর ধ'রে যে গণ-বিক্ষোভকে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া নেতৃত্ব দমন ক'রে এসেছিল, আজ অকস্মাৎ তা বীভৎস রূপে ফেটে পড়লো। বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হিসাবে ছুটে আসতে হোলো গান্ধীজিকে, অহিংসার নামে, সত্যের নামে, সহনের নামে। যে দেশব্যাপী বিপ্লবী শক্তিকে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে ঠেকিয়ে রেখে এসেছিলেন, আজ তা ভারতের সর্বত্র কুৎসিত গলিত ব্যাধির মতো আত্মপ্রকাশ করেছে।

গান্ধীজি অধীর হ'য়ে উঠলেন, ব্যাধিগ্রস্ত জাতির আর্তনাদ তাঁর কর্ণে ধ্বনিত হোলো। তিনি ছুটে চললেন—নোয়াখালিতে, বিহারে, দিল্লীতে, কেবল ভারতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষ রূপে নয়, শ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারী রূপে। গান্ধীজির জীবন নাট্যের এই শেষ দৃশ্য, যেমন অপরূপ, তেমনি করুণ!

পনেরো

হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে গণ-বিপ্লবের পথে পরিচালিত না ক'রে বারে বারে তাকে প্রতিহত প্রতিরুদ্ধ করায় তার এই বিকট বীভৎস বিস্ফোরণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। ১৯২৬ সালে এ সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যা বলেছিলেন, তাই বৃহত্তর ক্ষেত্রে আজ বাস্তবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল মাত্র। "It is possible that this bottling up of a great movement contributed to a tragic development in the country. The drift to sporadic and futile violence in the political struggle was stopped, but the suppressed violence had to find a way out, and in the following years this perhaps aggravated the communal trouble." (Autobiography, জহরলাল নেহরু)

অকস্মাৎ সেদিন ভারতবর্ষে যে-প্রচণ্ড হিংসার বর্বর বিস্ফোরণ ঘটলো, তার তুলনা আধুনিক ইতিহাসে মেলে না। ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে শান্ত করার জন্যে যাঁরা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে অহিংসামূলক ব'লে প্রচার করেছিলেন, ১৯৪৬।৪৭-এর ভারতবর্ষের নগ্ন রূপ দেখে তাঁদের লজ্জিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। অহিংসার বাণী কেবল ভারতের একচেটিয়া নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুরূপ অবস্থায় তা প্রচারিত হয়েছে,* আবার ভিন্নতরো পরিপার্শ্বে সে-দেশের লোকেরা তাকে প্রয়োজন অনুসারে

* যেমন সোভিয়েট রাশিয়া। টলস্টয়ের সংগে গান্ধীজির কথা ভাবুন।

করেছে উপেক্ষা। মানুষ কালের ক্রীড়নক, পরিপার্শ্বের পুতুল মাত্র। তাই বুদ্ধ, মহাবীর ও চৈতন্যের নামে ভারতের বিপ্লবী শক্তিকে শান্ত করা গেলো না, তা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হ'য়ে দেশময় ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতায় ফেটে পড়লো। বুদ্ধ, মহাবীর ও চৈতন্যের নাম নিয়ে গান্ধীজি বিপ্লবের প্রতিরোধ করতে পারলেন সত্য, কিন্তু জনসাধারণের অতৃপ্ত সংগ্রামী স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত করতে পারলেন না,—তা আত্মঘাতী দেশব্যাপী নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড ও ব্যভিচারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। সুতরাং ভারতের এই গ্লানিময় সাম্প্রদায়িকতার মূল সন্ধান করলে দেখা যাবে; এর জন্যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল দেশের সংগ্রামবিরোধী বুর্জোয়া নেতৃত্ব, এবং সেই নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ হিসাবে দায়ী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। নিতান্ত বিপরীতার্থক বাক্যের মতো শোনালেও, একথা একান্ত সত্য যে, এই দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্যে মূলত দায়ী ছিল গান্ধীজির অহিংসাই।

গান্ধীজি নোয়াখালি ও বিহারে শান্তি শফর শেষ ক'রে দিল্লীতে ফিরে এলেন। দেশের সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু কমলো না, তা কেবলই বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সমাজ-জীবনকে ছেয়ে ফেলতে চাইলো। সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ তো দূরের কথা, কংগ্রেসের বৃহত্তর অংশ-ও এই সাম্প্রদায়িকতার ঘৃণ্য পথে নেমে এলো। কিন্তু ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব আজ যে অমানুষ হিংসার পথে অগ্রসর হচ্ছে, অহিংসার প্রচারক হিসাবে গান্ধীজির সে-পথে অগ্রসর হওয়া বিন্দুমাত্র সম্ভব ছিল না। তাই গান্ধীজি হিংসার কুটিল স্রোতাবর্তের সম্মুখে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়ে একদা তিনি বারে বারে ভারতের বিপ্লবী শক্তির প্রতিরোধ করেছিলেন, আজ সেই ব্যক্তিত্ব নিয়েই তিনি দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। গান্ধীজির এই সুদৃঢ় মনোভাব সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের অনেকের

পছন্দ হোলো না। বৃটিশ সরকার আবার ভারতের পরিত্রাতা হিসাবে হলেন অবতীর্ণ। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিশেধক রূপে স্থির হোলো ভারতের ব্যবচ্ছেদ। ১৯৪৭-র ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত বিভাগ সম্পন্ন হোলো। কিন্তু তাতে-ও সাম্প্রদায়িকতার সমাধান হোলো না। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাংগা ভয়ংকর ভাবে দেখা দিলো। কেবল তাই নয়, হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দুই দল বিভক্ত ভারতের দুই খণ্ডে দুইটি শত্রু শিবির গ'ড়ে তুলতে লাগলো। গান্ধীজি লক্ষ্য করলেন, ভারতে গৃহযুদ্ধ আসন্ন। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের কাছে গান্ধীজির এই প্রচেষ্টা মনঃপূত হোলো না। গান্ধীজির উপর আক্রমণ আসতে লাগলো। গান্ধীজির জীবনে আক্রমণ এসেছে বহু বার, এবং প্রতি বারই সরকারী ব্যবস্থা তাঁর জীবন রক্ষা ক'রেছে। কিন্তু গান্ধীবাদী কংগ্রেসী সরকার এবার গান্ধীজির জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করলো না। গান্ধীজির প্রার্থনা সভায় ফাটলো বোমা। আততায়ীকে গান্ধীজি তাঁর দর্শন অনুসারে মার্জনা করলেন। কিন্তু ভারত সরকার-ও অকস্মাৎ দার্শনিক হ'য়ে উঠলো। শ্রমিক তাড়নায় যারা বন্দুক চালাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তারা সাম্প্রদায়িকদের বেলায় পরম অহিংসাবাদী হ'য়ে উঠলেন। এমনি ভাবে অহিংসার ভারতীয় ট্র্যাজেডি তার পরম মুহূর্তে এসে উপনীত হোলো—যাকে নাট্যশাস্ত্রে বলে নেমেসিস্।

১৯৪৮-এর ৩১শে জানুয়ারী। ভারতের আকাশে পুরাতন সূর্য নিতান্ত একঘেঁয়ে পুরাতন প্রথায় উঠেছে। তখন কে জানতো যে, এই সূর্যাস্ত ভারতের হৃৎপিণ্ডের রক্তে লাল হ'য়ে যাবে, সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার সমস্ত জাতির বুকে কালো বন্যার মতো নেমে আ সবে। গান্ধীজি নিয়মিতভাবে তাঁর

বৈকালিক প্রার্থনা সভার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। আকাশের সূর্য পশ্চিম দিগ্‌বলয়ে নেমে এলো। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে আথেন্সের সান্ধ্য আকাশে একদা এমনি ভাবে সূর্য নেমেছিল, দুহাজার বছর আগে জুডিয়ার আকাশ-ও হ'য়ে উঠেছিল এমনি লাল।

নিতান্ত আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ভাবে এক মহা নাটকের পরিণতি ঘটলো, আততায়ীর কয়েকটা মাত্র বুলেটে! অহিংসার শক্তি, আত্মার আড়ম্বর, হিংসার হাত থেকে গান্ধীজির দেহকে রক্ষা করতে পারলো না। গান্ধীজির মৃত্যু ঘটলো, সাধারণ মানুষ যেমন ভাবে মরে, ঠিক তেমনি ভাবে। নাটকের যবনিকা নামলো। মঞ্চ নিষ্প্রদীপ হ'য়ে গেলো।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী দর্শকরা এই ভারতীয় ট্র্যাজেডির শেষ দৃশ্যে এসে আর করতালি দিলো না, স্তব্ধ বেদনায় বিহ্বল মুহ্যমান হয়ে রইলো। নিষ্প্রদীপ ভারতের শূন্য রংগমঞ্চ থেকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত একটা আর্তনাদ আকাশ বিদীর্ণ ক'রে ফেটে পড়তে চাইলো। কিন্তু সে আর্তনাদ সমুদ্রের গর্জনে, বজ্রের হুংকারে, কোথাও ভাষা পেলো না। জাতির এই ক্রন্দন যে-একটি মাত্র মানুষ ধ্বনিত ক'রে তুলতে পারতেন, তিনি-ও যে-আজ আমাদের মধ্যে নেই। আজ জাতির এই মর্মভেদী ক্রন্দনকে ধ্বনিত ক'রে তুলবে কে? কে তাকে দেবে ভাষা, কে তাকে দেবে সান্ত্বনা, কে গাইবে তার হৃদয়ভেদী শোকার্ত গাথা? ভাড়াটিয়া প্রবন্ধকাররা সংবাদপত্রে, বেতারে মুদ্রামূল্যে নিতান্ত বেসুরো গলায় শোক প্রকাশ ক'রে গেলেন। কিন্তু তাতে জাতির মর্মধ্বনি ধ্বনিত হোলো কই? আব্রাহাম লিংকনের মৃত্যুতে সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মর্মবেদনা ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল, হুইটম্যানের একটি মাত্র কবিতায়, লিংকনের সরকারী লক্ষ স্ট্যাচু-ও তার সমতুল নয়:

"O Captain ! My captain ! Rise up and
hear the bells ;
Rise up—for you the flag is hung, for you
the bugle thrills."

সে-দিন আমেরিকার সেই ঘণ্টাধ্বনি ছিল বিজয়ী জাতির উৎসবের ঘণ্টাধ্বনি, পতাকা ছিল বিজয়-পতাকা। কিন্তু ভারতের আকাশে যে ঘণ্টা আজ বাজছে, সে আসন্ন বিপ্লবের ঘণ্টাধ্বনি, যে পতাকা উড়ছে, তা অসমাপ্ত যুদ্ধের। তুমি কি আসবে না, তুমি কি উঠবে না, তুমি কি তাকে দেখাবে না পথ? তোমার জন্যে যে ভারতের জনতা প্রতীক্ষা ক'রে আছে!

"...for you the shore is a-crowding,
For you they call—the swaying mass,
their eager faces turning..."

জানি, তুমি আসবে। নবযুগের-জাতক তুমি আসবে। এবার আসবে তুমি ভৈরবরূপে, তোমার ডম্বরু ধ্বনিত হবে আকাশে বাতাসে, তোমার রুদ্র নৃত্যের পদদাপে অন্যায়ের কঠিন আবরণ ভাঙবে।

চল্লিশ কোটি মানুষ অধীর প্রতীক্ষায় আছে।

—তুমি আবার এসো।

সংক্ষিপ্ত নির্ঘণ্ট